

Recovery & Advancement of Informal Sector Employment (RAISE)

ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন সাধারণ ব্যবসা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল

অংশগ্রহণকারীঃ পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার অর্থায়নভুক্ত ছোট উদ্যোক্তা

ফেব্রুয়ারি ২০২৩



পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

‘ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন বিষয়ক’ প্রশিক্ষণের রূপরেখা

প্রশিক্ষণ রূপরেখা

১ম দিন				
সময়	বিষয়	উপ-বিষয়	পদ্ধতি	সহায়ক
৯.০০-৯.৩০ (৩০ মিনিট)	রেজিস্ট্রেশন ও উদ্বোধন	রেজিস্ট্রেশন ও উদ্বোধন	- উপস্থিতি তালিকা - আলোচনা	
৯.৩০-১০.০০ (৩০ মিনিট)	১.১ পরিচিতি	- শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও পারস্পরিক পরিচিতি - প্রশিক্ষার্থীর কারবার/উদ্যোগ পরিচিতি - প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা নির্ণয় - প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী	- অডিও/ভিডিও মিউজিক - ভিপকার্ড - পোস্টার পেপার - গল্পের মাধ্যমে - প্রশ্নোত্তর - আলোচনা	
১০.০০-১০.৪৫ (৪৫ মিনিট)	১.২ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশা নির্ণয়	- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য - প্রকল্পের উদ্দেশ্য - পিকেএসএফ পরিচিতি	- ছবি প্রদর্শন - ভিপকার্ড - পোস্টার পেপার - মাল্টিমিডিয়া - ডকুমেন্টারি	
১০.৪৫-১১.০০	স্বাস্থ্য বিরতি			
১১.০০-১২.০০	১.৪ উদ্যোক্তা, উদ্যোগ ও ব্যবসায়ের মৌলিক ধারণা	- উদ্যোগের ধারণা - উদ্যোক্তার সংজ্ঞা - উদ্যোক্তাকে প্রভাবিত করার বিষয়সমূহ ➤ মনস্তাত্ত্বিক ➤ সামাজিক ➤ অর্থনৈতিক ➤ পরিবেশগত কারণ - উদ্যোক্তা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা - বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ছোট উদ্যোগের ভূমিকা (ভিডিও উপস্থাপনা) - কেইস স্টাডি (সফল ও ব্যর্থ উদ্যোগ)	- আলাপ-চারিতা - গল্পের মাধ্যমে উদাহরণ - প্রশ্নোত্তর - ভিডিও প্রদর্শন	
১২.০০-১.০০	১.৫ উদ্যোক্তার শ্রেণীবিভাগ	- উদ্যোক্তার ধরন ➤ ব্যবসার ধরন অনুযায়ী ➤ প্রযুক্তির ব্যবহার অনুযায়ী ➤ পরিবেশগত উন্নয়ন বিবেচনায় ➤ কর্মসংস্থানের বিবেচনায় - বিদ্যমান উদ্যোক্তা বনাম নতুন উদ্যোক্তা - সামাজিক উদ্যোক্তা ➤ শিক্ষা উদ্যোক্তা (Edupreneurship) ➤ স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা (Health Entrepreneurship) ➤ পর্যটন উদ্যোক্তা ➤ বিনোদন উদ্যোক্তা	- আলাপ-চারিতা - প্রশ্নোত্তর - ভিপকার্ড - পোস্টার পেপার - ভিডিও প্রদর্শন - কেইস স্টাডি	

সময়	বিষয়	উপ-বিষয়	পদ্ধতি	সহায়ক
		➤ কৃষি উদ্যোক্তা ➤ তরুণ উদ্যোক্তা ➤ ডিজিটাল উদ্যোক্তা ➤ নারী উদ্যোক্তা • ডিজিটাল ফাইন্যান্সিং		
		* দিনের সমাপনী	বড় দলে আলোচনা	
২য় দিন				
৯.০০-৯.৩০	পুনরাবৃত্তি	• পূর্বের দিনের শিখন বিষয়ে আলোচনা	• স্মৃতিচারণ • প্রশ্নোত্তর	
৯.৩০-১০.৪৫ (১ ঘন্টা ১৫ মিনিট)	২.১ ব্যবসার কাঠামো	• উদ্যোগের কাঠামোগত বিশ্লেষণ ➤ একক মালিকানা ➤ অংশীদারিত্ব ➤ সমবায় (কো-অপারেটিভ) ➤ লিমিটেড কোম্পানী • পারিবারিক উদ্যোগ বনাম আইনি কাঠামোর আওতায় গড়ে উঠা উদ্যোগ • প্রশিক্ষার্থীদের উদ্যোগের ধরণ সনাক্তকরণ (একক কাজ/দলীয় অনুশীলন)	• আলাপ-চারিতা • প্রশ্নোত্তর • ভিপকার্ড • পোস্টার পেপার • ভিডিও প্রদর্শন • দলীয় কাজ	
১০.৪৫-১১.০০	স্বাস্থ্য বিরতি			
১১.০০-১২.০০	২.২ উদ্যোগ উন্নয়ন	• কেন উদ্যোক্তা হলেন? • উদ্যোক্তা এবং সৃজনশীলতা • উদ্যোগ পরিচালনায় সীমাবদ্ধতাসমূহ/প্রতিবন্ধকতাসমূহ • সফল উদ্যোক্তার উদাহরণ (২/৩ জন)	• প্রশ্নোত্তর • ভিপকার্ড • পোস্টার পেপার • দলীয় কাজ • কেইস স্টাডি	
১১.০০-১২.০০	২.৩ ব্যবসায়ের পরিবেশ (Business Environment)	• ব্যবসায় পরিবেশ ➤ রাজনৈতিক ➤ অর্থনৈতিক ➤ সামাজিক ➤ প্রযুক্তিগত • ব্যবসায় উদ্যোগ পরিবেশ • ব্যবসায় পরিবেশের উপাদানসমূহ/শক্তিসমূহ • উদ্যোগের কর্মপরিবেশ ও উত্তম চর্চায় করণীয়	• আলাপ-চারিতা • প্রশ্নোত্তর • ভিপকার্ড • পোস্টার পেপার • ভিডিও প্রদর্শন	
১২.০০-১.০০	২.৪ উদ্যোক্তার গুণাবলী	• উদ্যোক্তার প্রধান গুণাবলী • কেইস স্টোরি	• একক কাজ উপস্থাপনা • ভিপকার্ড • ভিডিও উপস্থাপনা	
		* দিনের সমাপনী	বড় দলে আলোচনা	
৩য় দিন				
৯.০০-৯.১৫	পুনরাবৃত্তি	• পূর্বের দিনের শিখন বিষয়ে আলোচনা	• স্মৃতিচারণ • প্রশ্নোত্তর	

সময়	বিষয়	উপ-বিষয়	পদ্ধতি	সহায়ক
৯.১৫-১০.০০	৩.১ আইনি দায়িত্ব এবং বীমা	- লাইসেন্স ও অনুমোদন - কর প্রদান (ট্যাক্স ও ভ্যাট) - বিমা (ইন্স্যুরেন্স) - বিমার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ভিডিও/কেইস স্টোরি - স্থানীয় পর্যায়ে/জাতীয় পর্যায়ে সফল উদ্যোক্তাদের চর্চা নিয়ে আলোচনা (দলীয় কাজ)	- বক্তৃতা - বড় দলে আলোচনা - প্রশ্নোত্তর - ভিপকার্ড - উপস্থাপন	
১০.০০-১০.৪৫	৩.২ উদ্যোগে কর্মী ব্যবস্থাপনার মৌলিক বিষয়	- উপযুক্ত কর্মী নির্বাচন - কর্মীদের কর্মদক্ষতার উন্নয়ন - কর্মী মোটিভেশন - কর্মচারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য - শোভন কর্মপরিবেশ	- আলাপ-চারিতা - প্রশ্নোত্তর - ভিপকার্ড - পোস্টার পেপার - ভিডিও প্রদর্শন	
১০.৪৫-১১.০০	স্বাস্থ্য বিরতি			
১১.০০-১.০০	৩.৩ ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও অর্থায়ন	- ব্যবসায়িক পরিকল্পনা - ব্যবসায় পরিকল্পনার বিষয়বস্তু - SWOT এনালাইসিস (দলীয় কাজ) - পরিকল্পনা প্রণয়ন - আর্থিক পরিকল্পনা কি? (উদাহরণ প্রদান) - আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন (দলীয় কাজ) - মূলধন এর ধরণ এবং উৎস - মালিকানা অংশ (ইকুইটি) - ঋণ (পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা, ব্যাংক ইত্যাদি) - ব্যবসার জন্য ক্রয় - সরঞ্জাম (ইকুইপমেন্ট) - কাচামাল - তৈরি পণ্য	- আলাপ-চারিতা - প্রশ্নোত্তর - ভিপকার্ড - পোস্টার পেপার - ভিডিও প্রদর্শন	
		* দিনের সমাপনী	বড় দলে আলোচনা	
৪র্থ দিন				
৯.০০-৯.৩০	পুনরাবৃত্তি	পূর্বের দিনের শিখন বিষয়ে আলোচনা	- স্মৃতিচারণ - প্রশ্নোত্তর	
৯.৩০-১০.৪৫	৪.১ আর্থিক ব্যবস্থাপনা	- পণ্য ও সেবার খরচ নির্ধারণ - খরচ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা - স্টাফ/কর্মীর খরচ নির্ধারণ - প্রস্তুতকারক বা সেবা প্রদানকারীর জন্য খরচ নিরূপণ (কস্টিং) - একজন খুচরা বিক্রেতা বা পাইকারী বিক্রেতার জন্য খরচ নিরূপণ (কস্টিং) - অ্যাকাউন্টিং বা রেকর্ড কিপিং - ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা - হিসাব ব্যবস্থাপনা	- আলাপ-চারিতা - প্রশ্নোত্তর - ভিপকার্ড - পোস্টার পেপার - ভিডিও প্রদর্শন	

সময়	বিষয়	উপ-বিষয়	পদ্ধতি	সহায়ক
		➤ লাভ-ক্ষতি নির্ধারণ ➤ আর্থিক লেনদেন		
১০.৪৫-১১.০০	স্বাস্থ্য বিরতি			
১১.০০-১২.০০	৪.২ মুনাফার পরিকল্পনা	• ব্রেক-ইভেন পয়েন্ট অর্জনের পরিকল্পনা • একটি (উদ্যোগের) মুনাফার পরিকল্পনা তৈরি করা ➤ প্রয়োজনীয় প্রারম্ভিক মূলধন (স্টার্ট আপ ক্যাপিটাল) ➤ প্রাথমিক বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ ➤ ব্যবসা সম্প্রসারণ ➤ উদ্যোগের জন্য স্থায়ী বিনিয়োগ/ব্যবসা প্রাঙ্গণের জন্য বিনিয়োগ ➤ চলতি মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণ	• আলাপ-চারিতা • প্রশ্নোত্তর • ভিপকার্ড • পোস্টার পেপার • ভিডিও প্রদর্শন	
১২.০০-১.০০	৪.৩ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের উৎপাদন	• উৎপাদনের উপাদান/উপকরণসমূহ • উৎপাদন পরিকল্পনা • উৎপাদন পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয় • উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ কি? উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব ও উপাদানসমূহ • পণ্য উন্নয়ন/নতুন পণ্য উন্নয়ন • পণ্য উন্নয়নের পদক্ষেপসমূহ/স্তরসমূহ • পণ্যের জীবনচক্র • পণ্যের জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরসমূহ • উৎপাদন পূর্বাভাস, পরিকল্পনা এবং নিয়ন্ত্রণ (Production Forecasting, Planning And Control) ➤ চাহিদা বিশ্লেষণ • উপকরণ ব্যবস্থাপনা (Materials Management)/সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট ➤ চাহিদা ও যোগান	• আলাপ-চারিতা • প্রশ্নোত্তর • ভিপকার্ড • পোস্টার পেপার • ভিডিও প্রদর্শন	
		* দিনের সমাপনী	বড় দলে আলোচনা	
৫ম দিন				
৯.০০-৯.৩০	পুনরাবৃত্তি	• পূর্বের দিনের শিখন বিষয়ে আলোচনা	• স্মৃতিচারণ • প্রশ্নোত্তর	
৯.৩০-১০.৪৫	৫.১ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের বাজারজাতকরণ/বিপণন	• মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট ➤ সম্পর্ক এবং নেটওয়ার্ক (Relationships and Network) ➤ বিপণনকারী এবং সম্ভাবনা (Marketers and Prospects) ➤ চাহিদা ব্যবস্থাপনা ➤ পণ্য	• আলাপ-চারিতা • প্রশ্নোত্তর • ভিপকার্ড • পোস্টার পেপার • ভিডিও প্রদর্শন	

সময়	বিষয়	উপ-বিষয়	পদ্ধতি	সহায়ক
		➤ বিজ্ঞাপন (অনলাইন/অফলাইন) • পণ্য বৈচিত্র্যকরণ ➤ নতুন পণ্য উন্নয়ন		
১০.৪৫-১১.০০	স্বাস্থ্য বিরতি			
১১.০০-১২.০০	৫.২ টেকসই ও উদ্ভাবনী ব্যবসা	• পরিবেশবান্ধব ব্যবসা ➤ ব্যবসা ও প্রাকৃতিক সম্পদ ➤ দক্ষতা ও মুনাফা বৃদ্ধিকরণ: হাস, পুনঃব্যবহার, পুনঃপ্রক্রিয়া (3R) ➤ বর্জ্য বনাম সম্পদ • পরিবেশগত ঝুঁকি ➤ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঝুঁকি নির্ধারণ ও ঝুঁকি মোকাবেলায় করণীয় ➤ সবুজ প্রযুক্তির ব্যবহার • ব্যবসায় উদ্ভাবন (ইনোভেশন)	• আলাপ-চারিতা • প্রশ্নোত্তর • ভিপকার্ড • পোস্টার পেপার • ভিডিও প্রদর্শন	
১২.০০-১.০০	৫.৩ ব্যবসা সম্প্রসারণ	• ব্যবসা সম্প্রসারণে করণীয় • ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ • ঝুঁকি প্রশমন	• আলাপ-চারিতা • প্রশ্নোত্তর • ভিপকার্ড • পোস্টার পেপার	
১.০০-১.৩০	৫.৪ সমাপনী	• প্রশিক্ষণের মৌলিক শিখন বিষয়ে মতামত (যে কোন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করে নোট রাখা হবে) • মডারেটরের তত্ত্বাবধানে প্রশ্নাভিত্তিক মতামত • সমাপনী বক্তব্য	• মুড মিটার • ছক • পোস্টার	

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ব্যবহার নির্দেশিকা

গ্রামীণ স্বল্প শিক্ষিত মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থান এবং ব্যবসা উন্নয়ন ও পরিচালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান প্রশিক্ষকের জন্যে একটি বিশাল দায়িত্ব। এই প্রশিক্ষণটি অংশগ্রহণমূলক ও বাস্তবভিত্তিক, সহজবোধ্য ও বস্তুনিষ্ঠ করে তোলা প্রশিক্ষকের একটি গুরু দায়িত্ব। সে দিকে দৃষ্টিপাত করে, সফল প্রশিক্ষকদের অভিজ্ঞতার আলোকে নিয়ে কিছু প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া গেল। যার চর্চা ও প্রয়োগ এই প্রশিক্ষণকে সুষ্ঠু ও সক্ষম পরিচালনায় সহায়ক করে তুলবে।

> এ প্রশিক্ষণ পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষককে মনযোগ সহকারে প্রশিক্ষণ বিষয়ের প্রতিটি ধাপ এক এক করে ক্রমান্বয়ে পরিচালনা করতে হবে। তাই প্রশিক্ষককে প্রতিটি বিষয়ের কারিগরি ও তথ্যগত দিক সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখতে হবে। ম্যানুয়ালের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি বিষয় মনযোগ সহকারে পড়তে হবে। এতে করে প্রশিক্ষক হিসাবে প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

> প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করতে পরিস্থিতি ও পরিবেশ বুঝে প্রয়োজনে সংযোজন/বিয়োজন করা যাবে। বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রেও প্রয়োজন এবং কার্যকারিতা অনুযায়ী অধিবেশনের সময় বাড়াতে বা কমাতে পারা যাবে। তবে তা যেন প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হয় সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

> অধিবেশন পরিচালনার পূর্বে পাঠ পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সারঞ্জাম গুছিয়ে নিতে হবে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সামগ্রী যা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা ব্যবহার করবেন সে সব সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখতে হবে।

> সহজ ভাষায় প্রশিক্ষণের বিষয়ভিত্তিক শব্দাবলী (টেকনিক্যাল ওয়ার্ড) প্রয়োজন হলে আঞ্চলিক ভাষায় বুঝিয়ে দিতে হবে।

> অনুশীলনে সময় হ্রাসমুহ যাতে সঠিক ভাবে ব্যবহার করা হয়, তার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

> খেয়াল রাখতে হবে যে, প্রশিক্ষণ পরিবেশটি যেন অনানুষ্ঠানিক ও অংশগ্রহণ মূলক হয়, যাতে করে প্রশিক্ষণার্থীদের পাঠ ও বিষয় সমূহ অনুসরণ করতে সহজ হয়।

> অংশগ্রহণকারীদের প্রতি সহনশীল ও ধৈর্যশীল থাকতে হবে।

> অংশগ্রহণকারীদের প্রানবন্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত রাখার জন্য মাঝে মাঝে ছোট খাট বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে।

> প্রশিক্ষককে তাত্ত্বিক বিষয়ের চেয়ে ব্যবহারিক প্রদর্শন ও অনুশীলনে বেশী মনযোগী হতে হবে।

> প্রতিটি বিষয় চর্চা বা অনুশীলন করাতে হবে এবং বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করতে হবে।

ক্ষুদ্র ব্যবসা উন্নয়ন ও পরিচালনা প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল পরিচিতি

- সময়কাল: ১৬ দিন (প্রতিদিন ৬ ঘন্টা করে) মোট ২ মাস
- প্রতিদিনের প্রশিক্ষণ সময়সূচী: সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ৩ টা পর্যন্ত
- প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা: ২০-২৫ জন উপকারভোগী মহিলা
- প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত ভাষা: বাংলা
- প্রশিক্ষণ স্থান: মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প এলাকা
- প্রশিক্ষণার্থীর ধরণ: গ্রাম পর্যায়ের সুবিধাভোগী মহিলা দল (স্বল্প শিক্ষিত/নিরক্ষর)

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য:

তরুণ উদ্যোক্তারা প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করে ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হবে এবং উদ্যোগে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ :

- ক্ষুদ্র ব্যবসা উন্নয়ন এবং ব্যবসা কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবেন।
- উদ্যোক্তাদের ভূমিকা, কার্যাবলী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ গ্রহণের বিভিন্ন ধাপ এবং উপাদান সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবেন।
- পণ্য/সেবা উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের কৌশলগত দিক সম্পর্কে বাস্তব দক্ষতা অর্জন করবেন।
- ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা এবং সাধারণ অর্থ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবেন।

প্রশিক্ষন ম্যানুয়ালের বিষয়সমূহ:

- মহিলা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ পরিবেশ;
- উদ্যোক্তা সক্ষমতা, সফল উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য ও দলীয় উদ্যোগ;
- বাজার চাহিদা, পণ্য/সেবা নির্বাচন, চাহিদা এবং সরবরাহ;
- পণ্য/সেবার মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি ও মুনাফা নির্ধারণ কৌশল;
- ব্যবসা পরিকল্পনা, ঋণ পরিকল্পনা এবং প্রাপ্যতা;
- সাধারণ ব্যবসায়িক হিসাব সংরক্ষণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা;
- ব্যবসা পরিচালনা।

প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ:

- বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা।
- দলীয় কার্যক্রম, দলীয় আলোচনা ও দলীয় উপস্থাপনা।
- মুক্ত চিন্তার ঝড় (বুদ্ধি খাটানো)
- অভিজ্ঞতা বিনিময় ও মুক্ত আলোচনা।
- অনুশীলন।
- বাজার যাচাই ও ছবি প্রদর্শন।
- সিমুলেশন গেম।

প্রশিক্ষণ উপকরণ:

- প্রতিটি সেসনের জন্যে ছবি।
- ফ্লিপ চার্ট ও সফট বোর্ড।
- পুঁতি, পুঁতি রাখার পাত্র, সুঁচ, সুতা ও কাঁচি।
- কোর্স মূল্যায়ন ফরমেট।
- নমুনা টাকা।
- ১ লিটার তেলের ৫টি বোতল/পানি ভর্তি বোতল।
- প্রতীক।
- মুড়ি, চিড়া, চানাচুর এর প্যাকেট।
- চাহিদা এবং যোগানের প্রতীক।
- ব্যবসা পরিকল্পনা সহায়িকা বই।
- পিতলের ঘন্টি।

প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ কক্ষ:

- ২০ - ২৫ জন প্রশিক্ষার্থী বসার উপযোগী কক্ষ যাতে করে অংশগ্রহণকারীগণ একে অপরের সাথে সহজে মত বিনিময় করতে পারেন
- ক্ষুদ্র ও ব্যবসা উন্নয়ন ও ব্যবসা কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত টিটিসি রিজিওন্যাল অফিস

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া:

- প্রতিটি অধিবেশনের পর প্রশ্ন-উত্তর, প্রতিবর্তা গ্রহণ
- হাতে কলমে ব্যবসা পরিকল্পনা তৈরী
- দৈনিক ও কোর্স মূল্যায়ন

সূচিপত্র

রেজিস্ট্রেশন ও উদ্বোধনী	১০
১ম দিন.....	11
অধিবেশন - ১.১: পরিচিতি পর্ব.....	11
অধিবেশন - ১.২: প্রশিক্ষণ থেকে প্রত্যাশা নির্ণয়.....	12
অধিবেশন - ১.৩: প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য.....	15
অধিবেশন -১.৪: উদ্যোক্তা, উদ্যোগ ও ব্যবসায়ের মৌলিক ধারণা	17
অধিবেশন -১.৫: উদ্যোক্তার শ্রেণীবিভাগ	22
২য় দিন.....	24
অধিবেশন -২.১: ব্যবসার কাঠামো.....	24
অধিবেশন -২.২: উদ্যোক্তা উন্নয়ন.....	27
অধিবেশন -২.৩: ব্যবসায়ের পরিবেশ.....	30
অধিবেশন -২.৪: উদ্যোক্তার গুণাবলি	32
৩য় দিন	34
অধিবেশন -৩.১: আইনি দায়িত্ব এবং বীমা	34
অধিবেশন -৩.২: উদ্যোগে কর্মী ব্যবস্থাপনায় মৌলিক বিষয়	38
অধিবেশন -৩.৩: ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও অর্থায়ন	41
৪র্থ দিন.....	52
অধিবেশন -৪.১: আর্থিক ব্যবস্থাপনা	52
অধিবেশন -৪.২: মুনাফার পরিকল্পনা	56
অধিবেশন -৪.৩: ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের উৎপাদন	61
৫ম দিন	73
অধিবেশন -৫.১: ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের বাজারজাতকরণ/বিপণন.....	73
অধিবেশন -৫.২: টেকসই ও উদ্ভাবনী ব্যবসা	100
অধিবেশন -৫.৩: ব্যবসা সম্প্রসারণ	105
অধিবেশন -৫.৪: মূল্যায়ন ও সমাপনী	109

রেজিস্ট্রেশন ও উদ্বোধনী

- সময়: ৩০ মিনিট
- রেজিস্ট্রেশন: প্রশিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন করার জন্য প্রশিক্ষণ রুমের বাহিরে/পাশের রুমে স্বাক্ষর সিট-এর ব্যবস্থা থাকবে। যেখান থেকে প্রশিক্ষার্থী উপস্থিতির স্বাক্ষর দিয়ে উপকরণ বুঝে নিয়ে প্রশিক্ষণ রুমে প্রবেশ করবেন।

রেজিস্ট্রেশনের সময় প্রতি অংশগ্রহণকারীদের প্রকল্পের আওতায় আয়োজক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে স্টেশনারি দ্রব্যাদি প্রদান করবেন এবং name card-এ অংশগ্রহণকারীকে তার নাম লিখতে বলবেন। যারা লিখতে পারবে না ফ্যাসিলিটেটর ও কো-ফ্যাসিলিটেটর কর্তৃক তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য Project Management Unit (PMU) হতে সরবরাহকৃত Training Information Database Format এর সংক্ষিপ্ত ভার্সনটি (নমুনা স্বাক্ষর শিট) পূর্বেই প্রিন্ট করে রাখতে হবে এবং তাতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য দৈনিক হাজিরার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কলাম যোগ করে নিবেন।

নমুনা স্বাক্ষর শিট

সংস্থার নাম									
সংস্থার ঠিকানা									
General Business Management (GBM) প্রশিক্ষণ									
ভেন্যু:.....					তারিখ:				
অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতিপত্র									
ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	সমিতির নাম	মোবাইল নম্বর (বিকাশ/নগদ/রকেট)	স্বাক্ষর					
				১ম দিন	২য় দিন	৩য় দিন	৪র্থ দিন	৫ম দিন	

উদ্বোধন: মূল প্রশিক্ষণ শুরু হবার আগে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে। অর্থাৎ প্রশিক্ষণ যদি ৯.৩০ মিনিটে শুরু হয়, তাহলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে (৯.০০-৯.৩০ এর মধ্যে)।

সাধারণত প্রতিষ্ঠান প্রধান কিংবা প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র স্টাফ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন ঘোষণা করবেন।

১ম দিন

অধিবেশন - ১.১

পরিচিতি পর্ব

দিন-১, অধিবেশন ১.১

: সময়: ৯.৩০-১০.০০

ব্যাপ্তি: ৩০ মিনিট

সেশন শিরোনাম	: পরিচিতি পর্ব
সেশন লক্ষ্য	: এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ একজন আরেকজনের সাথে পরিচিত হবেন।
উদ্দেশ্য	: এ সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- - অংশগ্রহণকারীগণ জড়তাহীনভাবে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবেন - অংশগ্রহণকারীগণ পারস্পরিকভাবে পরিচিত হবেন
উপকরণ	: ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, অডিও/ভিডিও মিউজিক, পোস্টার পেপার/বোর্ড, মার্কার
পদ্ধতি	: ভিপিআর, পোস্টার পেপার প্রদর্শন, গল্প বলা, প্রশ্নোত্তর, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা
পঠন উপকরণ	: হ্যান্ডআউট
পূর্ব প্রস্তুতি	: সহায়ক পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও বোর্ড প্রস্তুত করে রাখবেন।
মূল্যায়ন পদ্ধতি	: প্রশ্নোত্তর

প্রক্রিয়া

পরিচয় পর্বের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে অংশগ্রহণকারীদের জড়তা বিমোচন এবং প্রশিক্ষণে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। সেজন্যে এ পর্বটিকে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে আকর্ষণীয় এবং উপভোগ্য করে তুলতে হবে। পরিচয় পর্ব পরিচালনার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এখানে একটি পদ্ধতির বর্ণনা দেয়া হলো। এ পদ্ধতির জন্য পূর্ব থেকেই কিছু প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে।

ফ্যাসিলিটের অংশগ্রহণকারীদের পারস্পরিক পরিচিতি কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করবেন।

<https://www.youtube.com/watch?v=kHfhg0-sUdk>

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে ফ্যাসিলিটের প্রশিক্ষণার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন, আমরা কি সবাই সবাইকে চিনি বা জানি? হয়তো কাউকে কাউকে চিনি কিন্তু জানি কি? তাহলে কি আমাদের একটু পরিচিত হয়ে নেয়া দরকার কি? তাহলে কিভাবে পরিচিত হওয়া যায়? আসুন একটি খেলার মাধ্যমে পরিচিত হই!

এরপর ফ্যাসিলিটের একটি মিউজিক ছেড়ে দিবেন এবং সকল অংশগ্রহণকারীদেরকে অনুরোধ করবেন প্রশিক্ষণ কক্ষের মাঝখানে আসার জন্য। ফ্যাসিলিটের সকল অংশগ্রহণকারীদেরকে বলবেন; মনে করেন আমরা সবাই মিলে কোথাও ঘুরতে গিয়েছি। একা একা ঘুরতে ভাল লাগে না, তাই আমরা একজন করে বন্ধু বাছাই করবো। ফ্যাসিলিটের একটা হিপহপ মিউজিক ছাড়বে লিপিকারে অথবা মোবাইলে এবং সকলকে নিয়ে প্রশিক্ষণ কক্ষের মধ্যে ঘুরতে থাকবে। ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে মিউজিক শুনতে শুনতে বন্ধু তৈরী হয়ে যাবে। মিউজিক বন্ধ হলেই দুই বন্ধু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বন্ধুর সাথে পরিচিত হবেন। পূর্ব থেকে প্রস্তুতকৃত পরিচয়ের ১ নম্বর ক্রু-টি ফ্যাসিলিটের সবাইকে দেখিয়ে দিবেন। এর জন্য ২ মিনিট সময় দেবেন। সময় শেষে সবাই যার যার বন্ধুকে সাথে নিয়ে দ্রুত সময়ে বৃত্তাকারে দাঁড়াবেন। ফ্যাসিলিটের একে একে প্রতি জোড়ার কাছ থেকে শুনতে চাইবেন। পরিচয় দেয়ার সময় জোড়ার একজনের পরিচয় অন্যজন দিবে। আবার ফ্যাসিলিটের একই পদ্ধতিতে নতুন আরেকজন বন্ধু বেছে নেয়ার অনুরোধ করবেন এবং ২য় ক্রু-টি জানিয়ে দিবেন। এভাবেই ৫টি ধাপ শেষ করবেন।

পরিচয়ের বিষয়সমূহ

১. নিজের নাম, ঠিকানা
২. ব্যবসার ধরন (পোল্ট্রি/গাভী পালন/সবজি চাষ/দর্জী/ গ্যারেজ ইত্যাদি), প্রতিষ্ঠানের নাম এবং এই নামটি কেন দেয়া হয়েছে
৩. ব্যবসা করতে গিয়ে এমন কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি যা জীবনে আর হতে চাই না।
৪. ব্যবসা নিয়ে নিজের স্বপ্ন কি
৫. আপনার বন্ধুকে দাওয়াত দিন এমন কিছু বলে বা আপনার ব্যবসা দেখে শেখার মত কিছু আছে তা দেখতে দাওয়াত দিন

১. জোড়ায় প্রতিটি মন্তব্য নিয়ে আলোচনার পর ফ্যাসিলিটেটর সকল জোড়ার কাছে তাদের অনুভূতি জানতে চাইবেন। অংশগ্রহণকারীদের আলোচনা হতে ফ্যাসিলিটেটর গুরুত্বপূর্ণ শব্দসমূহ বোর্ড/ ফ্লিপচার্টে লিখে রাখবেন।
২. এই প্রক্রিয়ায় ফ্যাসিলিটেটর প্রতিটি মন্তব্য শেষে নতুন জোড়ার কাছে তাদের অনুভূতি জানতে চাইবেন। লক্ষ্য রাখবেন যাতে প্রতিটি মন্তব্যে ভিন্ন-ভিন্ন অংশগ্রহণকারীরা তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ পায়।

পুনরালোচনা

ফ্যাসিলিটেটর অংশগ্রহণকারীদেরকে বোর্ড/ ফ্লিপচার্টে লেখা শব্দসমূহের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের আমন্ত্রণ জানাবেন। একই সঙ্গে ফ্যাসিলিটেটর শব্দসমূহের সঙ্গে অংশগ্রহণকারীদের পরিচয়ের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করবেন। যেমন: প্রত্যেকেই একটি ব্যবসা আছে, ব্যবসায় নামের পিছনে গল্প আছে, প্রত্যেকেই সে ব্যবসা নিয়ে একটি স্বপ্ন লালন করে, প্রত্যেকের ব্যবসা জীবনে নানান চড়াই-উত্থাই রয়েছে, প্রত্যেকের বুলিতে ভিন- ভিন্ন অর্জন রয়েছে ইত্যাদি। ফ্যাসিলিটেটর আরো বলবেন, পরিচিতি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মধ্যদিয়ে নতুন সম্পর্ক তৈরি হয় এবং এর মাধ্যমে আমরা প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ হতে থাকি।

সবশেষে ফ্যাসিলিটেটর অংশগ্রহণকারীদেরকে জিজ্ঞেস করবেন-

- এই সম্পর্ক কি ব্যবসা পরিচালনা বা সম্প্রসারণে কি কোন কাজে আসে?
- ৩-৪ জন অংশগ্রহণকারীর উত্তর নেয়া হবে।

পরিচিতি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নতুন সম্পর্ক তৈরি হয় এবং সে সম্পর্ক ব্যবসা পরিচালনা বা সম্প্রসারণে সহায়তা করে এমন মন্তব্যের মধ্য দিয়ে এই সেশনের সমাপ্তি হবে।

অধিবেশন - ১.২

প্রশিক্ষণ থেকে প্রত্যাশা নির্ণয়

দিন-১, অধিবেশন-১.২	: সময়: ৯:৩১-১০.০০	ব্যাপ্তি: ৩০ মিনিট
সেশন শিরোনাম	: প্রশিক্ষণ থেকে প্রত্যাশা নির্ণয়	
সেশন লক্ষ্য	: এই অধিবেশনের মাধ্যমে উক্ত প্রশিক্ষণ থেকে অংশগ্রহণকারীগণের প্রত্যাশা জানা যাবে এবং প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ের নিয়মাবলী অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করা হবে।	
উদ্দেশ্য	: এ সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- • প্রশিক্ষণে যোগদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হবেন • প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন	
উপকরণ	: পোস্টার পেপার, ভিপকার্ড, ছবি বোর্ড, মার্কার	
পদ্ধতি	: ছবি প্রদর্শন, ভিপকার্ড প্রদর্শন, পোস্টার পেপার প্রদর্শন	
পঠন উপকরণ	: হ্যান্ডআউট	
পূর্ব প্রস্তুতি	: সহায়ক পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও বোর্ড প্রস্তুত করে রাখবেন।	
মূল্যায়ন পদ্ধতি	: প্রশ্নোত্তর	

- ❑ উদ্দেশ্য: এই অধিবেশনের মাধ্যমে উক্ত প্রশিক্ষণ থেকে অংশগ্রহণকারীগণের প্রত্যাশা জানা যাবে এবং প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ের নিয়মাবলী অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করা হবে।
- ❑ সময়: ৩০ মিনিট
- ❑ উপ বিষয়:
 - প্রশিক্ষণ থেকে প্রত্যাশা নির্ণয়
 - প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী
- ❑ পদ্ধতি: বড় দলে আলোচনা
- ❑ প্রয়োজনীয় উপকরণ: হোয়াইট বোর্ড, পোস্টার পেপার, মার্কার, ছবি

আলোচ্য বিষয়: প্রশিক্ষণ থেকে প্রত্যাশা নির্ণয়

সময়: ১৫ মিনিট

প্রক্রিয়া

ফ্যাসিলিটেটর সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে নিচের ছবি দেখিয়ে অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করবেন; এ ছবির মানুষকে কেউ চিনেন কি?



ফ্যাসিলিটেটর অংশগ্রহণকারীদের উত্তর গ্রহণ করবেন। যদি কেউ না চিনে থাকে তবে চিনিয়ে দিবেন;

- ইনি ওয়াসফিয়া নাজরীন (জন্ম ২৭ অক্টোবর ১৯৮২) একজন বাংলাদেশী পর্বতারোহী। তিনি এখনও পর্যন্ত সর্বকনিষ্ঠ বাংলাদেশী এবং দ্বিতীয় বাংলাদেশী নারী হিসেবে ২০১২ সালের ২৬ মে শনিবার সকাল পৌনে ৭টায় বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্টের চূড়ায় আরোহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম পর্বতারোহী হিসেবে সাত মহাদেশের সাতটি সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ জয় (সেভেন সামিট) করেছেন। ২০২২ সালের ২২ জুলাই, প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে তিনি বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কে-টু পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করেন।

ফ্যাসিলিটেটরের জন্য তথ্য

আরও বিস্তারিত জানতে এই লিংকে ক্লিক করে পড়তে পারেন;

[ওয়াসফিয়া নাজরীন - উইকিপিডিয়া \(wikipedia.org\)](https://www.wikipedia.org)

ফ্যাসিলিটেটর অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে আসা উত্তরগুলির সাথে মিলিয়ে বাংলাদেশের ওয়াসফিয়াসহ যারা পৃথিবীর উচ্চ পর্বত এভারেস্টে উঠেছে, তাদের সকলের প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু এই প্রত্যাশা তাদের একদিনে পূরণ হয়নি। এর জন্য তাদেরকে পরিকল্পনা করতে হয়েছে, পর্বতে উঠার জন্য কিছু শারিরীক, মানসিক, আর্থিক প্রস্তুতি নিতে হয়েছে এবং দীর্ঘদিন সাধনা করতে হয়েছে। অনেক চড়াই-উৎরাই পার করতে হয়েছে। ঠিক কিনা?

ঠিক তেমনি আপনাদের ব্যবসা শুরু করার আগে কিছু প্রত্যাশা ছিল?



এবার ফ্যাসিলিটেটর অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানতে চাইবেন;

- আমরা আজকে এখানে কেন এসেছি?
- প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে!
- কিসের প্রশিক্ষণ?
- কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ?
- নিশ্চয় সে বিষয়ে কিছু জানতে বা বুঝতে চান!

ফ্যাসিলিটেটর তাদের কথার রেশ ধরে একটু নির্দিষ্ট করে বলার জন্য উৎসাহ দেবেন যে তারা কি কি বিষয় জানতে / শিখতে চান। অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে আসা উত্তরগুলি কো-ফ্যাসিলিটেটর ফ্লিপচার্টে / বোর্ডে লিখে রাখবেন।

এরপর ফ্লিপচার্টে লেখা প্রত্যাশাগুলো কো-ফ্যাসিলিটেটর কোন এক দেয়ালে বুলিয়ে রাখবেন এবং প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যাশাগুলি মিলিয়ে দেখবেন প্রত্যাশা অনুযায়ী তারা শিখতে পেরেছে কিনা।

আলোচ্য বিষয়: প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী

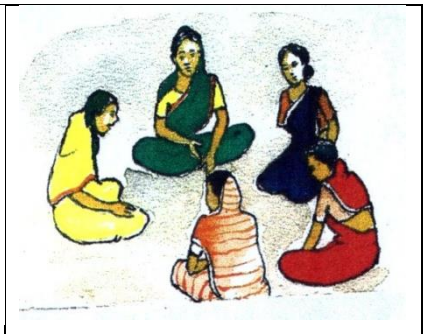
সময়: ১৫ মিনিট

আমরা পর্বতে উঠার ঘটনা থেকে কি জেনেছি? শুধু প্রত্যাশা করে এমনি এমনি পর্বতে ওঠা গেছে? নিশ্চয় বেশ কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়েছে! যেমন- কখন ওঠা শুরু করবে, কখন বিশ্রাম নেবে, সাথে কি কি নেবে, একা যাবে নাকি সাথে কাউকে নেবে, গাইডের কথা মেনে চলবে বা চলবে না ইত্যাদি। তারপরই তো সে প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছে, তাই না?

প্রশিক্ষণ সেশনের সূষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য অংশগ্রহণকারীদের প্রতি আহ্বান জানাবেন। এবার তিনি অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাইবেন;

- তাহলে আমাদেরও এই প্রশিক্ষণ থেকে প্রত্যাশা পূরণ করতে গেলে এমন কোন নিয়ম কি মেনে চলতে হবে? হলে সেগুলো কি কি?

প্রশিক্ষণার্থীগণ যা বলবেন তা ফ্যাসিলিটেটর বোর্ডে / পোস্টার পেপারে লিখবেন এবং ফ্যাসিলিটেটর নিচের ছবিগুলো দেখিয়ে নিয়মের কথা মনে করিয়ে দিতে পারেন। অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে আসা পরামর্শগুলো একটি পোস্টার পেপারে লিখে দেয়ালে লাগিয়ে রাখবেন। অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে আসা সম্ভাব্য উত্তর/পরামর্শগুলো হতে পারে -





- মোবাইল ফোন সাইলেন্ট করে রাখা এবং প্রশিক্ষণ কক্ষে ফোন ব্যবহার না করা।
- প্রশিক্ষণ কক্ষে উপস্থিত থাকা, বাইরে বেরিয়ে না যাওয়া
- প্রতিটি আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শুনা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিজের মতামত প্রদান করা
- অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা
- কোন ব্যক্তি / গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে কোনো কথা না বলা
- পাশাপাশি কথা না বলা
- অপ্রাসঙ্গিক কথা না বলা
- না বুঝলে প্রশ্ন করে জেনে নেয়া
- দলীয় কাজে অংশগ্রহণ করা

দল ভাগ: (সকল অংশগ্রহণকারীদের দিয়ে ৩টি দল তৈরী করা)

প্রক্রিয়া

এরপর ফ্যাসিলিটেটর সংখ্যার গেইমের মাধ্যমে (যেমন- ১,২,৩ গণনা) সকল অংশগ্রহণকারীদের ৩টি দলে ভাগ করবেন। ৩ দিনের প্রশিক্ষণের জন্য ৩টি দলকে দায়িত্ব দিয়ে দিবেন। প্রতিটি দলের মধ্য থেকে একজন দলনেতা তৈরী করবেন। দলনেতা মূলত সারা দিনের প্রশিক্ষণ সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য দায়িত্ব পালন করবেন। যিনি সবাইকে নেতৃত্ব দিবেন। কেউ যদি নিয়ম অমান্য করে তাহলে জরিমানা হিসেবে কি নেয়া যায় সেটা অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকেই পরামর্শ নেয়া হবে।

অংশগ্রহণকারীরা জরিমানার বিষয়ে সরাসরি কোন পরামর্শ না দিলে ফ্যাসিলিটেটর বলবেন; যেহেতু আমরা ব্যবসা করি, মুনাফা বুঝি, টাকা বুঝি; তাই জরিমানা হিসেবে টাকা রাখা হলো এবং এটি ব্যবস্থাপনা কমিটি পরিচালনা করবেন। ৩ দিন শেষে যদি কোন টাকা উঠে তা দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের চকোলেট খাওয়ানো যেতে পারে।

অধিবেশন - ১.৩

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

দিন-১, অধিবেশন-১.৩	: সময়: ৯:৩১-১০.০০	ব্যাপ্তি: ৩০ মিনিট
সেশন শিরোনাম	: প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য	
সেশন লক্ষ্য	: এই অধিবেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।	
উদ্দেশ্য	: এ সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- • প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হবেন • পিকেএসএফ ও প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা পাবেন	
উপকরণ	: পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া	
পদ্ধতি	: ছবি প্রদর্শন, পোস্টার প্রদর্শন	
পঠন উপকরণ	: হ্যান্ডআউট	
পূর্ব প্রস্তুতি	: সহায়ক পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও বোর্ড প্রস্তুত করে রাখবেন।	
মূল্যায়ন পদ্ধতি	: প্রশ্নোত্তর	

আলোচ্য বিষয়: প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

সময়: ৫ মিনিট

প্রক্রিয়া

প্রতিটি কাজেরই কিছু উদ্দেশ্য থাকে। আপনারা যেমন এখানে এই প্রশিক্ষণ থেকে কিছু শেখার প্রত্যাশা করছেন, তেমনি আমরা এই প্রশিক্ষণ সেশনটি আয়োজনের পিছনে কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ঠিক করেছি। এরপর ফ্যাসিলিটের পূর্ব থেকে ব্রাউন পেপারে লেখা পোস্টার প্রদর্শন করে উদ্দেশ্যগুলো এক একটি করে এক একজন অংশগ্রহণকারীকে পড়তে এবং ব্যাখ্যা করতে বলবেন। প্রয়োজনীয় স্থানে ফ্যাসিলিটের নিজে ব্যাখ্যা প্রদান করবেন। মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করেও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা যেতে পারে।

এখন আপনাদের প্রত্যাশা এবং আমাদের প্রত্যাশা গুলি প্রায়ই কাছাকাছি বা কিছুটা অমিল রয়েছে। তারপরেও আমরা ৫ দিন পরে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করবো যে আমাদের কোন কোন প্রত্যাশাগুলি পূরণ হয়েছে বা হয় নাই।

ফ্যাসিলিটের জন্য তথ্য

সাধারণ ব্যবসা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

১. ব্যবসা ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক ধারণা লাভ করা
২. ব্যবসার কাঠামো সম্পর্কে ধারণা লাভ করা
৩. ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনি দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ
৪. সঠিক পরিকল্পনা মারফিক ব্যবসা পরিচালনা করা
৫. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাতকরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা
৬. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং ঝুঁকি নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
৭. ব্যবসা/উদ্যোগ সম্প্রসারণের কৌশল সম্পর্কে ধারণা লাভ

আলোচ্য বিষয়: পিকেএসএফ ও প্রকল্প সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা

সময়: ১০ মিনিট

ফ্যাসিলিটের পিকেএসএফ ও RAISE প্রকল্পের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবেন।

ফ্যাসিলিটের জন্য তথ্য

পিকেএসএফ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসইভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান। প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ, খ্যাতিমান জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ ও মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের পুরোধা ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশংসিত এ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বে রয়েছেন ড. নমিতা হালদার এনডিসি। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব। শীর্ষ এই উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশব্যাপী আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদান করে থাকে। জুলাই ২০২১-এর হিসেব অনুযায়ী, প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ পরিবারকে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক এবং অ-আর্থিক সেবা প্রদান করে পিকেএসএফ। এটি বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের উন্নয়নের বৃহত্তম সংস্থা। সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি ২০০১ সাল থেকে পিকেএসএফ অগ্রসর কর্মসূচির মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগ (microenterprise) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়াও পিকেএসএফ গত ২০ বছর ধরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কারিগরি সহযোগিতা ও অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করেছে।

RAISE প্রকল্প সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন করার লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পল্লী কর্ম-ফ্যাসিলিটের ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি ২০০১ সাল থেকে পিকেএসএফ অগ্রসর কর্মসূচির মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগ (microenterprise) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়াও পিকেএসএফ গত ২০ বছর ধরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কারিগরি সহযোগিতা ও অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করেছে।

এরই ধারাবাহিকতায় শহর ও উপ-শহরাঞ্চলের অনানুষ্ঠানিক খাতের ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা অব্যাহত রাখা, তরুণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ উন্নয়ন ও খাতভিত্তিক কারিগরি বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বেকার তরুণদের কারিগরি ও ব্যবসা বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ বিগত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শুরু করেছে।

১. কোভিড-১৯ এর ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরায় সচল রাখার লক্ষ্যে অর্থায়ন ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
২. পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোগ সম্প্রসারণে অর্থায়ন।
৩. স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ-তরুণীদের Apprenticeship (ওস্তাদ-শিষ্য) পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান।

অধিবেশন -১.৪:

উদ্যোক্তা, উদ্যোগ ও ব্যবসায়ের মৌলিক ধারণা

দিন-১, অধিবেশন-১.৪	:	সময়: ৯:৩১-১০.০০	ব্যাপ্তি: ৩০ মিনিট
সেশন শিরোনাম	:	উদ্যোক্তা, উদ্যোগ ও ব্যবসায়ের মৌলিক ধারণা	
সেশন লক্ষ্য	:	এই অধিবেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা উদ্যোক্তা, উদ্যোগ ও ব্যবসায়ের মৌলিক ধারণা সম্পর্কে জানতে পারবেন।	
উদ্দেশ্য	:	এ সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- - উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা সম্পর্কে ধারণা পাবেন - ব্যবসায়ের মৌলিক ধারণা সম্পর্কে ধারণা পাবেন - বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ছোটো উদ্যোগের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন	
উপকরণ	:	পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া	
পদ্ধতি	:	ছবি প্রদর্শন, পোস্টার প্রদর্শন	
পঠন উপকরণ	:	হ্যান্ডআউট	
পূর্ব প্রস্তুতি	:	সহায়ক পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও বোর্ড প্রস্তুত করে রাখবেন।	
মূল্যায়ন পদ্ধতি	:	প্রশ্নোত্তর	

প্রক্রিয়াঃ সহায়ক নিম্নোক্ত ছবিটি মাল্টিমিডিয়া অথবা প্রিন্ট করে উপস্থিত সবাইকে দেখাবেন।



সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের নিম্নোক্ত প্রশ্নসমূহ করবেন:

- এটা কীসের ছবি?
- এই ফল কি গত ১০ বছর আগে চিনতেন?
- হঠাৎ করে কি পৃথিবীতে এই ফলটা নতুন আবিষ্কার হয়?
- তাহলে নিশ্চয়ই কেউ দেশের বাইরে যেয়ে এই ফল খেয়েছেন এবং নিজের দেশে এই ফল উৎপাদনের স্বপ্ন দেখেছেন?
- যিনি এই স্বপ্ন দেখেছেন তিনি নিশ্চয়ই এই ফলের চাষপদ্ধতি সম্পর্কে শিখেছেন?
- যিনি এই দেশে এই ফল চাষ শুরু করলেন তাকে আমরা কি বলব?
- এই দেশে নতুন ফলের চাষ শুরু হলো সেটাকে আমরা কি বলব? সেটাই কি উদ্যোগ?

উত্তরগুলো নিয়ে ফ্যাসিলিটেটর বোঝাবেন এই ফল বাংলাদেশে আনা এবং চাষ করার জন্য নিশ্চয়ই কাউকে না কাউকে প্রচেষ্টা নিয়ে, প্রশিক্ষণ নিয়ে, অর্থ বিনিয়োগ করে উৎপাদন করতে হয়েছে। এই প্রচেষ্টাকেই বলা হয় উদ্যোগ। আর যিনি এই প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন তাকেই বলা হয় উদ্যোক্তা।

সহায়ক উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্যোগ গ্রহণের গল্প শুনবেন এবং তা থেকে উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা সম্পর্কে আলোচনা করবেন। সহায়ক প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে ভাল সাড়া না পেলে নিম্নোক্ত কেস স্টাডি বড় দলে আলোচনা করে একজনকে উপস্থাপন করতে বলবেন এবং কেস স্টাডির সাথে সম্পর্কিত প্রশ্নগুলো বিভিন্ন জনকে করবেন।

কেস স্টাডি: দিনাজপুরের সেতাবগঞ্জ উপজেলায় আলেয়া বেগম নামের একজন ৩০ বছরের নারী আছেন। তার স্বামী রাইস মিলে কাজ করতেন। তাদের তিনজন সন্তান ছিলেন। তিনজনই স্কুলে লেখাপড়া করতো। আলেয়া বেগমের একটি সেলাই মেশিন ছিল। তিনি ছোট খাট অর্ডারের কাজ ও করতেন। সেখান থেকে তিনি অল্প কিছু টাকা সঞ্চয় ও করেছিলেন। কিন্তু ২০২০ সালের করোনা অতিমারীর সময় তার স্বামীর চাকরী চলে যায়। তিন সন্তান নিয়ে তারা দিশেহারা হয়ে পড়েন। সম্পদ বলতে আলেয়া বেগম আর তার স্বামীর ছিল শুধু বসতবাড়ী আর জমানো কিছু ক্যাশ টাকা। আলেয়া বেগম আর তার স্বামী সিদ্ধান্ত নিলেন যে যদি এই ক্যাশ টাকা আমরা খরচ করি খুব অল্পদিনেই তা ফুরিয়ে যাবে। তখন মাস্ক ছাড়া বাজারে যাওয়াও নিষেধ ছিল। কিন্তু বাজারে তীর মাস্কের সংকট। আলেয়া বেগম তার স্বামীর জন্য একটি কাপড়ের মাস্ক বানিয়ে দিলেন যা খুব আরামদায়ক ছিল এবং বারবার ধুয়ে ব্যবহার করা যেত। দেখাদেখি পাড়া প্রতিবেশীরাও পুরানো কাপড় নিয়ে এলেন মাস্ক বানিয়ে নিতে। বিনিময়ে ৫ টাকা মজুরী দিতেন। এই দেখে দুজনেই সিদ্ধান্ত নিলেন বাজার থেকে সুতি কাপড় কিনে মাস্ক বানাতে লাগলেন আলেয়া বেগম আর তার স্বামী সেই মাস্ক বাজারে দাঁড়িয়ে ফেরী করে বিক্রয় শুরু করলেন। প্রথম দিনেই তার সব মাস্ক বিক্রি হয়ে গেল। আলেয়া বেগম আর তার স্বামী পালাক্রমে রাত জেগে মাস্ক বানাতে লাগলেন। বিক্রি দ্রুত হতে লাগলো। একদিন আলেয়া বেগমের স্বামী বাজারে এক পাইকারের সাথে আলাপ হলো যিনি সেই মাস্ক কিনে ঢাকায় পাঠাতে চাইলেন বিক্রির জন্য। আলেয়া বেগম আরেকটি মেশিন কিনলেন। প্রতিবেশী দুই নারীকে পালাক্রমে সেই কাজে আনলেন। বাড়ির একটি ঘর খালি করলেন সেলাই করা আর মাস্ক রাখার জন্য। এভাবে তার ব্যবসাটি বড় করলেন। পিকেএসএফ -এর সহায়তায় পরিচালিত স্থানীয় এক এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে আরও দুইটি মেশিন কিনলেন এবং ঘর বড় করলেন। যেখানে এখন আরও ৫ জন নারী কাজ করেন। ছোট ব্যবসায়ী থেকে একসময় বড় ব্যবসায়ীতে পরিণত হলেন।

- আলেয়া বেগম আর তার স্বামীর স্বপ্নটাকে আমরা কি উদ্যোগ বলব?
- আলেয়া বেগম আর তার স্বামী কি উদ্যোক্তা?
- আলেয়া বেগমের কি পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল?

- সে কি বাজার চাহিদা যাচাই করেছিল?
- তারা কি অন্যদের কর্মসংস্থান করেছিলেন?
- আলেয়া বেগম নতুন কোন ব্যবসার ধারণার উদ্ভাবন করেছেন?

ফ্যাসিলিটেরদের জন্য তথ্য

উদ্যোগ: উদ্যোগ হলো কোন ভাল ফলাফল অর্জনের জন্য, কোন কিছু সৃষ্টি বা প্রতিষ্ঠার জন্য স্বপ্ন দেখা ও তার বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে মাথায় রেখে কোন ব্যক্তি যখন তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তখন তাকে উদ্যোগ বলে।

উদ্যোক্তা: উদ্যোগ যিনি গ্রহণ করেন ও বাস্তবায়ন করেন এক কথায় তিনিই উদ্যোক্তা। উদ্যোক্তাদের কেন্দ্রবিন্দুতে হল উদ্ভাবনের ধারণা- যে সম্পূর্ণ নতুন কিছু উদ্ভাবন ও বিকাশ করে যা কোন সমস্যার সমাধান করে, একটি উদ্ভাবনী ব্যবসা মানুষের জীবনযাত্রার উপায় পরিবর্তন করতে পারে।

“ উদ্যোক্তা হচ্ছেন এমন ব্যক্তি যিনি নতুন পণ্য উৎপাদন করেন, উৎপাদনের নতুন কৌশল বা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, নতুন বাজার অনুসন্ধান করেন, পণ্যের কাঁচামালের উৎস খোঁজ করেন এবং প্রতিষ্ঠানকে চালিয়ে নেয়া ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করেন”

(Source: J. A Schumpeter “The theory of Economic Development. Harvard University Press, 1959)

উদ্যোক্তাকে প্রভাবিত করার বিষয়সমূহ

প্রক্রিয়া: সহায়ক প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে থেকে কয়েকজনের কাছে একজন উদ্যোক্তাকে প্রভাবিত করার বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে চাইবেন। কেস স্টাডির আলেয়া বেগমের গল্প অনুসারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে উদ্যোক্তাকে প্রভাবিত করার কারণগুলি নির্দেশ করবেন।

- আলেয়া বেগম নিজের অর্থ উপার্জনের জন্য নতুন ব্যবসায়ের ধারণা উদ্ভাবন করেছেন। (অর্থনৈতিক কারণে প্রভাবিত হন)
- আলেয়া বেগম সম্মানজনক পেশা গ্রহণ করতে চেয়েছেন যা তাদের এবং অন্যদের কর্মসংস্থান করবে। (সামাজিক কারণ)
- আলেয়া বেগম ও তার স্বামী একত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। একত্রে উদ্যোগের পরিচালনা ও সম্প্রসারণ করেছেন। (মনস্তাত্ত্বিক)
- করোনার কারণে সবাই মাস্ক ব্যবহারে সচেতন হয়ে ওঠে। বাজারে মাস্কের সরবরাহে স্বল্পতা থাকায় মাস্কের চাহিদা বেড়ে যায়। (পরিবেশত কারণ)

ফ্যাসিলিটেরদের জন্য তথ্য

উদ্যোক্তাকে প্রভাবিত করার কারণগুলি/ উদ্যোক্তা উন্নয়নকে প্রভাবিতকারী উপাদান

উদ্যোক্তারা হলেন সেই ব্যক্তি গ্রহণকারী ব্যক্তি যারা লাভের আশায় আর্থিক ঝুঁকি নিয়ে তাদের নিজস্ব ব্যবসা স্থাপনের জন্য কাজ করে। একজন উদ্যোক্তা প্রথমত অর্থনৈতিক কারণে উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, পরিবেশগত কারণও উদ্যোক্তাকে প্রভাবিত করে থাকে।

অর্থনৈতিক কারণ : অর্থনৈতিক পরিবেশ উদ্যোক্তাদের উপর সবচেয়ে সরাসরি এবং তাৎক্ষণিক প্রভাব ফেলে। এর অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে মানুষের যখন চাকরি বা উপার্জনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকে না তখন প্রয়োজনের কারণে উদ্যোক্তা হয়ে ওঠে। **Approved Index**-এর ট্রিলমি রাজনার মতে “যেসব দেশে দুর্বল অর্থনীতি, বা যেখানে বেকারত্বের হার বেশি, সেখানে নাগরিকরা নিজেদের ছোট থেকে ব্যবসা শুরু করার মাঝে সুযোগ দেখতে পান”। উদ্যোক্তাকে প্রভাবিত করে এমন অর্থনৈতিক কারণগুলির মধ্যে রয়েছে:

মূলধন: মূলধন হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলির মধ্যে একটি, তবুও একটি নতুন ব্যবসা চালু করার সময় সবচেয়ে বড় বাধাগুলির মধ্যে একটি। উদ্যোক্তাদের ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ শুরু করার জন্য মূলধনের প্রয়োজন হয় এবং ধারণাটি সফল হলে দ্রুত ব্যবসা বাড়তে তাৎক্ষণিক মূলধনের প্রয়োজন হয়। তবে ব্যাংক লোন, আত্মীয়-স্বজন বা পরিচিতজনের কাছ থেকে ধার করা সহ একটি নতুন উদ্যোগে অর্থায়ন করার অনেক উপায় রয়েছে।

শ্রম: শ্রমের প্রাপ্যতা উদ্যোক্তাকে প্রভাবিত করে। তবুও, শ্রমের পরিমাণের পরিবর্তে গুণগতমান উদ্যোক্তার উত্থান এবং বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে।

কাঁচামাল: প্রাকৃতিক সম্পদের সমন্বয়ে গঠিত কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তাকে কোনো শিল্প কার্যক্রম প্রতিষ্ঠার জন্য এবং উদ্যোক্তার উত্থানের জন্য জোর দেওয়া প্রয়োজন। কাঁচামালের অনুপস্থিতি উদ্যোক্তা বিকাশে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

মানসিক কারণ: অনেকে বলে যে উদ্যোক্তা হৃদয়ের সত্ত্বাতির জন্য নয়। কিন্তু তাহলে এটা কার জন্য! একজন ব্যক্তি উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য কী লাগে? যদিও একটি ‘আদর্শ’ উদ্যোক্তা বলতে কিছু নেই, শুধু একটি জিনিস স্থির থাকে: উদ্যোক্তার মনোভাব।

আবেগ: একটি নতুন ব্যবসা শুরু করা সহজ কাজ নয় এবং ধারণাটির প্রতি ধারাবাহিক এবং অবিচল প্রতিশ্রুতি এবং এটিকে সাফল্যে পরিণত করার জন্য দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। আবেগ এই প্রতিশ্রুতির জ্বালানী যা উদ্যোক্তাদের ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠতে এবং তাদের রক্ত, ঘাম এবং চোখের জল তাদের ব্যবসায় লাগাতে অনুপ্রাণিত করে।

অর্জনের জন্য প্রয়োজন: উদ্যোক্তারা অর্জনের প্রয়োজনে সবাই স্ব-প্রারম্ভিক (Self-starters)। এই অর্জনের অনুপ্রেরণা শুধুমাত্র আর্থিক লাভের প্রণোদনা দ্বারা চালিত হয় না পাশাপাশি সত্ত্বাতির লাভের দ্বারাও প্রভাবিত হয়। সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য, উদ্যোক্তাদের অনুপ্রেরণা তাদের কর্মীদের এবং অংশীদারদের কাছে পৌঁছাতে তাদের একই অবস্থানে রাখতে এবং তাদের অর্জনের জন্য চালিত করতে হয়।

সহনশীলতা: সহনশীলতা উদ্যোক্তাদের মনোভাবের সাথে আসে যাতে উদ্যোক্তারা পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে যে কোনও পরাজয়ের মুখোমুখি হতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকতে সাহায্য করে। ব্যর্থতা তখন থেকে শেখার এবং হাল ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে চালিয়ে যাওয়ার একটি নিছক পাঠ।

সামাজিক কারণ: সামাজিক কারণগুলি উদ্যোক্তা বাড়াতে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে। প্রকৃতপক্ষে, ইউরোপে শিল্প বিপ্লবকে একটি গৌরবময় সাফল্য এনে দিতে অত্যন্ত সহায়ক সমাজ অনুঘটকের কাজ করেছে। এই জাতীয় কারণগুলি উদ্যোক্তা আচরণকে দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত করে, যা উদ্যোক্তা বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। সামাজিক পরিবেশের প্রধান উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে:

পারিবারিক ইতিহাস: আকার, ধরন এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সহ পারিবারিক পটভূমি উদ্যোক্তাদের প্রভাবিত করতে পারে। তা সত্ত্বেও, উদ্যোক্তা মনোভাব পরিবারে অগত্যা চলে না। কিছু সূত্র অনুসারে, সমস্ত উদ্যোক্তাদের মধ্যে ৫১.৯% তাদের পরিবারে প্রথম ব্যবসা শুরু করেছিলেন। উপরন্তু, সমস্ত উদ্যোক্তার ১% এরও কম অত্যন্ত ধনী বা অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে আসে।

শিক্ষা: শিক্ষা একজন উদ্যোক্তাকে ব্যবসা শুরু করা থেকে বড় করতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভে সহযোগিতা করে। নতুন প্রজন্মের উদ্যোক্তারা শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত আইডিয়া কাজে লাগিয়ে উদ্ভাবনী উদ্যোগের গোড়াপত্তন করছে। এটি উদ্যোক্তা বিকাশের জন্য শিক্ষার গুরুত্বকে নির্দেশ করে।

সামাজিক যোগাযোগ: সমাজের অন্তর্গত আশেপাশের মানুষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং একটি নির্ভরযোগ্য নেটওয়ার্ক গঠন করা অপরিহার্য। সামাজিক নেটওয়ার্ক উদ্যোগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে সহযোগিতা করে।

উদ্যোগ উন্নয়ন ও উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা

প্রক্রিয়া: সহায়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে তাদের উদ্যোগ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে জানতে চাইবেন। সহায়ক আরো জানতে চাইবেন উদ্যোগের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে তারা কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে আশানুরূপ উত্তর না পেলে একটি কেস স্টাডির মাধ্যমে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করবেন।

কেইস স্টাডি:

ইমামুল হাসান বগুড়া জেলা সদরে বাস করেন। তার একটি মোবাইল রিচার্জ, ফোন কল, এবং স্টেশনারির ব্যবসা ছিল। ২০১০ সাল পর্যন্ত তার এই ব্যবসা বেশ রমরমা ছিল। তার আশেপাশে আরও কিছু দোকান ছিল যারা এই ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল। কিন্তু মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হবার পর তার দোকানের কাস্টমার কমতে শুরু করলো। কারণ ইমামুল হাসান এসব কারিগরী জ্ঞানের অভাব ছিল। তার কলেজ পড়ুয়া একটি মেয়ে ছিল। তিনি তার মেয়ের সহায়তায় বিকাশের এজেন্ট নিলেন। এবং তার মাধ্যমে বিল পে, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানির বিল পে, টাকা পাঠান, টাকা তোলা ইত্যাদি কার্যক্রম শুরু করলেন। দোকানের বাইরে প্ল্যাকার্ড ও লাগালেন। তার ব্যবসার খারাপ অবস্থা থেকে আবার লাভজনক হয়ে উঠলো। ব্যবসা সম্প্রসারণের চিন্তা থেকে স্থানীয় একটি ট্রেনিং সেন্টার থেকে মোবাইল সার্ভিসিং-এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি দোকানে মোবাইল এক্সেসরিজ তুললেন। এতে করে দোকানে বেচা-কেনা আরো বেড়ে গেল। সে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে ট্রেড লাইসেন্স করলেন এবং একটি ব্যাংক হিসাব খুললেন। ব্যবসা ভালোভাবে সামলানোর জন্য একজন কর্মচারী নিয়োগ দিলেন। বেশ কিছু টাকা খরচ করে দোকান ডেকোরেশনের কাজ করলেন। সমাজে সফল ব্যবসায়ী হিসেবে তার পরিচিতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

- ইমামুল হাসানের উঠতি ব্যবসার পতন কেন হলো?
- ইমামুল হাসানের মধ্যে কীসের ঘাটতি ছিল?
- তার ব্যবসা আবার কীভাবে লাভজনক হয়ে উঠলো?
- ইমামুল হাসান কি কোন প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন?

ফ্যাসিলিটেশনের জন্য তথ্য

উদ্যোগ উন্নয়ন: উদ্যোগ উন্নয়ন হচ্ছে কোন ব্যবসা বা উদ্যোগে নিজ জ্ঞান, দক্ষতা, সময়, দক্ষ কর্মী, অর্থ ইত্যাদি বিনিয়োগ করা, উপযুক্ত ব্যবসায়িক যোগাযোগ সৃষ্টি, বিনিয়োগকে আকর্ষণীয় করার মাধ্যমে উদ্যোগকে যুগপযোগী ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর করে গড়ে তোলা।

উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা: উদ্যোগের কর্মকান্ডসমূহ সঠিকভাবে লক্ষ্য অর্জনের পথে পরিচালনা করাই হলো উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা। ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন কাজ বা ব্যবসার উদ্দেশ্য বা কোন উদ্যোগকে সঠিকভাবে চালনা করা যায়। উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা হলো কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসাকে সম্পদের কার্যকর সমন্বয়, উদ্যোগের সার্বিক কর্মকান্ড ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের কার্যকর পরিচালনা এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে অবকাঠামো ও আর্থিক পরিকল্পনা করা।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ছোট উদ্যোগের ভূমিকা (ভিডিও উপস্থাপনা)

প্রক্রিয়া: সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তাদের উদ্যোগ কিভাবে ভূমিকা রাখছে তা জানতে চাইবেন। অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তরগুলির সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সূচকের তথ্য মিলিয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোগের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করবেন।

ফ্যাসিলিটেরদের জন্য তথ্য

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশের জীবিকা অর্জনের জন্য কৃষি খাতে ৪০.৬%, ইন্ডাস্ট্রি খাতে ২০.৪% সেবা খাতে ৩৯% জনগোষ্ঠী নিয়োজিত (সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২)। যে কোন দেশের উন্নয়নে কৃষি ও শিল্পখাত মূল্য ভূমিকা পালন করে যার মধ্যে ছোট উদ্যোগের ভূমিকা অপরিসীম।

সম্পদের সঠিক ব্যবহার: ছোট উদ্যোগের মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদের (কঁচামাল ও মানব সম্পদ) সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়। তাছাড়া নতুন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং স্থানীয় বিনিয়োগ সম্ভবপর হয়।

দেশের উৎপাদন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি: ছোট উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন বাড়লে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি: ছোট ছোট উদ্যোগের মাধ্যমে নিত্য নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয় এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হয়। উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে যেমন শিল্প প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে বেকার সমস্যা দূরীকরণেও এর ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

মানবসম্পদ সৃষ্টি: বাংলাদেশ আদমশুমারী ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৫১ লক্ষ। এত ব্যাপক জনসংখ্যার মধ্যে কুটির ও মাইক্রো খাতে উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের প্রায় ৭৮% কর্মসংস্থান হয়ে থাকে। সুতরাং দেশের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে ছোট উদ্যোগের ভূমিকা অপরিসীম।

চাকুরীর উপর নির্ভরশীলতা ও পরনির্ভরশীলতা দূরীকরণ: ছোট উদ্যোগের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে চাকুরীর উপর নির্ভরশীলতা ও পরনির্ভরশীলতা হ্রাস করা সম্ভব হয়। ছোট উদ্যোগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জন সম্ভবপর হয়।

কেইস স্টাডি (সফল ও ব্যর্থ উদ্যোগ)

প্রক্রিয়া: সহায়ক উদ্যোগ সম্পর্কে সকলের ধারণা আরো পরিষ্কার করার লক্ষ্যে দুটি কেস স্টাডি আলোচনা করবেন। সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের যে কোন একপাশ থেকে সংখ্যার গেইমের মাধ্যমে (প্রথমজন ১, দ্বিতীয়জন ২, তৃতীয় জন ১...এভাবে সবাই গণনা করবেন) দুটি দলে ভাগ করবেন। এরপর প্রথম দলকে একটি সফলতার গল্প দিয়ে গ্রুপে আলোচনা করতে বলবেন এবং একইভাবে দ্বিতীয় দলকে ব্যর্থতার গল্প দিয়ে আলোচনা করতে বলবেন (সহায়ক আগে থেকে দুটি কেস স্টাডি প্রিন্ট করে রাখবেন)। গ্রুপে আলোচনা শেষে বড় দলে উভয় গ্রুপ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি উদ্যোগ সফল হওয়ার ও ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন।

সফল উদ্যোগ:

অন্যের জমি বর্গা চাষ করে যা আয় হতো, তা দিয়ে কোনোরকমে চলত মনোয়ারা বেগমের সংসার। অর্ধহারে-অনাহারে কাটত তাঁদের দিন। এর মধ্যে পরিবারে আসে তিন সন্তান। তখন বাড়তি কিছু আয় করতে ডালের বড়ি তৈরি করা শেখেন। দেড় বছর পরই তাঁর এ ব্যবসা জমে ওঠে। মুনাফার টাকায় সংসারে সচ্ছলতা ফেরানোর পাশাপাশি অন্য সহায়-সম্পত্তিও গড়েছেন তিনি।

মনোয়ারা বেগমের (৪৫) বাড়ি সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার গারাদহ ইউনিয়নের গারাদহ দক্ষিণপাড়া গ্রামে। তাঁর স্বামীর নাম নজরুল ইসলাম। ২৫ বছর আগে তাঁদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর তাঁর স্বামী অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষ করতেন। তিন সন্তানের জন্মের পর বেড়ে যায় অভাব-অনটন।



মনোয়ারা বলেন, পাবনা জেলা শহরের শালগাড়িয়া এলাকায় একবার তাঁর বড় ভাইয়ের বাসায় বেড়াতে যান। সেখানে এলাকার নারীদের ডালের বড়ি বানিয়ে তা বাজারে বিক্রি করতে দেখেন। তাঁদের কাছ থেকে তিনি ডালের বড়ি তৈরির প্রক্রিয়াটি শিখে আসেন। এরপর বাড়িতে এসে তিনিও বড়ি বানানো শুরু করেন।

২০০১ সালে ১৫ কেজি অ্যাংকর ডাল কিনে এনে বড়ি বানান। এতে লাভ হয় ৩০০ টাকা। এরপর ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। মাত্র দেড় বছরেই তাঁর এই ব্যবসা জমে ওঠে। এরপর এই বড়ি তৈরির ব্যবসার মুনাফার টাকায় সংসার চালানোর পাশাপাশি দুটি গাভি, তিনটি ছাগল, হাঁস-মুরগি কিনে লালনপালন করেন। এভাবে ঘুচে যায় তাঁর সংসারের অভাব। এ বড়ি তৈরির টাকাতেই নিজের থাকার জন্য ঘর তুলেছেন, দুই ছেলেকে ঘর তুলে দিয়েছেন, কিনেছেন ডাল ভাঙানোর যন্ত্র। এখন এই কাজে তাঁর পরিবারের সদস্যসহ ১২ জন নারী তাঁকে সহায়তা করছেন।

মনোয়ারা বলেন, প্রথমে প্রতিদিন ১০ ঘণ্টা ধরে পানিতে ভেজানো ডাল পাটায় বেটে নিতেন। এরপর বাড়ির উঠানে রোদে বসে টিনে নারকেল তেল মাখিয়ে তাতে ডালের বড়ি তৈরি করে শুকাতে দিতেন। বড়ি শুকাতে দুই-তিন দিন লাগত। দিনে কত কেজি মাষকলাই ডালের বড়ি তৈরি করতে পারেন, এ প্রশ্নে মনোয়ারা বলেন, একজনের পক্ষে দিনে পাঁচ কেজি বড়ি তৈরি করা সম্ভব। ১০ কেজি ডালে ৯ কেজি বড়ি হয়। প্রতি কেজি মাষকলাই ডালের বড়ি তৈরিতে ১৬০-২০০ টাকা খরচ হয়। বিক্রি হয় ৩০০-৩৫০ টাকায়। অ্যাংকর ডালের বড়ি তৈরিতে খরচ হয় প্রতি কেজি ৮০ টাকা, বিক্রি হয় ১২০ টাকায়। এখন প্রতি সপ্তাহে লাভের টাকা থেকে ঋণের কিস্তি শোধ করেন। আর তাঁর স্বামীকে একটি নাগরদোলা কিনে দিয়েছেন। মেলায় মেলায় গিয়ে তিনি এ নাগরদোলা চড়িয়ে আয় করছেন।

মনোয়ারা বলেন, এখন সংসারে অভাব না থাকলেও অভাবের দিনগুলো ভোলেননি তিনি। তাই নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার পর থেমে থাকেননি। তিনি গ্রামে ঘুরে ঘুরে দুস্থ মেয়েদের বড়ি তৈরি করা শিখিয়ে স্বনির্ভর হতে সহযোগিতা করছেন।

তথ্যসূত্র: <https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/2200a20119>

ব্যর্থ/অসফল উদ্যোগ:

জনাব আমিনুল ইসলাম তার স্ত্রী-সহ টাকায় থাকেন। তার স্ত্রী অন্যের বাসায় কাজ করে। তিনি দৈনিক মজুরীভিত্তিক পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু এই পেশা নিয়মিত না হওয়ায় তার রোজগারের কোন ঠিক ছিলনা। তার দুই সন্তান গ্রামে থেকে লেখাপড়া করতো। তার স্ত্রীর পক্ষে একা সংসার চালানো কষ্টকর হয়ে পরায় প্রায়শই সংসারে ঝগড়াঝাটি লেগে থাকতো।

আমিনুল ইসলাম যেখানে থাকতেন তার বাসার কাছেই একটা আইসক্রীমের ফ্যাক্টরী ছিল। তিনি একদিন ফ্যাক্টরীতে যেয়ে খোজ নিয়ে আসলেন যে সেখান থেকে পাইকারী দরে আইসক্রীম কিনে বিক্রি করে কিছু লাভ করা যাবে।

সেই অনুযায়ী তিনি তার স্ত্রীর কাছ থেকে কিছু অর্থ ধার নিয়ে আইসক্রীম বিক্রির গাড়ি এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কিনলেন। অতঃপর প্রতিদিন ফ্যাক্টরী থেকে আইসক্রীম ও পর্যাপ্ত পরিমাণে বরফ কিনে এনে নিকটস্থ স্কুলগুলির সামনে বিক্রি শুরু করলেন। প্রথম দিন থেকে তার বিক্রি ভাল ছিল এবং তিনি ভাল মুনাফাও করতে শুরু করলেন। কিন্তু তার নিজস্ব ফ্রিজ না থাকায় অবিক্রিত আইসক্রীম নষ্ট হয়ে যেতো। এদিকে ফ্যাক্টরীর সাথে যোগাযোগ করেও সেখানে সাময়িকভাবে আইসক্রীম রাখার কোন ব্যবস্থা তিনি করতে পারলেন না বিধায় যা লাভ হতো তা হাতে থাকতো না। এদিকে সাপ্তাহিক ছুটির বাইরে কোন ছুটি থাকলে তিনি পূর্ব অবগত না হবার কারণে তখনও আইসক্রীম নষ্ট হতো। এভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় তার একসময় তার সম্ভাবনাময় ব্যবসা বন্ধ করে দিতে তিনি বাধ্য হলেন।

অধিবেশন -১.৫:

উদ্যোক্তার শ্রেণীবিভাগ

দিন-১, অধিবেশন-১.৫

: সময়: ৯:৩১-১০.০০

ব্যাপ্তি: ৩০ মিনিট

সেশন শিরোনাম

: উদ্যোক্তার শ্রেণীবিভাগ

সেশন লক্ষ্য	:	এই অধিবেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা উদ্যোক্তার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
উদ্দেশ্য	:	এ সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- - উদ্যোক্তার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে জানতে পারবেন
উপকরণ	:	পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া
পদ্ধতি	:	ছবি প্রদর্শন, পোস্টার প্রদর্শন
পঠন উপকরণ	:	হ্যান্ডআউট
পূর্ব প্রস্তুতি	:	সহায়ক পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও বোর্ড প্রস্তুত করে রাখবেন।
মূল্যায়ন পদ্ধতি	:	প্রশ্নোত্তর

- উদ্দেশ্য: এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ উদ্যোক্তার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে অবগত হবেন।
- সময়: ১ ঘণ্টা
- উপ-বিষয়সমূহ:
 - বিদ্যমান উদ্যোক্তা বনাম নতুন উদ্যোক্তা
 - ছোটো উদ্যোক্তা ও বড় উদ্যোক্তা
 - গতানুগতিক উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবনী উদ্যোক্তা
 - তরুণ উদ্যোক্তা
 - নারী উদ্যোক্তা
 - সামাজিক উদ্যোক্তা
 - শিক্ষা উদ্যোক্তা (Edupreneurship)
 - স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা (Health Entrepreneurship)
 - পর্যটন উদ্যোক্তা
 - বিনোদন উদ্যোক্তা
 - কৃষি উদ্যোক্তা
 - ডিজিটাল উদ্যোক্তা
- পদ্ধতি: ছোট দলে আলোচনা করে বড় দলে উপস্থাপনা
- প্রয়োজনীয় উপকরণ: হোয়াইট বোর্ড, পোস্টার পেপার, মার্কার, ছবি

প্রক্রিয়া: সহায়ক সকল অংশগ্রহণকারীকে তাদের উদ্যোগের ধরণ সম্পর্কে জানতে চাইবেন। এছাড়াও তারা আশে-পাশে যেসকল উদ্যোগ দেখে তা উল্লেখ করতে সহায়ক অনুরোধ করবেন। প্রাপ্ত উত্তরগুলি সহায়ক/কো-সহায়ক বোর্ডে লিখবেন। এরপর বিভিন্ন উদ্যোগের সাথে জড়িত উদ্যোক্তার শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আলোচনা করবেন।

ফ্যাসিলিটেরদের জন্য তথ্য

উদ্যোক্তার শ্রেণীবিভাগঃ

সামাজিক উদ্যোক্তা: একটি সমাজ সচেতন উদ্যোগের পরিচালনা করা যা সামাজিক উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে, যেমন খাদ্য, অর্থ, শিক্ষা, চিকিৎসার সুবিধা। এই ধরনের উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য হলো দেশ এবং সমাজকে উন্নত করা (যদিও চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বাস্তবিকভাবে মুনাফা অর্জন) করা। সহজ ভাষায় ব্যবসার পরিচালনার মাধ্যমে সমাজ সেবা করার উদ্যোগ গ্রহণকারীই হলো সামাজিক উদ্যোক্তা।

ছোট ব্যবসা উদ্যোক্তা: বেশিরভাগ ব্যবসাই ছোট ব্যবসা। ছোট ব্যবসা উদ্যোক্তা প্রায়ই যখন একজন ব্যক্তি মালিকানাধীন এবং তার নিজস্ব ব্যবসা পরিচালনা করে। তারা সাধারণত স্থানীয় কর্মচারী এবং পরিবারের সদস্যদের ভাড়া করে। স্থানীয় মুদি দোকান, হোয়ারডেসার, ছোট বুটিক, প্লাম্বার মিস্ত্রি ইত্যাদি এই শ্রেণীর উদ্যোক্তাদের একটি অংশ।

বড় কোম্পানির উদ্যোক্তা: বড় কোম্পানির উদ্যোক্তা হল যখন একটি কোম্পানির উদ্যোক্তা। বড় কোম্পানিগুলো বাজারের চাহিদা মেটাতে ভোক্তাদের পছন্দের ভিত্তিতে নতুন সেবা এবং পণ্য তৈরি করে। ছোট ব্যবসার উদ্যোক্তা বড় কোম্পানির উদ্যোক্তায় পরিণত হতে পারে যখন কোম্পানি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। আবার বড় কোম্পানী দ্বারা তাদের অধিগ্রহণের মাধ্যমেও ছোট ব্যবসা বড় কোম্পানীতে পরিণত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ -আজাদ প্রোডাক্টস। ছোট প্রতিষ্ঠান থেকে বড় কোম্পানীতে পরিণত হয়েছে।

স্টার্টআপ উদ্যোক্তা: এই ধরনের উদ্যোক্তারা বিশ্বাস করে যে তাদের কোম্পানি বিশ্বকে পরিবর্তন করতে পারে। তারা প্রায়ই ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টদের কাছ থেকে তহবিল গ্রহণ করে এবং বিশেষ কর্মচারী নিয়োগ করে। স্টার্টআপগুলি বাজারে অনুপস্থিত জিনিসগুলি সন্ধান করে এবং তাদের জন্য সমাধান তৈরি করে। এই ধরনের অনেক ব্যবসাই প্রযুক্তি-কেন্দ্রিক। তারা দ্রুত সম্প্রসারণ করে এবং বড় মুনাফা

অর্জন করে। এ ধরনের উদ্যোগে ঝুঁকির পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। Pathao, Facebook, Instagram, Uber ইত্যাদি কোম্পানিগুলো ছোট স্টার্টআপ হিসেবে তাদের ব্যবসা শুরু করে।

উদ্ভাবনী উদ্যোক্তা: উদ্ভাবনী উদ্যোক্তা হলেন এমন ব্যক্তি যারা প্রতিনিয়ত নতুন ধারণা এবং উদ্ভাবন নিয়ে আসছেন। তারা এই ধারণাগুলি গ্রহণ করে এবং তাদের ব্যবসায়িক উদ্যোগে পরিণত করে। উপরের গল্পে আলেয়া বেগমকে আমরা উদ্ভাবনী উদ্যোক্তা হিসেবে দেখতে পাই। উদ্ভাবনী উদ্যোক্তা মানুষের উন্নতির জন্য জীবনযাপনের উপায় পরিবর্তন করার উপায় অনুসন্ধান করেন। এরা খুব অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহী মানুষ হয়ে থাকে। তারা তাদের পণ্য এবং পরিষেবাগুলিকে বাজারের অন্যান্য জিনিস থেকে আলাদা করার উপায়গুলি সন্ধান করে। স্টিভ জবস এবং বিল গেটসের মতো ব্যক্তির সফল উদ্ভাবনী উদ্যোক্তাদের উদাহরণ।

হস্টলার উদ্যোক্তা: যারা কঠোর পরিশ্রম করতে ইচ্ছুক এবং নিরন্তর প্রচেষ্টা চালায় তারা হস্টলার উদ্যোক্তা হিসাবে বিবেচিত হয়। তারা প্রায়শই ছোট শুরু করে এবং পুঁজির পরিবর্তে কঠোর পরিশ্রম দিয়ে একটি বড় ব্যবসা বাড়ানোর দিকে কাজ করে। তাদের আকাঙ্ক্ষাই তাদের অনুপ্রাণিত করে এবং তারা তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য যা লাগে তা করতে ইচ্ছুক। তারা সহজে হাল ছেড়ে দেয় না এবং তারা যা চায় তা পেতে চ্যালেঞ্জগুলি অনুভব করতে ইচ্ছুক। উদাহরণ স্বরূপ, কেউ একজন হস্টলার একটি বিক্রি করার জন্য অনেক লোককে কল করতে ইচ্ছুক।

অনুকরণকারী উদ্যোক্তা: অনুকরণকারীরা হলেন উদ্যোক্তা যারা অন্যের ব্যবসায়িক ধারণাগুলিকে অনুপ্রেরণা হিসেবে ব্যবহার করে। তারা নির্দিষ্ট পণ্য এবং পরিষেবাগুলিকে আরও ভাল এবং আরও লাভজনক করতে চায়। নিজেদের ব্যবসা করার সময় তারা অন্যের ভুল থেকে শিখতে পারে।

গবেষক উদ্যোক্তা: গবেষকরা তাদের নিজস্ব ব্যবসা শুরু করার সময় তাদের সময় নেয়। তারা একটি পণ্য বা পরিষেবা অফার করার আগে যতটা সম্ভব গবেষণা করতে চান। তারা বিশ্বাস করে যে সঠিক প্রযুক্তি এবং তথ্যের সাথে তাদের সফল হওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন গবেষক নিশ্চিত করে যে তারা তাদের ব্যবসার প্রতিটি দিক বোঝে এবং তারা কী করছে তার গভীরতর ধারণা রয়েছে। তারা তাদের অন্তর্দৃষ্টির পরিবর্তে তথ্য, তথ্য এবং যুক্তির উপর নির্ভর করে। বিস্তারিত ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের ব্যর্থতার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।

ক্রেতা উদ্যোক্তা: একজন ক্রেতা হল এক ধরনের উদ্যোক্তা যারা তাদের সম্পদ ব্যবহার করে তাদের ব্যবসায়িক উদ্যোগে জ্বালানি দেয়। তাদের বিশেষত্ব হল তাদের ভাগ্য ব্যবহার করে ব্যবসা কেনার জন্য যা তারা মনে করে সফল হবে। তারা প্রতিশ্রুতিশীল ব্যবসা শনাক্ত করে এবং তাদের অধিগ্রহণ করার চেষ্টা করে। তারপর, তারা প্রয়োজনীয় বোধ করে এমন কোনো ব্যবস্থাপনা বা কাঠামোগত পরিবর্তন করে। তাদের লক্ষ্য হল তারা যে ব্যবসাগুলি অর্জন করে তা বৃদ্ধি করা এবং তাদের লাভ প্রসারিত করা। এই ধরনের উদ্যোক্তা কম ঝুঁকিপূর্ণ কারণ তারা ইতিমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলি ক্রয় করছে।

২য় দিন

অধিবেশন -২.১:

ব্যবসার কাঠামো

দিন-১, অধিবেশন-২.১

: সময়: ৯:৩১-১০.০০

ব্যাপ্তি: ৩০ মিনিট

সেশন শিরোনাম	:	উদ্যোক্তার শ্রেণীবিভাগ
সেশন লক্ষ্য	:	এই অধিবেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষার্থীরা ব্যবসার কাঠামো সম্পর্কে জানতে পারবেন।
উদ্দেশ্য	:	এ সেশন শেষে প্রশিক্ষার্থীগণ- - উদ্যোক্তার ব্যবসার বিভিন্ন কাঠামো সম্পর্কে জানতে পারবেন
উপকরণ	:	পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া

পদ্ধতি	:	ছবি প্রদর্শন, পোস্টার প্রদর্শন
পঠন উপকরণ	:	হ্যান্ডআউট
পূর্ব প্রস্তুতি	:	সহায়ক পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও বোর্ড প্রস্তুত করে রাখবেন।
মূল্যায়ন পদ্ধতি	:	প্রশ্নোত্তর

- উদ্দেশ্য: এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ ব্যবসার কাঠামো সম্পর্কে অবগত হবেন।
- সময়: ১ ঘণ্টা
- উপ-বিষয়সমূহ:
 - উদ্যোগের কাঠামোগত বিশ্লেষণ
 - একক মালিকানা
 - অংশীদারিত্ব
 - সমবায় (কো-অপারেটিভ)
 - লিমিটেড কোম্পানী
 - পারিবারিক উদ্যোগ বনাম আইনি কাঠামোর আওতায় গড়ে উঠা উদ্যোগ
 - প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্যোগের ধরণ সনাক্তকরণ (একক কাজ/দলীয় অনুশীলন)
- পদ্ধতি: বড় দলে আলোচনা
- প্রয়োজনীয় উপকরণ: হোয়াইট বোর্ড, পোস্টার পেপার, মার্কার, ছবি

প্রক্রিয়া: সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের তাদের ব্যবসায়ের মালিকানা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। প্রত্যেকের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য বোর্ডে লিখবেন। এরপর সবাইকে বাংলাদেশের সুপরিচিত কয়েকটি কোম্পানির নাম বলতে বলবেন এবং সেসব কোম্পানির মালিকানার ধরণ কোন ধরণের (এক মালিকানাধীন/অংশীদারি/যৌথ মূলধনী/সমবায়) তা জানতে চাইবেন। অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে সঠিক তথ্য না পেলে সহায়ক মালিকানার ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যবসায়ের ধরণ সম্পর্কে আলোচনা করবেন। প্রত্যেক ধরণের ব্যবসার ধরণ ও আইনগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক উদাহরণ দিবেন।

ফ্যাসিলিটেরদের জন্য তথ্য

মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায়ের ধরণ:

একক মালিকানাঃ

ব্যবসার একমাত্র মালিক হিসেবে ব্যবসাটি সম্পূর্ণরূপে আপনার মালিকানাধীন থাকবে এবং ব্যবসার সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার শুধুমাত্র আপনারই থাকবে। ব্যবসা শুরু করার জন্য একক মালিকানা একটি সহজ ও স্বল্প ব্যয়ের গঠন কাঠামো। কিন্তু এটি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কারণ ব্যবসার সম্পূর্ণ দায়ভার এককভাবে আপনার উপর ন্যস্ত। ব্যবসা যদি বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, তবে পাওনাদাররা বকেয়া পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আপনার যে কোন সম্পত্তি দায়বদ্ধ রাখতে পারেন।

অংশীদারিত্বঃ

যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে ব্যবসা শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তারা একটি অংশীদারিত্ব গঠন করতে পারেন। একটি অংশীদারিত্ব ব্যবসা শুরু করা বেশ সহজ এবং খরচও তুলনামূলক কম। একটি অংশীদারিত্ব গঠন করার জন্য অংশীদারগণ একটি অংশীদারিত্ব চুক্তিতে আবদ্ধ হন। অংশীদারিত্ব চুক্তিটি অবশ্যই লিখিত আকারে হবে এবং এটি মূলত ভুল বোঝাবুঝি এড়ানোর জন্য করা হয়ে থাকে। একটি অংশীদারিত্ব চুক্তিতে যা থাকেঃ

- আপনার ব্যবসার লাইন-এর বিবরণ
- ব্যবসার লাভ বা ক্ষতি কিভাবে অংশীদারদের মাঝে বন্টন হবে।
- প্রত্যেক অংশীদারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

অংশীদাররা সম্মিলিতভাবে ব্যবসার সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, যদি না তারা সবাই মিলে কোন একজনকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব দেন। এটা খেয়াল রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদি একজন অংশীদার অন্যান্য অংশীদারদের পক্ষ থেকে কোন চুক্তি সম্পাদন করেন তবে সেই চুক্তি সকল অংশীদারকে আবদ্ধ করবে।

একক মালিকানার বিপরীতে, অংশীদারিত্ব ব্যবসার সুবিধা হল যে, এতে একাধিক ব্যক্তির দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা যুক্ত হয় এবং ব্যবসার প্রয়োজনীয় প্রারম্ভিক মূলধন এর দায়িত্ব সকলের উপর বিভক্ত থাকে।

সমবায় (কো-অপারেটিভ)

একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু সংখ্যক মানুষ একত্রে কাজ করার উদ্দেশ্যে সমবায় গঠন করে। সমবায় গঠনের মূল উদ্দেশ্য হল এর সদস্যের অর্থনৈতিক উন্নতি অথবা তাদের নির্দিষ্ট কোন সেবা প্রদান করা। উদাহরণস্বরূপ সেবাগুলো এমন হতে পারে যে, সমবায়ের প্রচার কার্য পরিচালনা অথবা কোন কাচামালের সরবরাহ ভাগ করে নেওয়া। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যের একটি কড়া ভোট থাকবে। তবে সমবায় দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তারা সাধারণ একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও নিয়োগ করে থাকে।

প্রত্যেক সদস্য সমবায়ের শেয়ার ক্রয় করেন এবং সদস্য পদের জন্য ফি প্রদান করেন। প্রত্যেক সদস্যের শেয়ার এর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে সাধারণ আর্থিক ঝুঁকি খুব বেশি থাকে না।

লিমিটেড কোম্পানী

একটি লিমিটেড কোম্পানির একাধিক মালিক থাকে, যাদেরকে শেয়ার হোল্ডার বলা হয়। ব্যবসায় সব মালিক সক্রিয়ভাবে কাজ করতেও পারেন আবার নাও পারেন, অথবা কিছু মালিক সক্রিয়ভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারেন। যেখানে বাকি মালিকগণ শুধুই বিনিয়োগকারী হিসেবে থাকেন।

একটি লিমিটেড কোম্পানি করার জন্য আপনাকে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে:

ধাপ-১: আপনি আপনার ব্যবসার জন্য যে নামটি পছন্দ করেছেন তা অবশ্যই ‘রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি’ অথবা অনুরূপ কোন কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

ধাপ-২: নাম অনুমোদনের পর যাপনার প্রস্তাবিত কোম্পানির ‘মোমোরেন্ডাম’ এবং ‘আর্টিকেলস অফ এসোসিয়েশন’ তৈরি করতে হবে।

ধাপ-৩: রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি অথবা অনুরূপ কর্তৃপক্ষের কাছে মোমোরেন্ডাম ও আর্টিকেলস অফ এসোসিয়েশন টি নথিভুক্ত হবে।

ধাপ-৪: রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এবার ইনকর্পোরেশন এর সার্টিফিকেট প্রদান করবে, যার অর্থ হল আপনার লিমিটেড কোম্পানি এখন গঠিত।

লিমিটেড কোম্পানির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল-এর শেয়ার হোল্ডারদের ঝুঁকি অনেক কম। একটি লিমিটেড কোম্পানিতে ব্যবসার তৈরিকৃত বকেয়ার জন্য শেয়ার হোল্ডাররা ব্যক্তিগত ভাবে দায়বদ্ধ নন।

আরেকটি সুবিধা হল যে লিমিটেড কোম্পানি কে সাধারণত অনেক স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হয়, যা ঋণ প্রদানকারী, সরবরাহকারী ও ক্রেতাদের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধাজনক হয়।

একটি লিমিটেড কোম্পানি গঠন করার যথেষ্ট জটিল ও ব্যাবহল। লিমিটেড কোম্পানি আপনার জন্য সঠিক ধরন হবে কিনা, তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার সবসময়ই উচিত একজন আইনজীবী বা আইনি বিশেষজ্ঞের সহায়তা নেওয়া। সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াগুলিকে উত্তসাহিত করার জন্য, শেয়ারহোল্ডাররা একটি বোর্ড অফ ডিরেক্টরস নিয়োগ করবেন, যারা ব্যবসার ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী থাকবেন। বোর্ড অফ ডিরেক্টরস পালক্রমে ব্যবসা পরিচালনার জন্য এক বা একাধিক ম্যানেজার নিয়োগ করতে পারেন। শেয়ারহোল্ডার, বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এবং ম্যানেজার একই ব্যক্তি হতে পারেন।

ব্যবসায়ের সঠিক কাঠামো নির্বাচনঃ

প্রক্রিয়া: সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে যেকোন ৪ জনকে বোর্ডে আসার জন্য অনুরোধ করবেন এবং নিম্নের ছক অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৪ ধরনের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে উল্লেখিত বিষয়গুলির গুরুত্ব বা প্রভাব নিয়ে জানতে চাইবেন। এরপর চারটি ব্যবসার বৈধ রূপ এর মধ্যে পার্থক্যগুলো বিবেচনা করে কোন ব্যবসার রূপটি/ধরণটি তার জন্য উপযুক্ত তা নির্ধারণ করতে বলবেন।

বিবেচনার ক্ষেত্র	একক মালিকানা	অংশীদারিত্ব	সমবায় (কো-অপারেটিভ)	লিমিটেড কোম্পানি
রেজিস্ট্রেশন				
ব্যবসা শুরুর খরচ				
আইনগত জটিলতার মাত্রা				
মালিকের সংখ্যা				
মালিকের দ্বায়				
সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি				
কর (ট্যাক্স)				

অধিবেশন -২.২:

উদ্যোক্তা উন্নয়ন

দিন-১, অধিবেশন ২.২

: সময়: ৯.৩০-১০.০০

ব্যাপ্তি: ৩০ মিনিট

সেশন শিরোনাম	: পরিচিতি পর্ব
সেশন লক্ষ্য	: এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ উদ্যোক্তা উন্নয়নের বিষয়ে অবগত হবেন।
উদ্দেশ্য	: এ সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- • অংশগ্রহণকারীগণ উন্নয়ন সম্পর্কে জানতে পারবেন • অংশগ্রহণকারীগণ উদ্যোগ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবে
উপকরণ	: ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, অডিও/ভিডিও মিউজিক, পোস্টার পেপার/বোর্ড, মার্কার
পদ্ধতি	: ভিপিআর, পোস্টার পেপার প্রদর্শন, গল্প বলা, প্রশ্নোত্তর, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা
পঠন উপকরণ	: হ্যান্ডআউট
পূর্ব প্রস্তুতি	: সহায়ক পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও বোর্ড প্রস্তুত করে রাখবেন।
মূল্যায়ন পদ্ধতি	: প্রশ্নোত্তর

কেন উদ্যোক্তা হলেন?

প্রক্রিয়া: সহায়ক প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে উদ্যোক্তা হবার কারণ জানতে চাইবেন। প্রাপ্ত উত্তরগুলিকে বোর্ডে লিখবেন এবং সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন। এরপর সহায়ক নিয়ে উল্লেখিত দুটি গল্প বলে উল্লেখিত প্রশ্নগুলি জানতে চাইবেন।

গল্প ১:

জনাব আব্দুল্লাহ সরকার একজন প্রবাসী বাংলাদেশী ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ২০ বছর শ্রমিক হিসাবে কাজ করেছেন। অবশেষে ২০১৮ সালে তিনি দেশে ফেরত আসেন। দেশে ফেরত এসে তিনি মুদির ব্যবসা শুরু করলেন। প্রথমে বাজারে ছোট একটি দোকান দিলেন। বছর না ঘুরতেই সেই দোকান বড় হলো। আরো এক বছর পরে তিনি পণ্যের ডিলারশীপ নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন। এভাবে তিনি একজন বড় ব্যবসায়ীতে পরিণত হলেন। বাড়ি করলেন, জমি কিনলেন, মেয়ের বিয়ে দিলেন, ব্যাংক ব্যালেন্স ও করলেন। হঠাৎ একদিন একটি দুর্ঘটনায় তিনি পা হারালেন। কিন্তু মনোবল হারালেন না। তার ছেলে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। ছেলের সহায়তায় ব্যবসা চালিয়ে গেলেন। ছেলে পড়া শেষ করে পিতার ব্যবসায় যোগ দিলেন। ব্যবসার প্রবৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ রইলো।

গল্প ২:

জনাব আহসান উদ্দীন স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে কর্মরত একজন কর্মকর্তা। শুধু বেতন-ভাতা থেকে আয় দিয়ে টানাটুনিতে সংসার চালাতেন। এক ছেলে এক মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। আহসান উদ্দীন যখন অবসরে যাবেন তখন ধার দেনা করে কণ্ডার বিয়ে দিলেন। এদিকে ছেলের পড়া শেষ হয়নি। পিতার অবসরের আগে ছেলে বহু চেষ্টায় একটি প্রাইভেট ফার্মে স্বল্প বেতনে চাকুরী নিলেন। আহসান উদ্দীনের অবসরের পর সিংহভাগ এককালীন সঞ্চয়ের টাকা ধার দেনা শোখে ব্যয় হলো বাকীটা ব্যয় হলো স্ত্রীর চিকিৎসায়। পেনশনের টাকায় আর ছেলের বেতনে বহু কষ্টে তাদের সংসার চলছিল। ছেলের উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন আর বাস্তবায়িত হলোনা।

- দুইটি গল্প থেকে আমরা কি বুঝলাম?
- প্রতিষ্ঠিত কর্মকর্তার সন্তান কি তার পিতার অবস্থান ধারণ করতে পারেন?
- প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর সন্তান কি তার পিতার অবস্থান ধারণ করতে পারেন?
- কোন ধরনের কর্মসংস্থান বেশী টেকসই?
- কোন ধরনের কর্মসংস্থানে আয়ের পরিমাণ নিয়মিত?

উদ্যোগ পরিচালনায় সীমাবদ্ধতাসমূহ/ প্রতিবন্ধকতাসমূহ

প্রক্রিয়া: সহায়ক প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে তাদের উদ্যোগ পরিচালনায় যেসকল প্রতিবন্ধকতা বা সীমাবদ্ধতাসমূহের সম্মুখীন হয়েছেন তা জানতে চাইবেন। প্রাপ্ত উত্তরগুলি বোর্ডে লিখবেন। এরপর পূর্বে লিখে রাখা একটি তালিকা সামনে রেখে আলোচনা করবেন।

ফ্যাসিলিটেরদের জন্য তথ্য

উদ্যোগ পরিচালনায় সীমাবদ্ধতাসমূহ/ প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- সূষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব
- চাকুরীর প্রতি অধিক আগ্রহ
- সঠিক ব্যবসায় ও কারিগরী জ্ঞানের অপরিপূর্ণতা
- প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের অভাব
- প্রশিক্ষণের অপরিপূর্ণতা
- রাজনৈতিক অস্থিরতা
- হিসাবরক্ষণের অভাব
- সঠিক আর্থিক পরিকল্পনার অভাব ও মাত্রাতিরিক্ত ঝুঁকি
- উদ্যোগ বিষয়ক স্পষ্ট ধারণার অভাব
- ব্যবস্থাপনার অভাব
- বিক্রয় ও বিপণন জ্ঞানের অভাব

➤ একজন সফল উদ্যোক্তার উদাহরণ

মোস্তারী রহমানের বাবা মোস্তাফিজুর রহমান পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। বগুড়া শহরের ফতেহ আলী বাজারে তাঁর ডিমের ব্যবসা ছিল। মা সুলতানা রাজিয়া একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী ছিলেন। তিন বোনের মধ্যে সবার বড় মোস্তারী।

বগুড়া সরকারি পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে ২০১২ সালে ডিপ্লোমা শেষ করার পর নিজের পছন্দে সহপাঠী সোহেল রানাকে বিয়ে করেন মোস্তারী। বিয়ের পর স্বামী ও মোস্তারী দুজনই উপসহকারী প্রকৌশলী পদে চাকরি নেন নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুরের সিনহা টেক্সটাইলে। মোস্তারী ল্যাবরেটরিতে আর সোহেল ইলেকট্রিক্যাল বিভাগে। দুজনের আয়ে ভালোই চলছিল সংসার। মোস্তারী রহমান তখন ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা। ২০১৫ সালের ২২ আগস্ট। বেলা ১১টার দিকে সোহেল রানাকে সঙ্গে করে সিনহা টেক্সটাইলের নিজস্ব চিকিৎসাকেন্দ্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে বাসায় ফিরছিলেন। বাসের অপেক্ষায় সড়কের এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরা। মোস্তারী রহমান বলেন, ‘হঠাৎ কাঁচপুর ব্রিজের ওপর থেকে বেপরোয়া গতির একটা ট্রাক এসে উঠে পড়ে। এক হাতে ধাক্কা দিয়ে কোনো রকমে সোহেলকে রাস্তার পাশে ফেলে দিই। চোট পেলেও প্রাণে রক্ষা পায় ও। কিন্তু আমার পায়ের ওপর উঠে পড়ে ট্রাকের চাকা। পিষ্ট হয়ে অকেজো হয়ে যায় ডান পা। বাঁ পা হাঁটুর চার ইঞ্চি ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর কিছুই আর মনে নেই।



বাকি ঘটনা শোনালেন সোহেল রানা, ‘রাজধানীর পশু হাসপাতালে এক দফা অস্ত্রোপচারের পর বাঁ পায়ে রগ কাজ করছিল না। ওই দিনই জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে নিয়ে আরেক দফা অস্ত্রোপচার করা হয়। এরপর স্কয়ার, অ্যাপোলো, ঢাকা মেডিকেল হয়ে মোস্তারীকে নেওয়া হয় বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে টানা দুই মাস। পায়ে তত দিনে পচন ধরেছে। সন্তানের কথা ভেবে ঝুঁকি নিয়েই সিজারিয়ান করেন চিকিৎসকেরা। অস্ত্রোপচারের ২০ ঘণ্টার মাথায় মারা যায় নবজাতক কন্যা।



পায়ের কাটা পচে আরও অবনতি হলো। ‘চিকিৎসার জন্য আমাকে ভারতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হলো,’ দুঃসহ দিনগুলোর স্মৃতিচারণা করছিলেন মোস্তারী। ডিমের ব্যবসার পুঁজি আর ধারদেনা করে কিছু টাকাপয়সা জোগাড় করলেন মা-বাবা। ভারতের ভেলোরে সিএমসি হাসপাতালে ভর্তি করানো হলো। প্রথম দফা টানা চার মাস হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর অস্ত্রোপচার হলো। দ্বিতীয় দফা আরও তিন মাস। সেখানকার চিকিৎসকেরা জানানলেন, কৃত্রিম পা লাগাতে সাড়ে চার লাখ টাকা দরকার। সিনহা টেক্সটাইল, ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ছাড়াও সহকর্মীরা সহযোগিতার হাত বাড়ালেন। সবার সহযোগিতায় কৃত্রিম পা সংযোজন হলো। দেশে ফিরে কৃত্রিম পায়ে স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারতেন না। স্বামীর কোলে চড়ে চলাফেরা করতে হতো। পরে সঙ্গী হলো হুইলচেয়ার আর স্ক্র্যাচ। পঞ্জু হওয়ার কারণে চাকরিতে যোগদান করা আর হলো না। সোহেলও চাকরি ছেড়ে দিলেন।

পা হারানোর পর সারা দিন ঘরবন্দী কাটত। মোস্তারী বলেন, ‘বাইরের পৃথিবীটা ক্রমেই অচেনা হয়ে যাচ্ছিল। সারাক্ষণ দুর্ঘটনার স্মৃতি কুরে কুরে খেত। মেয়ে হারানোর কষ্ট ভুলতে পারছিলাম না। মা-বাবা, স্বামীর কাছে বোঝা হয়ে থাকব সারা জীবন? এসব ভেবে একসময় আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু আমি তো হারতে রাজি নই। সিদ্ধান্ত নিলাম, আমাকে ঘুরে দাঁড়াতেই হবে। নিজের ইচ্ছাশক্তিতে প্রেরণা জোগালেন স্বামী আর মা-বাবা। তাঁদের সহযোগিতায় কৃত্রিম পা নিয়ে চলাফেরার কৌশল শিখলাম। চিকিৎসা খরচ চালাতে গিয়ে তত দিনে মা-বাবার সংসারে ঋণের বিশাল বোঝা। বাবার ডিমের ব্যবসা প্রায় বন্ধ। ঠিকমতো সংসার চলে না।’

মোস্তারী রহমান বলেন, ‘স্বামী রানার গুপে যোগ দিলেন। মা-বাবা ও স্বামী মিলে আমাকে ২০ হাজার টাকা দিলেন। সেই টাকায় বাড়ির পাশে বিসিক বাজারে মৃত কন্যার নামে ‘সুরাইয়া স্টোর’ নামে একটি দোকান চালু করলাম। ২০১৭ সালে অনেকটা শূন্য হাতে শুরু করা সেই দোকানে এখন নতুন ফটোকপি যন্ত্র ছাড়াও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের ব্যবস্থা আছে।

ফটোকপিয়ারের ব্যবসার পাশাপাশি রিকশায় খাঁচাভর্তি ডিম নিয়ে শহরের চায়নিজ রেস্টোরাঁয় ডিম সরবরাহ শুরু করেন মোস্তারী রহমান। স্বামীর কোলে চড়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে শহরের ফুলবাড়ি এলাকায় চালু করেন বিউটি পারলার।

মোস্তারী রহমান বলেন, বাবার ডিমের ব্যবসা ছিল। সেই ব্যবসা নিজে করার সিদ্ধান্ত নিলাম। সারা দিন দোকানে বেচাবিক্রির ফাঁকেই ফোনে শহরের ৮-১০টি চায়নিজ রেস্টোরাঁ থেকে ডিমের চাহিদা জেনে নিই। বিভিন্ন খামার থেকে মুরগি আর নাটোরের সিংড়া থেকে হাঁসের ডিম সংগ্রহ করেন বাবা। সকাল নয়টার মধ্যে রিকশায় ঘুরে ঘুরে রেস্টোরাঁয় সেই ডিম সরবরাহ করি। এরপর সকাল ১০টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত দোকানে বসি। ঈদ, নববর্ষ, বিয়ের মতো উৎসবে পারলারেও সময় দিতে হয়। করোনার সংকটে দোকান বন্ধ করে দিতে হয় ২০২০ সালে। তবে তখনো ভিন্ন উপায়ে ব্যবসা চালিয়েছেন মোস্তারী। অনলাইনে পেজ খুলে বিভিন্ন ধরনের আচার, ঘি ও রকমারি খাবার বিক্রি শুরু করেন। তাই করোনার সময়েও ব্যস্ত ছিলেন এই উদ্যোক্তা। মোস্তারী বলেন, নারী হয়ে বাজারের মধ্যে ব্যবসা করছি, প্রথম দিকে কেউ কেউ বাঁকা চোখে দেখতেন। কটু কথাও বলতেন। পাত্তা দিইনি। এখন পুরো বাজারের ব্যবসায়ীরা সম্মান করেন। আদর করে ‘মা’ ডাকেন। পাঁচ ‘পি’ নীতিতে ব্যবসা করছি আমি—প্রাইস, প্রোডাক্ট, পারসোনালিটি, প্লেস আর পিপল। চড়াই-উতরাই পেরিয়ে খানিকটা পথ পাড়ি দিয়েছি। সামনে আরও অনেকটা পথ বাকি।

<https://www.prothomalo.com/lifestyle/kbgl0ost0a>

অধিবেশন -২.৩:

ব্যবসায়ের পরিবেশ

দিন-১, অধিবেশন ২.৩

: সময়: ৯.৩০-১০.০০

ব্যাপ্তি: ৩০ মিনিট

সেশন শিরোনাম	: পরিচিতি পর্ব
সেশন লক্ষ্য	: এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ ব্যবসায়ের পরিবেশ সম্পর্কে অবগত হবেন।
উদ্দেশ্য	: এ সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- • অংশগ্রহণকারীগণ ব্যবসায়ের পরিবেশ সম্পর্কে জানতে পারবেন • অংশগ্রহণকারীগণ ব্যবসায় পরিবেশের উপাদানসমূহ/শক্তিসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন
উপকরণ	: ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, অডিও/ভিডিও মিউজিক, পোস্টার পেপার/বোর্ড, মার্কার
পদ্ধতি	: ভিপিআর, পোস্টার পেপার প্রদর্শন, গল্প বলা, প্রশ্নোত্তর, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা
পঠন উপকরণ	: হ্যান্ডআউট
পূর্ব প্রস্তুতি	: সহায়ক পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও বোর্ড প্রস্তুত করে রাখবেন।
মূল্যায়ন পদ্ধতি	: প্রশ্নোত্তর

প্রক্রিয়া: সহায়ক অংশগ্রহণকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন পারিপার্শ্বিক কোন কোন বিষয়গুলো তাদের ব্যবসা পরিচালনায় প্রভাব ফেলে। সহায়ক উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করবেন ব্যবসা পরিচালনা করতে যে সকল বিষয় লাগে, যেমন ব্যবসা পরিচালনার স্থাপনা, অর্থ, শ্রমিক, সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা বিভাগ থেকে লাইসেন্স বা ছাড়পত্র, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, নিরাপত্তা ইত্যাদি কিভাবে ব্যবস্থা করতে হয়।

ফ্যাসিলিটেরদের জন্য তথ্য

ব্যবসায়ের পরিবেশ:

পরিবেশ:

পরিবেশ বলতে কোন স্থান বা অঞ্চলের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, উপাদান বা শক্তিকে বুঝায় যার মধ্যে মানুষ জীবন ধারণ করে এবং কোন সংগঠন স্থায়ী উদ্দেশ্য অর্জনে নিয়োজিত থাকে। এ পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা উপাদানের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান; যেমন ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, নদ-নদী, পাহাড়, বনজঙ্গল ইত্যাদি, তেমনি রয়েছে শিক্ষা-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, আইন-কানুন, অর্থনীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, রাজনীতি ইত্যাদির মতো অপ্রাকৃতিক উপাদানসমূহ। সামগ্রিকভাবে, মানুষ যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে জীবন ধারণ করে এবং দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান যে সকল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদান তার জীবন ও জীবিকার উপর প্রভাব বিস্তার করে সম্মিলিতভাবে তাকে পরিবেশ বলে।

ব্যবসায় পরিবেশ:

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবন প্রণালী ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় তা মূলত পরিবেশগত উপাদানসমূহের তারতম্যেরই ফসল। কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক কর্মধারা ও জীবন প্রণালী ঐ অঞ্চলের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান পরিবেশগত অবস্থা/সমূহের উপর নির্ভরশীল। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বহিঃস্থ পারিপার্শ্বিক যে সব অবস্থা বা উপাদান এর গঠন, পরিচালন, দক্ষতা এবং ফলপ্রসূতির উপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের সমষ্টিকে ব্যবসায় পরিবেশ বলে।

সামগ্রিকভাবে যে সব প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে তাদের সমষ্টিকে ব্যবসায়িক বা ব্যবসায় পরিবেশ বলে। সাধারণত কোন অঞ্চলের কৃষিজ, প্রাণিজ, বনজ, খনিজ সম্পদ তথা প্রাকৃতিক সম্পদ পর্যাপ্ত থাকলে এবং এর অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রযুক্তিক ও রাজনৈতিক অবস্থা অনুকূল হলে সে অঞ্চলের শিল্প-বাণিজ্য উন্নতি লাভ করে।

ব্যবসায় উদ্যোগ পরিবেশ

ব্যবসায় উদ্যোগ পরিবেশ বলতে পরিবেশের এমন সব শক্তি বা উপাদানসমূহের সমষ্টি বুঝায়-যা শিল্পোদ্যোগ কার্যক্রমকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। ব্যবসায় উদ্যোগ বা শিল্পোদ্যোগ একধরনের অর্থনৈতিক কর্ম প্রয়াস যা পরিবেশগত উপাদানসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

ব্যবসায় পরিবেশের উপাদানসমূহ

ব্যবসায়িক পরিবেশের উপাদানগুলোকে প্রধানত ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে উপাদানসমূহ উল্লেখ করা হলো:

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ

খ. সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ

গ. অর্থনৈতিক পরিবেশ

ঘ. রাজনৈতিক পরিবেশ

ঙ. প্রযুক্তিগত পরিবেশ

চ. আইনগত পরিবেশ

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ: মানুষের চারপাশে যে সকল প্রাকৃতিক অবস্থা যেমন, ভৌগলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, মৃত্তিকা, উদ্ভিদজগত, প্রাণিজ জগত, খনিজ সম্পদ, জনগোষ্ঠী ইত্যাদি দেখা যায় তাদেরকে মিলিতভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ। এ পরিবেশের উপদানসমূহ মনুষ্য সৃষ্টি নয়। এরা প্রকৃতির সৃষ্টি। নানা ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ বিভিন্ন পরিমাণে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদের স্থিতি একটি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গঠনে ভূমিকা রাখে। এর উপর ভিত্তি করে একেক দেশ একেক পণ্য উৎপাদনে বিশেষায়িত হয়ে থাকে। এজন্য আমরা কিছু দেশকে দেখি শিল্প বাণিজ্যে এগিয়ে এবং কিছু দেশ কৃষি বাণিজ্যে অগ্রসরমান। প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার অর্থনীতির অন্যান্য উপাদানের উন্নয়নের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

খ. সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ: সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ মানুষের অভ্যাস, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পছন্দ-অপছন্দ, আবেগ-অনুভূতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, রুচি-ফ্যাশন, শিক্ষা বা বুদ্ধিমত্তার স্তর, শহরায়ন ইত্যাদি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। কোন অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটা বা না ঘটার পেছনে একটি দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে মানুষ সাধারণত ভাগ্যে বিশ্বাস করে এবং তারা কোন কিছুর অর্জনকে ভাগ্যের প্রসন্নতা এবং ব্যর্থতাকে ভাগ্যের বিপর্যয় হিসাবে মনে করে। আবার সাংস্কৃতিগত পার্থক্যের কারণে কোন অঞ্চলের মানুষেরা কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থাপনা পছন্দ করে, আবার ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষেরা অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনা কৌশল পছন্দ করে। উন্নত দেশের মানুষেরা সাধারণত পরিশ্রমী হয় এবং পরিকল্পনামাফিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে। উন্নত দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও কৌশল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শেখানো হয়।

গ. অর্থনৈতিক পরিবেশ: অর্থনৈতিক পরিবেশ বলতে সাধারণত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো, শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রে চলমান অবস্থা, দেশের সংস্কৃতি, বিনিয়োগ, মূলধন, বাজার, ভোক্তার প্রবণতা, ভোগ, প্রতিযোগিতা, মূল্য স্তর, শুল্ক ও কর কাঠামো, অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা, মোট জাতীয় আয় ও উৎপাদন, জাতীয় আয়ের বন্টন ইত্যাদির সমষ্টিকে বুঝায়। অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদানসমূহের উপর দেশের শিল্পোদ্যোগ প্রচেষ্টা, ব্যবসায়ের উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি নির্ভরশীল। কাচামালের ও মূলধনী যন্ত্রপাতির প্রাপ্ততা, সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তি, দক্ষ শ্রমিক ও ব্যবস্থাপক, বিল্ডিং ইত্যাদি অপরিহার্য উপাদানসমূহের প্রাপ্তব্যতা এবং এদের মূল্য ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। ব্যক্তিগতভাবে ঋণ প্রবাহের জন্য সরকারের নীতি সহায়তা ও কর নীতি সমূহ ব্যবসা সম্প্রসারণের সহায়ক না হলে উদ্যোগের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় এবং নতুন উদ্যোক্তা তৈরি শ্লথ হয়ে যায়। একজন উদ্যোক্তাকে চলমান অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সামনে অগ্রসর হতে হয়। তিনিই সফল উদ্যোক্তা যিনি অর্থনৈতিক পরিবেশের বিভিন্ন চলককে কৌশলে কাজে লাগিয়ে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সফলতা অর্জনপূর্বক টিকে থাকতে পারেন।

ঘ. রাজনৈতিক পরিবেশ: দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ ও শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ, ব্যবসায়ের পরিচালনা ও ম্যানেজারিয়াল সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। সরকারের স্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে সুস্থ গণতান্ত্রিক চর্চা, রাজনৈতিক মতাদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি, নীতিমালা, কর্মসূচি, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, জনগণের রাজনৈতিক ভাবনা ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগ, ধ্যান-ধারণা, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, রাজনৈতিক দলের গ্রহণযোগ্যতা, সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি একটি দেশের রাজনৈতিক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একটি দেশের রাজনৈতিক মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে রচিত হয় সে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি। আবার কোন দেশের শিল্পনীতি, বিনিয়োগ নীতি, আমদানি-রপ্তানি নীতি, রাজস্ব কাঠামো, বাজেট, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত হয় মূলত রাজনৈতিক দলীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে-যা দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

ঙ. প্রযুক্তিগত পরিবেশ: শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতির জন্য প্রয়োজন দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী, উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি। তাই শিল্প ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের উপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পরিবেশের ভূমিকা রয়েছে। সাধারণত, যে দেশে বিজ্ঞান চর্চা ও প্রযুক্তিতে যতবেশি অগ্রসর, শিল্পোদ্যোগ ও ব্যবসার ক্ষেত্রে তার তত বেশি অগ্রগামী। বিজ্ঞান শিক্ষার অগ্রগতির সাথে সাথে উদ্ভব ঘটে নতুন নতুন প্রযুক্তি। এসব প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার ফলে সম্ভব হয় নতুন নতুন পণ্য বা সেবার উৎপাদন। এর ফলে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপক বিস্তৃত। এর কল্যাণে খুব দ্রুত একজন উদ্যোক্তা তার ক্রেতার কাছে পণ্যের তথ্য পৌঁছাতে পারছে এবং সরবরাহকারীর কাছ থেকে কাচামাল সংগ্রহ করতে পারছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক সাশ্রয়ী ও কার্যকর হয়েছে।

চ. আইনগত পরিবেশ: রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে প্রণীত ও জারীকৃত বিভিন্ন আইন-কানুন, রীতি-নীতি, সরকারি আদেশ-অধ্যাদেশ, বিধি, এসআরও ইত্যাদির সমন্বয়ে দেশের আইনগত পরিবেশের সৃষ্টি। দেশে বিদ্যমান অংশীদারী ব্যবসায় আইন, কোম্পানি আইন, সমবায় আইন, শিল্প আইন, কাস্টমস অ্যাক্ট, বাণিজ্যিক আইন-বিধি, আয়কর আইন, মূল্য সংযোজন কর আইন, শ্রম আইন, বৈদেশিক বিনিময় সংক্রান্ত আইন, আমদানি-রপ্তানি বিষয়ক আইন, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ইত্যাদি আইন, বিধি-বিধান ও নিয়ম কাননের বেড়াজালে আবদ্ধ থেকে ব্যবসায়িকদের বা উদ্যোক্তাদেরকে ব্যবসা পরিচালনা করতে হয়। এসব আইন ও বিধিসমূহ ব্যবসা পরিচালনায় সহায়ক না হলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

অধিবেশন -২.৪:

উদ্যোক্তার গুণাবলি

দিন-২, অধিবেশন ২.৪

: সময়: ৯.৩০-১০.০০

ব্যাপ্তি: ৩০ মিনিট

সেশন শিরোনাম	: পরিচিতি পর্ব
সেশন লক্ষ্য	: এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ ব্যবসায়ের পরিবেশ সম্পর্কে অবগত হবেন।
উদ্দেশ্য	: এ সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- • অংশগ্রহণকারীগণ একজন উদ্যোক্তার গুণাবলি সম্পর্কে জানতে পারবেন • অংশগ্রহণকারীগণ নিজের মধ্যে একজন সফল উদ্যোক্তার গুণাবলি রয়েছে কিনা তা বুঝতে পারবেন
উপকরণ	: ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, অডিও/ভিডিও মিউজিক, পোস্টার পেপার/বোর্ড, মার্কার
পদ্ধতি	: ভিপকার্ড, পোস্টার পেপার প্রদর্শন, গল্প বলা, প্রশ্নোত্তর, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা
পঠন উপকরণ	: হ্যান্ডআউট
পূর্ব প্রস্তুতি	: সহায়ক পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও বোর্ড প্রস্তুত করে রাখবেন।
মূল্যায়ন পদ্ধতি	: প্রশ্নোত্তর

প্রক্রিয়া: সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানতে চাইবেন একজন উদ্যোক্তার কি কি গুণ থাকা দরকার। অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে আসা উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন এবং আলোচনা করবেন। এরপর ফ্যাসিলিটের উদ্যোক্তার সম্ভাব্য ১০টি গুণাবলীর চার্ট মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে অথবা পিভিসি ব্যানারে প্রিন্ট করে রাখা ছবি অংশগ্রহণকারীদের দেখাবেন এবং একটি একটি করে বুঝিয়ে দিবেন। ফ্যাসিলিটের একটি কাগজে ১০টি গুণাবলীর ছবি সকল অংশগ্রহণকারীদের দিয়ে বলবেন এই ১০টি গুণাবলীর মধ্যে যাদের মধ্যে এই গুণগুলো নেই তারা ক্রস চিহ্ন দিবেন এবং যাদের মধ্যে যে গুণগুলো আছে তারা টিক চিহ্ন দিবেন।

কো-সহায়ক কাগজগুলো সংগ্রহ করবেন এবং সহায়কসহ তা দেখবেন। এরপর ফ্যাসিলিটের বলবেন, এসব গুণাবলীর কোনোটা কি অর্জন করা অসম্ভব কিনা? যদি অসম্ভব না হয় তবে এসব গুণাবলী অর্জনে কি কি করণীয় তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে মুক্ত আলোচনা করে সেশনটি শেষ করবেন।

উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত ১০টি গুণাবলী



লক্ষ্য নির্ধারণ



সূচু পরিকল্পনা ও পরিচালনা



তথ্য অনুসন্ধান



উদ্বুদ্ধ করণ ও যোগাযোগ



আত্মবিশ্বাস



সুযোগ সন্ধান



অধ্যবসায়



কাজের প্রতি প্রতিশ্রুতি রক্ষা



গুণগতমান ও দক্ষতার চাহিদা



ঝুঁকি গ্রহণ

ফ্যাসিলিটেটরদের জন্য তথ্য

ফ্যাসিলিটেটর একেটি ছবি দেখিয়ে উপস্থিত উদ্যোক্তাদের সাথে উদ্যোক্তার গুণাবলীর লিঙ্ক করিয়ে দেয়া। যেমন-

লক্ষ্য নির্ধারণ

যেকোন ব্যবসা শুরু করার আগে তার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা একটি যোগ্যতা, যা একজন উদ্যোক্তার থাকা প্রয়োজন।

সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও পরিচালনা

লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা করা এবং ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়িত করা। বড় কোন কাজকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে ছোট ছোট অংশে করে ফেলা।

তথ্য অনুসন্ধান

আপনার ব্যবসা পরিচালনার জন্য অন্য প্রতিযোগীর একই ধরনের পণ্যের দাম, কোয়ালিটি, পাইকারি দাম, খুচরা দাম, ইত্যাদিই অনুসন্ধান করার গুণ থাকা প্রয়োজন।

উদ্বুদ্ধকরণ ও যোগাযোগ

অন্যকে অনুপ্রাণিত বা প্রভাবিত করতে সঠিক কৌশল ঠিক করা। নিজের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যবসায়িক ও ব্যক্তিগত যোগসূত্রসমূহ ব্যবহার করা।

আত্মবিশ্বাস

নিজের ক্ষমতা ও যাবতীয় গুণাবলীর উপর শক্ত বিশ্বাস রাখা। কোনো কঠিন কাজ বা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য নিজের ক্ষমতার উপর আস্থা রাখা।

সুযোগ সন্ধান

ব্যবসা সংক্রান্ত নতুন নতুন সুযোগ দেখা। এ গুলির উপর কাজ করা এবং তা বাস্তবায়ন করা। আর্থিক সংস্থান, যন্ত্রপাতি, জমি, কর্মসংস্থান বা অন্যান্য সাহায্য লাভের জন্য লক্ষণীয় সুযোগ গুলি ব্যবহার করা।

অধ্যবসায়

যে কোন বাধা দূর করা অথবা যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে বার বার পদক্ষেপ নেয়া। একনিষ্ঠভাবে/ দৃঢ়তার সাথে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সামনে এগিয়ে যাওয়া।

কাজের প্রতি প্রতিশ্রুতি রক্ষা

গ্রাহকদের জন্য কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে উদ্ধৃত সমস্যাবলীর দায়-দায়িত্ব নেয়া। শ্রমিকদের সাথে কাজে লেগে থাকা এবং তাদের মাধ্যমে কাজগুলি করিয়ে নেয়া যাতে গ্রাহকগণ সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন।

গুণগতমাণ ও দক্ষতার চাহিদা

উন্নত, দ্রুত এবং সস্তায় পণ্য সরবরাহের জন্য পথ খুঁজে বের করা। অতীতের সকল উৎকর্ষতাকে হার মানিয়ে নতুন এবং সবচাইতে ভালো খরিদদার যে রকম চায় সেই রকম ভাবে পণ্য তৈরীর চেষ্টা করা।

ঝুঁকি গ্রহণ

ঝুঁকি গ্রহণ করার মনোভাব থাকতে হবে। একজন সফল উদ্যোক্তার নিজের মত অনুযায়ী সহনীয়/পরিমিত ঝুঁকি গ্রহন করবে।

৩য় দিন

অধিবেশন -৩.১:

আইনি দায়িত্ব এবং বীমা

দিন-৩, অধিবেশন ৩.১

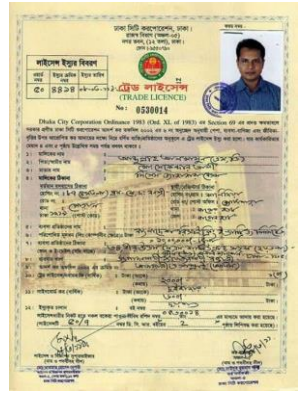
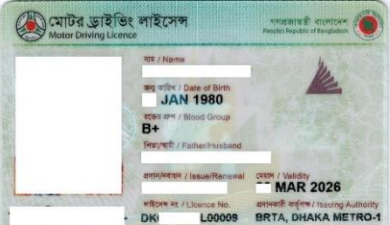
সময়: ৯.৩০-১০.০০

ব্যাপ্তি: ৩০ মিনিট

সেশন শিরোনাম	: পরিচিতি পর্ব
সেশন লক্ষ্য	: এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ ব্যবসা পরিচালনায় আইনি দায়িত্ব এবং বীমার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত হবেন।
উদ্দেশ্য	: এ সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- - প্রশিক্ষণার্থী ব্যবসা শুরুর আগের প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র সম্পর্কে ধারণা পাবে - ব্যবসা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে কর প্রদানের প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধা জানতে পারবেন - বীমা সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারবেন
উপকরণ	: ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, অডিও/ভিডিও মিউজিক, পোস্টার পেপার/বোর্ড, মার্কার
পদ্ধতি	: ভিপিআর, পোস্টার পেপার প্রদর্শন, গল্প বলা, প্রশ্নোত্তর, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা
পঠন উপকরণ	: হ্যান্ডআউট
পূর্ব প্রস্তুতি	: সহায়ক পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও বোর্ড প্রস্তুত করে রাখবেন।
মূল্যায়ন পদ্ধতি	: প্রশ্নোত্তর

প্রক্রিয়া: সহায়ক অংশগ্রহণকারীদেরকে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলবেন যে লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র হলো কোন কিছু করা, ব্যবহার করা বা নিজের করে নেয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অনুমতি। প্রাতিষ্ঠানিক অনুমতি পেলে যেকোনো প্রতিষ্ঠান সরকারিভাবে কিছু সুবিধা পায় এবং এর জন্য সরকারের বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফি পরিশোধ করার প্রয়োজন পড়তে পারে। এ পর্যায়ে, সহায়ক ট্রেড লাইসেন্স, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদির নাম বলবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের বলবেন আরও কোনো লাইসেন্সের নাম জানে কিনা?

এবার সহায়ক কিছু লাইসেন্সের ছবি দেখাবেন এবং সেসব লাইসেন্স সম্পর্কে তথ্য দিবেন:

লাইসেন্সের নাম	লাইসেন্সের বিবরণ ও সুবিধাদি	নমুনা ছবি
ট্রেড লাইসেন্স	ট্রেড লাইসেন্স হলো একটি সরকারী সংস্থা দ্বারা জারি করা একটি পারমিট যা একটি ব্যবসাকে একটি নির্দিষ্ট এখতিয়ারের মধ্যে আইনিভাবে পরিচালনা করতে দেয়। ট্রেড লাইসেন্স থাকলে পণ্য/পরিষেবার জন্য আইনি সুরক্ষা পাওয়া যায়। ট্রেড লাইসেন্স থাকলে ট্রেডমার্ক ব্যবহার করার একচেটিয়া অধিকার জন্মে যার অর্থ হলো আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম, লোগো ইত্যাদি অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারবে না।	
ড্রাইভিং লাইসেন্স	ড্রাইভিং লাইসেন্স হল এমন একটি অফিসিয়াল ডকুমেন্ট যা একজন ব্যক্তিকে মোটর গাড়ি চালানোর অনুমতি দেয়। গাড়ি, মোটরসাইকেল বা ট্রাক ইত্যাদি চালানোর জন্য	

লাইসেন্সের নাম	লাইসেন্সের বিবরণ ও সুবিধাদি	নমুনা ছবি
	প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা এবং শারীরিক ফিটনেস থাকলেই একজন ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারবেন। একজন ব্যক্তিকে ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু করার আগে একটি লিখিত এবং ব্যবহারিক পরীক্ষা পাস করতে হয়। ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকলে আইনত পাবলিক রাস্তায় যানবাহন চালানো যায়। ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকলে ব্যক্তিগত বা পেশাদার পরিবহনের সুবিধা পাওয়া যায়, এতে ব্যবসা পরিচালনা করা সহজ হয়।	
ফায়ার লাইসেন্স	ফায়ার লাইসেন্স একটি বাধ্যতামূলক পারমিট যা বাংলাদেশের সকল কারখানার জন্য আবশ্যিক। যেকোনো স্থান বা স্থাপনায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এটি বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক জারি করা একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি। অগ্নি প্রতিরোধ ও অগ্নিনির্বাপন আইন, ২০০৩ প্রতিরোধ, কার্যকর আগুন নির্বাপন এবং আগুনের ক্ষতি এবং পরিণতি হ্রাসের জন্য আইনী নির্দেশিকা নির্ধারণ করে। ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স (এফএসসিডি) বাংলাদেশে ফায়ার লাইসেন্স প্রদান করে। একটি ফায়ার লাইসেন্স যে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যাবশ্যক এবং মানুষের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ট্রেড লাইসেন্স পাওয়ার মতোই গুরুত্বপূর্ণ।	
কারখানা লাইসেন্স	সরকারের অনুমোদন ছাড়া কারখানা নির্মাণ আইনবিরুদ্ধ। তাই নির্মাণের আগে অফিস অব চিফ ইন্সপেক্টর অব ফ্যাক্টরিজ অ্যান্ড এস্টাবলিসমেন্ট (সিআইএফই) থেকে লাইসেন্স নিতে হবে। ফরম সংগ্রহ করে বাংলাদেশ ব্যাংকে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে। কারখানার নকশাসহ ফরমে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় কাগজ জমা দিতে হবে। এর অনুমোদন পেতে বেশ সময় প্রয়োজন। তাই কাজ শুরুর তারিখ জানিয়ে একটি নোটিস দিতে পারবেন ব্যবসায়ীরা।	
পরিবেশ ছাড়পত্র	দেশের যে কোনো স্থানে শিল্পপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতে হলে পরিবেশ অধিদফতরের ছাড়পত্র নিতে হবে। তাই পরিবেশ অধিদফতর থেকে নির্ধারিত আবেদন ফরম সংগ্রহ করে সেই ফরমে উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জমা দিতে হবে।	

উদাহরণ: অনিক তার বাবা থেকে কিছু টাকা পায় এবং একটি ব্যবসা শুরু করতে চায়, কিন্তু কিভাবে কি করতে হবে তা বুঝে উঠতে পারে না। সে গেলো তার বন্ধু আনিসের কাছে। আনিস অনেক বছর ধরেই ব্যবসা করে, সে বললো, ব্যবসার শুরুর্তেই ট্রেড লাইসেন্স করতে হবে। এই লাইসেন্স থাকলে ব্যবসা করা সহজ ও নিরাপদ হবে। অনিক আরও জানতে পারলো যে, প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংক একাউন্ট করতে গেলেও ট্রেড লাইসেন্স প্রয়োজন হয়। পরে সে পৌরসভার চেয়ারম্যানের কাছ থেকে সরকারি ফি জমা দিয়ে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করে।

বিমার প্রয়োজনীয়তা: সহায়ক অংশগ্রহণকারীদেরকে নিচের ছবিগুলো দেখিয়ে ছবির প্রেক্ষাপট জানতে চাইবেন। সহায়ক জানতে চাইবেন ছবিগুলোতে বর্ণিত দুর্ঘটনাগুলো কি আপনাদের ব্যবসায় ঘটে বা ঘটতে পারে? এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে আপনারা কি করেন? ব্যবসার উপর এ ধরনের দুর্ঘটনা কি রকম প্রভাব রাখতে পারে? এ ধরনের দুর্ঘটনার জন্য বিমা করার প্রয়োজন আছে কি? এ প্রশ্নগুলোর উত্তরে প্রাপ্ত মতামত নিয়ে সহায়ক বিমার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করবেন।



ফ্যাসিলিটেশনদের জন্য তথ্য

ব্যবসায় আইনি দায়িত্ব ও বীমা:

পরিবেশ অধিদফতরের ছাড়পত্র: দেশের যে কোনো স্থানে শিল্পপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতে হলে পরিবেশ অধিদফতরের ছাড়পত্র নিতে হবে। তাই পরিবেশ অধিদফতর থেকে নির্ধারিত আবেদন ফরম সংগ্রহ করে সেই ফরমে উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জমা দিতে হবে।

ফায়ার লাইসেন্স: ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা ও অগ্নিপ্রতিরোধক ব্যবস্থার জন্য ফায়ার লাইসেন্স অত্যন্ত আবশ্যিক। এক্ষেত্রে কিছু ধাপ রয়েছে: যেমন ফায়ার সার্ভিসের নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে। জমা দেওয়ার এক সপ্তাহ পর অধিদফতর থেকে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয় এবং সে সঞ্চে কিছু পরামর্শও দেওয়া হয়। এ পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবসায়ীরা কাজ শুরুর পর পুনরায় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন যদি যুক্তিসংগত হয়, তাহলে তিন মাসের মধ্যে লাইসেন্স দেওয়া হয়।

রাজউকের লাইসেন্স: কারখানা নির্মাণের জন্য অবশ্যই দালান তৈরির পরিকল্পনা করতে হবে। সেক্ষেত্রে যদি রাজউকের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে রাজউক থেকে পরিকল্পনা অনুমোদন পাস করিয়ে নিতে হবে। রাজউক থেকে অনুমোদন করানোর জন্য রাজউকের আবেদন ফরম সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জমা দিতে হবে।

কারখানা নির্মাণের লাইসেন্স: ব্যবসার তাগিদে কারখানা নির্মাণ আবশ্যিক। তবে সরকারের অনুমোদন ছাড়া কারখানা নির্মাণ আইনবিরুদ্ধ। তাই নির্মাণের আগে অফিস অব চিফ ইন্সপেক্টর অব ফ্যাক্টরিজ অ্যান্ড এস্টাবলিসমেন্ট (সিআইএফই) থেকে লাইসেন্স নিতে হবে। ফরম সংগ্রহ করে বাংলাদেশ ব্যাংকে ট্রেজারি চালানোর মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে। কারখানার নকশাসহ ফরমে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় কাগজ জমা দিতে হবে। এর অনুমোদন পেতে বেশ সময় প্রয়োজন। তাই কাজ শুরুর তারিখ জানিয়ে একটি নোটিস দিতে পারবেন ব্যবসায়ীরা। তবে হাতে সময় নিয়ে আবেদন করা ভালো।

কর প্রদান

কর হলো জনসাধারণের বাধ্যতামূলক প্রদেয় অর্থ। জনগণ সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে। সরকারি ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার বিভিন্ন উৎস হতে রাজস্ব সংগ্রহ করে থাকে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী আয় যে উৎস হতে আসে তা হলো কর, একটি দেশের নাগরিকগণ তাদের আয়ের একটি অংশ কর হিসেবে সরকারকে প্রদান করে। সাধারণত ব্যবসায় গ্রাহকদের কাছ থেকে কিছু কর সংগ্রহ করা হয় এবং তা সরকারি কর আদায়কারী সংস্থাতে পাঠাতে হয়, যেমন, বিক্রয় কর/ মূল্য সংযোজন কর (VAT)।

মূল্য সংযোজন কর (VAT):

তমা তার দর্জির ব্যবসায় একটি থ্রি-পিছ ১৫০০ টাকায় বিক্রি করে। থ্রি-পিছের কাপড়, শ্রমিকের মজুরি বাবদ খরচ হয় ১২০০ টাকা। এক্ষেত্রে, মূল্য সংযোজন হলো $(১৫০০ - ১২০০) = ৩০০$ টাকা। এই মুনাফার উপর ধরে নেয়া হলো ১৫ শতাংশ কর ধার্য করা হয়েছে। অতএব মূল্য সংযোজন কর হবে: $(৩০০ \times ১৫\%) = ৪৫$ টাকা, এই ৪৫ টাকা তমাকে সরকারি কর সংস্থাতে পাঠাতে হবে।

আয়কর (Income Tax):

মশিউর সাহেবের প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১২ জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। ব্যবসার উপার্জনের উপর ভিত্তি করে কর্মচারীদের বেতন থেকে আয়কর কেটে সে পরিমাণ অর্থ সরকারে কোষাগারে জমা দেয়।

করের উদ্দেশ্য

একটি অর্থনীতিকে পরিচালনার জন্য সরকার প্রধানত কর থেকে বিভিন্ন ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থায়ন করে। এসব ব্যয়ের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি খাত। স্বাভাবিকভাবে জনগণ সরকারকে কর প্রদান করে কোনরূপ প্রত্যক্ষ সুবিধা প্রত্যাশা না করে। তবে পরোক্ষভাবে জনগণ বহু সুবিধা ভোগ করে থাকে। সঠিক ভাবে কর আদায় করে জনগণের কল্যাণে ব্যয় করাই একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।

করের শ্রেণীবিভাগ

কর বোঝার উপর ভিত্তি করে করকে দুইভাগে ভাগ করা হয়:

১. প্রত্যক্ষ কর
২. পরোক্ষ কর

প্রত্যক্ষ কর

কোন ব্যক্তির উপর কর ধার্য করা হলে যদি সেই ব্যক্তিকেই করের আর্থিক ভার বহন করতে হয় তবে তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে। অর্থাৎ যে করের ক্ষেত্রে করের প্রাথমিক ভার ও চূড়ান্ত ভার একই ব্যক্তির উপর পড়ে তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে। আরো সংক্ষেপে বললে, যে করের করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তির উপর আরোপিত হয় তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে। যেমন আয়কর, মৃত্যু কর, ভূমির রাজস্ব ইত্যাদি। এসকল ক্ষেত্রে যার উপর করা আরোপিত হয় তাকেই কর পরিশোধ করতে হয়। সে কোনভাবেই অন্যের উপর তার করের বোঝা চাপিয়ে দিতে পারে না। এ জন্য এ করকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয়।

পরোক্ষ কর

যে করের করঘাত ও করপাত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উপর পড়ে তাকে পরোক্ষ কর বলে। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির উপর কর ধার্য করা হলে, ব্যক্তি করের ভার অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়। যেমন-বিক্রয় কর, আবগারি শুল্ক, প্রমোদ কর ইত্যাদি। এরূপ করের করদাতা করের প্রকৃত বোঝা অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়। যেমন-বিক্রয় কর বিক্রেতার উপর আরোপ করা হলেও বিক্রেতা পণ্যের দাম বৃদ্ধির মাধ্যমে তা ক্রেতার উপর ফেলে। তাই বলা যায়, যে করে করঘাত করদাতা নিজে বহন করে এবং করের প্রকৃত ভার অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে পারে তাই পরোক্ষ কর।

বীমা

প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক কারণে ব্যবসায় ক্ষতির সম্ভাবনাকে ঝুঁকি বলা হয়। প্রাকৃতিক কারণগুলির মধ্যে রয়েছে ঝড়, ভূমিকম্প, বন্যা, সাইক্লোন, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি। অপ্রাকৃতিক কারণের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনা, চুরি-ডাকাতি, অপহরণ, অগ্নি দুর্ঘটনা, পচন ইত্যাদি অন্যতম। এসব ঝুঁকি পরিহার বা কমানোর ক্ষেত্রে বিমাকরণ একটি উত্তম উপায়। সারা বিশ্ব-ব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিমার গুরুত্ব

অনেক বেড়েছে। উন্নত বিশ্বে বীমা নিজেই একটি বড় ব্যবসা হিসেবে পরিগণিত হয়। যদিও আমাদের দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সবক্ষেত্রে বীমার ব্যবহার শুরু হয়নি তবে বীমার ব্যবহার সময়ের সাথে সাথে বাড়ছে।

যে চুক্তির মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি কর্তৃক নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনো ঘটনাজনিত ক্ষতির বা ঘটনার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয় তাকে বিমাচুক্তি বলে। উক্ত ক্ষতিপূরণের জন্য বা নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের জন্য যে পক্ষ স্বীকৃত হয় তাকে বিমাকারি এবং যার ক্ষতিপূরণের জন্য বা যাকে অর্থ প্রদানের জন্য উক্ত চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে বিমাগ্রহীতা বলে। চুক্তি অনুযায়ী বিমাগ্রহীতা এককালীন বা নিয়মিত কিস্তিতে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিমাকারিকে প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলা হয়। বিমাচুক্তি যে দলিল দ্বারা সম্পাদিত হয় তাকে বিমাপত্র বলা হয়।

বীমার প্রকারভেদ

বিভিন্ন প্রকার বীমা রয়েছে। এর মধ্যে চার ধরনের বীমা উল্লেখযোগ্য। ১. জীবন বীমা, ২. নৌ বীমা, ৩. অগ্নি বীমা, এবং ৪. দুর্ঘটনা বীমা। এছাড়াও আরো অনেক বীমা রয়েছে যেমন মোটর গাড়ি বীমা, ফার্নিচার বীমা, দায় বীমা, শস্য বীমা ইত্যাদি।

১. **জীবন বীমা:** বীমা ব্যবসায় সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে জীবন বীমা। যে বীমা চুক্তির মাধ্যমে বিমাকারী বীমা কিস্তির বিনিময়ে বীমা গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বা তার নির্বাচিত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারিকে একটি বিশেষ সময়ের পর বা বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে বিমাকৃত অর্থ প্রদান করে থাকে সেই বীমা চুক্তিকেই জীবন বীমা বলে।

২. **অগ্নি বীমা:** যে বীমা চুক্তির মাধ্যমে বীমা গ্রহীতা ব্যক্তিকে অগ্নিজনিত ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দান করা হয় তাকে অগ্নি বীমা বলে। সাধারণত পণ্য, ঘরবাড়ি, গুদাম, কারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আগুনে পুড়ে যাওয়া থেকে সুরক্ষার জন্য অগ্নি বীমা করা হয়।

৩. **নৌ বীমা:** যে বিমায় নদী ও সামুদ্রিক যাত্রা থেকে সৃষ্ট ঝুঁকির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে তাকে নৌ বীমা বলা হয়। সারা পৃথিবীর ব্যবসায় প্রায় ৮০ শতাংশের উপরে পণ্য নৌ পথে পরিবাহিত হয়। তাই নৌপথে বিরাজমান ঝড়-জলোচ্ছাস, ডেউ, সুনামি, দস্যুতা, যুদ্ধ-বিগ্রহসহ অন্যান্য ঝুঁকি এড়াতে নৌ বীমা করা হয়।

৪. **দুর্ঘটনা বীমা:** কর্মস্থলে অবস্থানকালীন ব্যক্তির জীবনে অথবা ব্যবসায় যেকোন সময় দুর্ঘটনা ঘটে পারে এমন শঙ্কা থেকে দুর্ঘটনা বীমা করা হয়। এ ধরনের বিমায় কাজের বা ব্যবসায়ের ধরণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের পরিবর্তে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি সংঘটিত হলে বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ করে।

মূল্যায়ন:

এবার ফ্যাসিলিটেটর অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করবেন যে তাদের ব্যবসার জন্য কি ধরনের লাইসেন্স প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে, ফ্যাসিলিটেটর নিম্নের তালিকার মত করে একটি তালিকা তৈরি করবেন।

ক্রম নং	ব্যবসার নাম	কি লাইসেন্স প্রয়োজন	কোথায় পাওয়া যাবে
১			
২			
৩			

তালিকায় অংশগ্রহণকারীগণ নিজেদের ব্যবসায় যেসব লাইসেন্স প্রয়োজন হতে পারে তা লিখে যাবেন, অংশগ্রহণকারীগণ যদি তা না পারে তবে শুধুমাত্র ব্যবসার নাম লিখবে এবং ফ্যাসিলিটেটর কি কি লাইসেন্স লাগবে তা লিখে দেবেন।

অধিবেশন -৩.২:

উদ্যোগে কর্মী ব্যবস্থাপনায় মৌলিক বিষয়

দিন-৩, অধিবেশন ৩.২

: সময়: ৯.৩০-১০.০০

ব্যাপ্তি: ৩০ মিনিট

সেশন শিরোনাম	: পরিচিতি পর্ব
সেশন লক্ষ্য	: এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ উদ্যোগে কর্মী ব্যবস্থাপনার মৌলিক বিষয় সম্পর্কে অবগত হবেন।
উদ্দেশ্য	: এ সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- - কোন উৎস থেকে কিভাবে কর্মী নির্বাচন করা যায় তা জানা যাবে - যে সব প্রক্রিয়া অবলম্বন করে কর্মীর কর্মদক্ষতার উন্নয়ন করা যায় তা জানা যাবে

		• যেসব বিষয় কর্মীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাদি বাড়ায় এবং অনুপ্রেরণা প্রদান করে তা জানা যাবে • কর্মচারীর নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য উপস্থাপন করা হবে • শোভন কর্মপর্যবেক্ষণ বলতে কি বোঝায় এবং তা কেন গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ে জানবে
উপকরণ	:	ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, অডিও/ভিডিও মিউজিক, পোস্টার পেপার/বোর্ড, মার্কার
পদ্ধতি	:	ভিপিআর, পোস্টার পেপার প্রদর্শন, গল্প বলা, প্রশ্নোত্তর, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা
পঠন উপকরণ	:	হ্যান্ডআউট
পূর্ব প্রস্তুতি	:	সহায়ক পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও বোর্ড প্রস্তুত করে রাখবেন।
মূল্যায়ন পদ্ধতি	:	প্রশ্নোত্তর

প্রক্রিয়া: সহায়ক উপযুক্ত কর্মী বাছাই করার উপায় সম্পর্কে সবাইকে জিজ্ঞাসা করবেন এবং কে কিভাবে কর্মী নির্বাচন করে তা একটি বোর্ডে লিখে রাখবেন। পরবর্তিতে সেখান থেকে কোনটি অভ্যন্তরীণ এবং কোনটি বাহ্যিক উপায়ে করা হয়েছে তা বর্ণনা করবেন।

উপযুক্ত কর্মী নির্বাচন

একটি প্রতিষ্ঠানের কাজ সম্পন্ন করার জন্য উপযুক্ত কর্মী বাছাই করা হচ্ছে মূল কাজ। বিভিন্ন উৎস হতে এসব কর্মী বাছাই করা হয়। কর্মী সাধারণত দুটি উৎস হতে বাছাই করা যায়: অভ্যন্তরীণ উৎস এবং বাহ্যিক উৎস।



অভ্যন্তরীণ উপায়ে কর্মী নির্বাচন	বাহ্যিক উপায়ে কর্মী নির্বাচন
কর্মরত কর্মীদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে উচ্চতর পদ দেওয়া।	বিজ্ঞাপন ও আবেদনপত্র আহ্বানের মাধ্যমে
জরুরী প্রয়োজনে কর্মরত কর্মীদের সুপারিশ অথবা আত্মীয় স্বজনদের মাধ্যমে কর্মী সংগ্রহ করা	খন্ডকালীন বা আগে কাজ করত এমন কাউকে আবার কাজে ডাকা
বদলীর মাধ্যমে শূন্য পদে কর্মী নেয়া যায়।	সরাসরি রাস্তার মোড়ে অথবা দেয়ালে বিজ্ঞপ্তি টানিয়ে কর্মী সংগ্রহ করা যায়।
অনেক সময় কর্মীকে স্থায়ী পদ দেয়ার মাধ্যমে কর্মী সংগ্রহ করা যায়।	সমপর্যায়ের অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হতেও দক্ষ কর্মী সংগ্রহ করা যায়।

প্রক্রিয়া: সহায়ক প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে জানতে চাইবেন কার কার প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী নিযুক্ত রয়েছে। যাদের প্রতিষ্ঠানে উদ্যোক্তা নিজেই কাজ করে তাদের ভবিষ্যতে কর্মচারী নিয়োগের পরিকল্পনা আছে কিনা সহায়ক তা জানতে চাইবেন। একজন দক্ষ কর্মী কিভাবে ব্যবসার উন্নয়নে ভূমিকা রাখে তা জানতে চাইবেন

ফ্যাসিলিটেশনের জন্য তথ্য

উদ্যোগে কর্মী ব্যবস্থাপনা

কর্মী নির্বাচন: কর্মী নির্বাচন বলতে কোন সংগঠনে নতুন কর্মী নিয়োগদানের প্রক্রিয়াকে বুঝায়। কর্মী নির্বাচন প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিষ্ঠানে নিয়োগদানের লক্ষ্যে প্রতিভাবান, উদ্যমী ও সম্ভাবনাময় কর্মী খুঁজে বের করে তাদেরকে চাকরিতে উৎসাহিত করার জন্য যে প্রক্রিয়া বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তাকে কর্মীসংগ্রহ বলে। অন্যদিকে, প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজের জন্য প্রতিভাবান ও উদ্যমশীল কর্মীদের মধ্য হতে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে যথোপযুক্ত কর্মী বাছাই করাই কর্মী নির্বাচন। কর্মী নির্বাচনের জন্য প্রতিষ্ঠানকে কতকগুলো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। তবে কর্মীসংগ্রহের জন্য কোন্ কোন্ পদক্ষেপ বেশি কার্যকরী তা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

কর্মীদের কর্মদক্ষতার উন্নয়ন:

পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধিঃ প্রশিক্ষণ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত কর্মীদের পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। প্রশিক্ষণ পেশা সম্পর্কিত বাস্তব জ্ঞানকে শাণিত করে।

কার্যের সাথে পরিচিতি লাভঃ নবনিযুক্ত কর্মীদের নতুন কাজের সাথে পরিচিতি করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এতে কর্মী নতুন দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত হয় ও কার্য সম্পাদন কৌশল আয়ত্ত্ব করতে পারে।

কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিঃ কর্মীর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য। নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য যে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন একজন কর্মী তা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেয়ে থাকে।

নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা লাভঃ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মী নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হয় ও তা ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ত্ব করতে পারে।

নতুন প্রযুক্তি ও কৌশল সম্পর্কে জ্ঞানদানঃ আধুনিক প্রযুক্তি ও কলাকৌশল সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান দেওয়ার জন্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এতে কর্মীরা নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করে।

কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধিকরণঃ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে কর্মীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। তারা স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করতে অনুপ্রাণিত হয়। এতে তাদের মনোবল বৃদ্ধি পায়।

কর্মীদের মধ্যে প্রত্যাশিত দক্ষতা:

১. যোগাযোগ দক্ষতাঃ দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে তথ্য বা ভাবের আদান-প্রদানকে যোগাযোগ বলে। বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্ন কর্মীর সঙ্গে আন্তরিক ও বাস্তবসম্মত যোগাযোগ স্থাপন ও তা রক্ষা করা জরুরি। যেমন, কর্মীর (অঙ্গভঙ্গি), এবং (ইশারা-ইঙ্গিত), অন্য ভাষা বোঝার দক্ষতা প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একজন ব্যবস্থাপকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

২. সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অনুধাবনঃ একটি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন সংস্কৃতির কর্মী কাজ করতে পারে। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও উপসংস্কৃতি রয়েছে। সেসব বিষয় অনুধাবন বা সে বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা একজন ব্যবস্থাপকের জন্য আবশ্যিক।

৩. খোলা মনঃ বৈচিত্র্যময় কর্মীদের জন্য নির্বাহীকে খোলা মনের হতে হয়। এতে কর্মীরা যেকোনো সময়ে যেকোনো বিষয়ে খোলাখুলিভাবে আলোচনা-সমালোচনা করতে পারে। তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ও বাইরের বিষয় নিয়েও আলোচনা করতে পারে।

৪. বিরোধ মীমাংসা যোগ্যতাঃ রাজনীতি, জাতিগত, সংঘগত, বর্ণগত, ব্যক্তিগত প্রভৃতি কারণে প্রতিষ্ঠানে দ্বন্দ্ব বা বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে, যা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতার সহায়ক নয়। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার তা দ্রুত নিরসনের সক্ষমতা থাকতে হয়। এরূপ যোগ্যতা প্রতিষ্ঠানকে সম্ভাব্য ক্ষতি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে।

৫. রূপকল্প সৃষ্টিঃ ভিশন বা রূপকল্প বলতে ভবিষ্যৎ দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যকে বোঝায়। যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে ভিশন সৃষ্টি করতে হয়। এটি বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা আবশ্যিক। ভিশন অবশ্যই বাস্তবমুখী ও অর্জনযোগ্য হতে হয়।

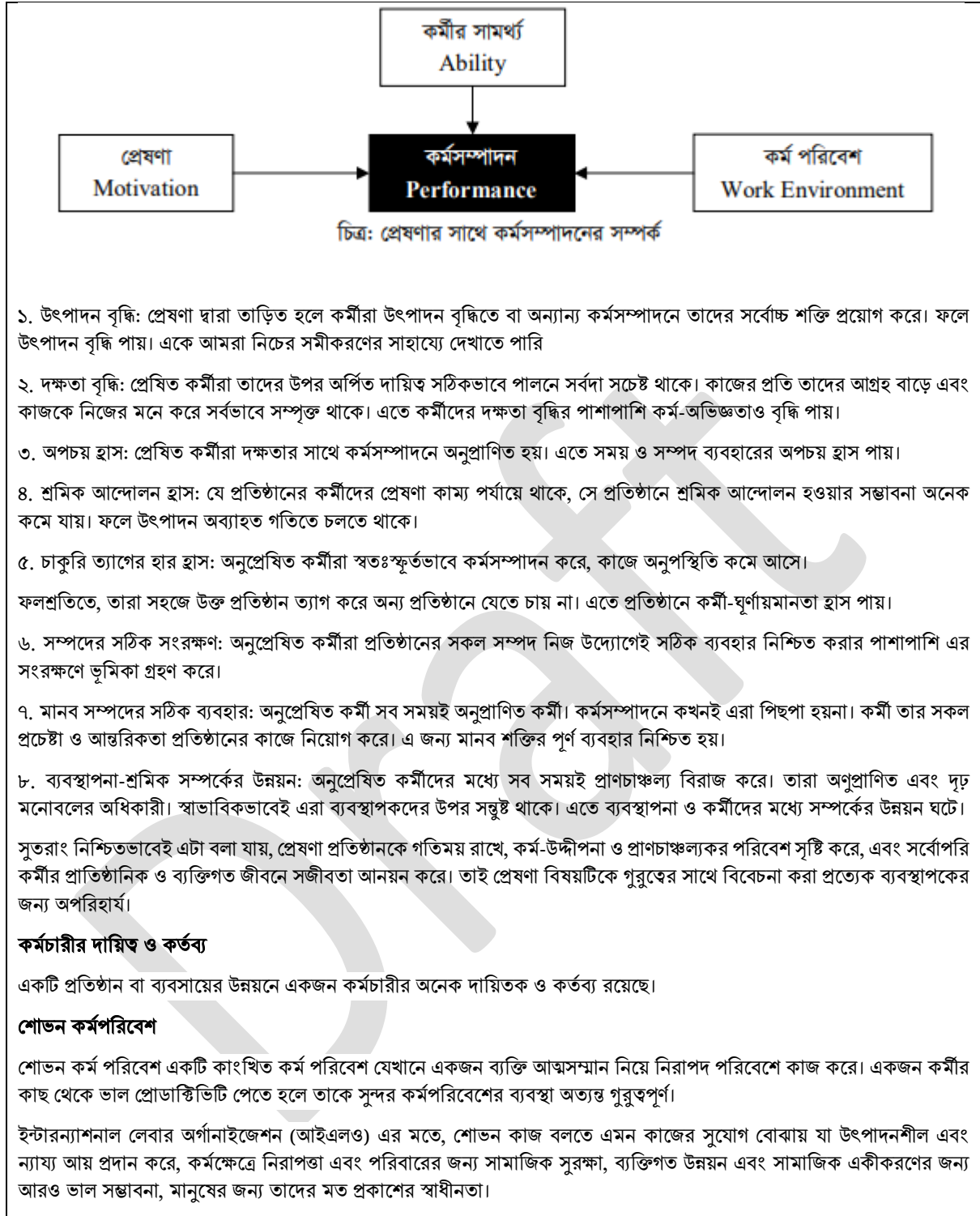
৬. ব্যক্তিগতভাবে জানাঃ নির্বাহীকে বৈচিত্র্যময় কর্মীদের আলাদাভাবে ডেকে বা কাছে নিয়ে তাদের খোঁজখবর নিতে হয়। তাদেরকে জানা বা বোঝার চেষ্টা করতে হয়। এর দ্বারা তাদের সম্পর্কে নির্বাহীর স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হয় এবং সে অনুযায়ী তাদের ব্যবহার করা সহজ হয়।

৭. আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিঃ নিজের দক্ষতা ও সক্ষমতা নিয়ে ইতিবাচক ধারণাই আত্মবিশ্বাস। কর্মীদের বৈচিত্র্যময়তা অনুধাবন করার জন্য যেমন দরকার, তেমনি তার আত্মনিয়োগও দরকার। প্রতিযোগীদের অবস্থা, কৌশল, মনোভাব, কর্মদের ভাবনা প্রভৃতি বিষয় মোকাবিলা করে এগিয়ে যাওয়ার মতো আত্মবিশ্বাস নির্বাহীদের আবশ্যিক।

৮. আত্মসচেতনতার উন্নয়নঃ প্রতিযোগিতায় টিকতে ও পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হলে নির্বাহীর নিজের দুর্বলতা ও শক্তি নিয়ে সচেতন থাকতে হয়। কর্মীর ভালো দিকগুলোর প্রশংসা করতে হয়। অন্যদিকে দুর্বল দিকগুলো বা ভুল সমাধান করে দিতে হয়।

কর্মী প্রেরণা প্রদান

প্রেষণা মানুষের অন্তরে নিহিত একটি সুপ্ত শক্তি যা উজ্জীবিত হলে মানুষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার যথাসম্ভব সর্বোচ্চ শক্তি নিয়োগ করে। এ প্রক্রিয়া শুরু হয় অতৃপ্ত প্রয়োজন দিয়ে এবং সমাপ্ত হয় টেনশন হ্রাসের মধ্য দিয়ে মানুষ তার কর্মপ্রচেষ্টার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো কাজে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত ও প্ররোচিত হলে এ প্রক্রিয়াটি প্রেষণা হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে। অনুপ্রেরিত ব্যক্তি স্বেচ্ছায়, স্থায়ী উদ্যোগে, অধিকতর দক্ষতার সাথে তার কর্মসম্পাদনে সচেষ্ট হয়। অভাব বা প্রয়োজনবোধ থেকেই প্রেষণার উদ্ভব। মানুষের অতৃপ্ত বাসনা পূরণ হলে সে প্রেরিত (বা অনুপ্রেরিত) হয়েছে বলা যায়।



অধিবেশন -৩.৩: ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও অর্থায়ন

দিন-৩, অধিবেশন ৩.৩

: সময়: ৯.৩০-১০.০০

ব্যাপ্তি: ১২০ মিনিট

সেশন শিরোনাম

: পরিচিতি পর্ব

সেশন লক্ষ্য

: এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও অর্থায়ন সম্পর্কে অবগত হবেন।

উদ্দেশ্য	:	এ সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- - কিভাবে ব্যবসার সামগ্রিক চিন্তাভাবনা করতে হয় এবং সঠিক সিদ্ধান্ত কিভাবে ব্যবসায় সফলতা আনে এই বিষয়গুলো শিখবে - ব্যবসার সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় এর উপর ভিত্তি করে কিভাবে আগাম হিসাব করতে হয় তা শিখবে - আগাম হিসাব কিভাবে হাতে কলমে করবে তা শিখবে - মূলধন বলতে কি বোঝায় এবং এর যোগান ও মালিকানা অংশ এবং ঋণের ধারণা পাবে - ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কাচামাল ও পণ্য তৈরির ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক ক্রয় সম্পর্কে জানতে পারবে।
উপকরণ	:	ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, অডিও/ভিডিও মিউজিক, পোস্টার পেপার/বোর্ড, মার্কার
পদ্ধতি	:	ডিপকার্ড, পোস্টার পেপার প্রদর্শন, গল্প বলা, প্রশ্নোত্তর, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা
পঠন উপকরণ	:	হ্যান্ডআউট
পূর্ব প্রস্তুতি	:	সহায়ক পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও বোর্ড প্রস্তুত করে রাখবেন।
মূল্যায়ন পদ্ধতি	:	প্রশ্নোত্তর

প্রক্রিয়া:

ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বিষয়বস্তু

যে প্রতিবেদনে কোন ব্যবসায়ের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পূণাজ্ঞা চিত্র তুলে ধরা হয় তাকে ব্যবসায়ের পরিকল্পনা বলে। এটি ব্যবসায়ীর জন্য একটি দিক নির্দেশক যা তাকে গন্তব্য স্থলে পৌঁছাতে সাহায্য করে। একজন শিল্পোদ্যোক্তা ব্যবসায় পরিকল্পনাকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে থাকলে তার পথ হারানোর কোন ভয় থাকে না। নিশ্চিত্তে সে তার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথে অগ্রসর হতে পারে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছার জন্য এটি শিল্পোদ্যোক্তার কাছে পথ চলার মানচিত্র। ব্যবসায় পরিকল্পনায় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য, বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার রূপরেখা অর্থাৎ ব্যবসায়ের পূণাজ্ঞা চিত্রপরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়। এছাড়া মূলধন সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবসায় পরিকল্পনা একটি উত্তম তথ্যসূত্র ও দলিল হিসেবে কাজ করে। এটি ব্যবসায়ের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার চিত্রকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ঋণদানকারী ব্যাংক ও পুঁজি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে তুলে ধরে। শিল্পোদ্যোক্তা ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার সময় আবেদনপত্রের সাথে দাখিলকৃত প্রজেক্ট প্রোফাইল এবং জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রির লক্ষ্যে কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রসপেকটাস ব্যবসায় পরিকল্পনারই রূপান্তরিত নাম। সাধারণতঃ ব্যবসায় পরিকল্পনা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তৈরি করা হয়।

ক) এটি হলো প্রস্তাবিত ব্যবসায় সংগঠনের লিখিত দলিল। এর মধ্যে ব্যবসায়ের বর্তমান অবস্থা, প্রত্যাশিত বিষয় এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের উল্লেখ থাকে।

খ) প্রকল্প, বাজারজাতকরণ গবেষণা ও উন্নয়ন, উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, অর্থায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ব্যবসায় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত থাকে।

গ) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থায়নের একটি লিখিত দলিল হিসেবেও ব্যবসায় পরিকল্পনাকে বিবেচনা করা হয়।

ঘ) ব্যবসায় পরিকল্পনা মুনাফা অর্জনের জন্য পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের দিক নির্দেশনা প্রদান করে।

ঙ) এটি মূলত ব্যবসায়িক সাফল্যের প্রথম প্রদর্শক।

চ) ব্যবসায় পরিকল্পনা ব্যবসায়িক সকল কাজের ভিত্তিস্বরূপ।

পরিশেষে বলা যায়, ব্যবসায় পরিকল্পনা হলো এমন একটি প্রতিবেদন যার মাধ্যমে ব্যবসায়ের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে সবিস্তারে জানা যায়, যা ব্যবসায়িক সফলতা অর্জনের পথ প্রদর্শক। ব্যবসায় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো- ব্যবসায়ের বর্তমান অবস্থা, অভিযত করণীয়, বাজার শেয়ার, বিক্রয় পূর্বাভাস, পণ্য বা সেবা সম্পর্কিত বিষয়, ঝুঁকি মোকাবেলার পন্থা ইত্যাদি।

১.২ ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও অর্থায়ন:

ব্যবসায়িক পরিকল্পনা:

আপনার মাঝে ব্যবসায়িক ধারণা আছে কিন্তু এই ধারণাকে বাস্তবতার মুখ দেখানোর জন্য প্রথম পদক্ষেপ হল পরিকল্পনা করা। একটা ভালো ব্যবসায়িক পরিকল্পনা শুধু বিনিয়োগকারীকে আকৃষ্টই করে না বরং ভবিষ্যতের জন্য পথ নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে। একটি ভালো ব্যবসায়িক পরিকল্পনার গঠনে থাকবে যেখানে আপনার ব্যবসা কি, আপনার বাজার কোথায়, কিভাবে পরিচালনা করবেন, কিভাবে অর্থ আয় ও ব্যয় আসবে, কি ধরনের পণ্য বা সেবা, বিক্রি ও বাজারজাতকরণ পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত থাকবে।

যে কোন কাজ সফলভাবে পরিচালনার জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন। একটি ব্যবসাকে ভালোভাবে ও লাভজনকভাবে পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা মাসিক পরিচালিত হওয়া অত্যন্ত জরুরী। ব্যবসায়ে অধিক মুনাফা লাভ ও সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য যে পরিকল্পনা তৈরি করে তাকে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বলে।

পরিকল্পনা কোন কাজের অর্ধেক। ব্যবসা শুরু করতে হলে দরকার একটি কার্যকারী পরিকল্পনা। তাই ব্যবসায় সফলতা অর্জন করতে চাইলে দরকার একটি সঠিক পরিকল্পনা। সুতরাং ব্যবসা শুরু করতে গেলে ৩-৪ বছর একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে হবে। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যবসা শুরু করার আগে ব্যবসা পরিকল্পনা কি জানা দরকার। ব্যবসা পরিকল্পনা হল একটি লিখিত পরিকল্পনা যা ব্যবসা শুরু করার আগে তৈরি করা হয়। এককথায় সাধারণত একটি নতুন ব্যবসা কীভাবে তার লক্ষ্য অর্জন করবে সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে। একে ব্যবসায়িক পরিকল্পনাও বলা হয়। এক কথায়, ব্যবসায়িক কার্য সম্পাদনের জন্য যে ধরনের পরিকল্পনা করা হয় তাকে ব্যবসা পরিকল্পনা বলে।

পরিকল্পনার ধাপ সমূহ:

১. ব্যবসায় প্রবন্ধ ধারণা চিহ্নিতকরণ : এটি হলো ব্যবসায় পরিকল্পনার প্রথম ধাপ। বিভিন্ন ধারণা হতে উদ্যোক্তার কাছে গ্রহণযোগ্য এমন কিছু প্রকল্প ধারণা সংক্রান্ত চিহ্নিতকরণ
২. প্রকল্পের প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই : প্রকল্প ধারণা চিহ্নিতকরণ পর্যায়ে যে সকল প্রকল্পের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয় সে সকল প্রকল্প প্রাথমিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে যথোপযুক্ত প্রকল্পগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করা।
৩. প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই : প্রকল্পের প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ফলাফল অনুকূলে হলে বাস্তব প্রকল্প প্রণয়নে কাজ শুরু হয়। ম্যাক্রো স্কিনিং এবং মাইক্রো স্কিনিং পদ্ধতির মাধ্যমে এ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়।
৪. প্রকল্প নির্বাচন : এ পর্যায়ে মাইক্রো স্কিনিং পদ্ধতির মাধ্যমে যে প্রকল্পের গুরুত্ব বেশি হবে সেটিকে ব্যবসায় উদ্যোক্তা বিনিয়োগের জন্য নির্বাচন করে এবং উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

ব্যবসায়িক পরামর্শকেরা ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তৈরি করতে নিচের বিষয়গুলো গুরুত্ব দিতে বলেন।

ধারণা	
কৌশল	
মুনাফা	
দল	
পণ্য	
বিপণন	

ব্যবসায় পরিকল্পনার বিষয়বস্তু:

কোন বাড়িকে মজবুতভাবে বানাতে গেলে তার ভিতকে যেমন শক্ত করে গড়ে তুলতে হয়, তেমনি কোন ব্যবসা শুরু করতে বা চালিয়ে নিয়ে যেতে গেলে তার জন্য মজবুত পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। আর আপনার এই ব্যবসা যখন আকারে ক্ষুদ্র হয়, তখন এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে আপনাকে এবং আপনার ব্যবসার অন্যান্য অংশীদারদের করতে হয়। আর সেই কারনেই এই কাজটি কোন নতুন উদ্যোক্তার জন্য একটু কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

তবে একটি ব্যবসায় পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত ১০টি বিষয় থাকেঃ

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম	ব্যবসায় পরিচালনার ধরন (একক ব্যবস্থাপনা অংশীদারি ব্যবস্থাপনা বা যৌথ ব্যবস্থাপনা)
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	মূলধনের পরিমাণ
উদ্যোক্তা বা উদ্যোক্তাগণের নাম	বাজার জরিপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (বাজারের আকার ভবিষ্যৎ অগ্রগতির সম্ভাবনা বাজার প্রবেশের কৌশল পণ্যের মূল্য নির্ধারণ)
উদ্যোক্তা বা পরিচালকবৃন্দের পরিচিতি	মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা (মুনাফা অর্জনের বর্তমান লক্ষ্য ভবিষ্যৎ লক্ষ্য অর্জনের দিক নির্দেশনা)
ব্যবসায়ের ধরন (একমালিকানা অংশীদারি বা যৌথ মূলধনী ব্যবসায়)	প্রাক্কলিত আর্থিক বিবরণী(মোট প্রকল্প ব্যয়, প্রাক্কলিত আয়, প্রাক্কলিত ব্যয়সমূহ, প্রাক্কলিত আয় ব্যয় বিবরণী)

একটি ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন করার সময় যত্নশীল হওয়া আবশ্যিক। শিল্পোদ্যোক্তা নিজে অথবা অন্য কোন বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিয়ে ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে পারে। একটি সুসম ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় নিম্নে বর্ণিত গাইডলাইনগুলো অনুসরণ করা যেতে পারেঃ

- ব্যবসায় পরিকল্পনা যতটুকু সম্ভব সংক্ষিপ্ত এবং শব্দ বাহুল্য বার্জিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- পণ্য ও বাজারের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের লক্ষ্য দু একটি পণ্য বা অঞ্চলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা উচিত।
- অস্পষ্ট তথ্যের উপর ভিত্তি করে ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত নয়।
- ব্যবসায় সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা বর্তমান ও ভবিষ্যতে উদ্ভব হতে পারে। এমন সমস্যার আলোচনা ব্যবসায় পরিকল্পনায় থাকা আবশ্যিক।
- ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নকালে ব্যবস্থাপনা টিমের সকল সদস্যকে জড়িত করা এবং প্রয়োজন বোধে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
- ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা দলে অপরিচিত ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়। কোন পণ্যকে এমন টেকনিক্যাল শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা উচিত নয় কেবল বিশেষজ্ঞরা বুঝতে পারেন কিন্তু অন্যদের পক্ষে বোঝা কঠিন হয়।
- বাস্তবসম্মত উৎপাদনের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে বিক্রয়ের পরিমাণ হিসাব করতে হবে। অত্যন্ত সাবধানতার সাথে বিক্রয় হিসাব রাখা উচিত।

SWOT এনালাইসিস (দলীয় কাজ)

একটি প্রতিষ্ঠানের সফলতা অর্জন করার জন্য এর বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করতে হয়। মার্কেটিং এ এটি খুব জনপ্রিয় বিষয়। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে (SWOT) বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে ব্যক্তি জীবনেও এটি ব্যবহার করে সফল হওয়া সম্ভব।

কোন প্রতিষ্ঠানের সফলতা, দুর্বলতা, সুযোগ, হুমকি চিহ্নিত করাই (SWOT) বিশ্লেষণ। সফলতা ও দুর্বলতা হলো প্রতিষ্ঠানের ভিতরের বা অভ্যন্তরীণ বিষয়। অন্যদিকে সুযোগ ও হুমকি হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের বাহিরের বা বাহ্যিক পরিবেশের বিষয়। এখানে,

S = Strength (শক্তি)

W = Weakness (দুর্বলতা)

O = Opportunity (সুযোগ)

T = Threats (হুমকি)

শক্তি ও দুর্বলতা হলো একটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। প্রথমে প্রতিষ্ঠানের শক্তি বা সফলতা(Strength) এবং দুর্বলতা(Weakness) গুলোকে চিহ্নিত করতে হবে। এরপর সবলতার যথাযথ ব্যবহার এবং দুর্বলতার কারণ উৎঘাটন করে তা কাটিয়ে উঠতে হবে।

S = Strength (শক্তি) কোম্পানির বা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন করার যে সামর্থ্য বা যোগ্যতা থাকে তাকে সবলতা বা শক্তি বলে। যেমন- প্রতিষ্ঠানের সুনাম, আর্থিক সচ্ছলতা, বাজারজাতকরণ/ব্যবস্থাপনা দক্ষতা	
--	--

ইত্যাদি দিক দিয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সবল হতে পারে। SWOT বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই সফলতা বা শক্তিগুলোকে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। আপনাকে বর্তমান সফলতাগুলো ধরে রাখতে হবে এবং পাশাপাশি সফলতার পরিমাণ আরো বাড়াতে হবে। তবে প্রতিষ্ঠানের সফলতা দেখে খুশি হয়ে গেলে চলবে না।

W = Weakness (দুর্বলতা)

আপনার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন করার ক্ষেত্রে যে সীমাবদ্ধতা থাকে তাই দুর্বলতা বলে। যেমন- প্রতিষ্ঠানের সুনামের অভাব, আর্থিক অসচ্ছলতা, বাজারজাতকরণ/ব্যবস্থাপনা অদক্ষতা, প্রযুক্তিগত অদক্ষতা ইত্যাদি দিক দিয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দুর্বল হতে পারে। SWOT বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই দুর্বলতা গুলোকে কাটিয়ে উঠার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

O = Opportunity (সুযোগ)

ক্রেতাদের প্রয়োজন বা আগ্রহ আছে এমন কিছুকে কোম্পানি/প্রতিষ্ঠান লাভজনকভাবে মেটানোর উচ্চ সম্ভাবনা থাকলে তাকে সুযোগ বলে। সাধারণত এই সুযোগ তিন ধরনের

- চাহিদার তুলনায় সরবরাহে ঘাটতি এমন পণ্য বা সেবা সরবরাহ
- বিদ্যমান পণ্য বা সেবাকে নতুনভাবে বা উৎকৃষ্ট উপায়ে সরবরাহ
- পুরোপুরি নতুন পণ্য বা সেবা উদ্ভাবন

T = Threats (হুমকি)

হুমকি প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় বা মুনাফা কমিয়ে দেয় এবং চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। এটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন-

উৎকৃষ্টমানের প্রতিযোগী পণ্য অথবা বিকল্প পণ্য বা সেবা বাজারে আসা
সরকারি বিধি-নিষেধের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ
অর্থনৈতিক মন্দা অবস্থা
প্রতিযোগী পণ্যের মূল্য কমে যাওয়া

SWOT Analysis

	Positive	Negative
Internal	Strengths	Weaknesses
External	Opportunities	Threats



ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রণয়ন:

একটি ভালো মানের ব্যবসা পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন অত্যাবশ্যকীয়। একটি ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে ব্যবসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এই পরিকল্পনায় বাজার, উৎপাদন, সংগঠন ও আর্থিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়। ব্যবসায়িক পরিকল্পনার প্রণয়ন ৪টি মূল উপাদান রয়েছে। উপাদানগুলি হচ্ছে

- বিপণন বা বাজারজাতকরণ পরিকল্পনা
- উৎপাদন পরিকল্পনা
- সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
- আর্থিক পরিকল্পনা

ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন এর প্রয়োজনীয়তা:

- ব্যবসাসমূহ টেকসইভাবে পরিচালনা এবং বিশ্লেষণের জন্য আর্থিক হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন দেয়া।
- ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দলগুলোতে অতিরিক্ত মূলধন ও নতুন বিনিয়োগের জন্য বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে (ব্যাংক, প্রাইভেট সেক্টর) আকৃষ্ট করা।
- ব্যবসায়িক পরিকল্পনা টুলকে মনিটরিং বোর্ড হিসাবে ব্যবহার করা যাতে করে তার ব্যবসার অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং ব্যবসা নতুনভাবে ডিজাইন করতে পারে।
- ভবিষ্যত সুযোগসমূহ অনুসন্ধান ও পরীক্ষার মাধ্যমে বিনিয়োগের ঝুঁকি যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনা;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যবসা পরিকল্পনা করা অপরিহার্য।
- ব্যবসা পরিকল্পনা ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংকারদের কাছে বিনিয়োগকারীদের প্রধান দলিল হিসাবে কাজ করে। ব্যবসা পরিকল্পনার মাধ্যমে কি করা হবে, কেন করা হবে, কিভাবে করা হবে, কতটুকু করা হবে, কোথায় করা হবে এবং কে করবে এসমস্ত প্রশ্নের অগ্রীম উত্তর পাওয়া যায়।

আর্থিক পরিকল্পনা কি?

কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অর্থ সংক্রান্ত পরিকল্পনাই হলো আর্থিক পরিকল্পনা। একটি প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য আর্থিক পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার সঠিক চিত্র বোঝা যায়।

উদ্যোক্তা তার ব্যবসায় ভবিষ্যতের জন্য আর্থিক বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাকে আর্থিক পরিকল্পনা বলে। কোন ব্যবসা শুরু করার পূর্বশর্ত হলো অর্থ বা মূলধন।

এই পরিকল্পনায় চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে।

- নগদ মূলধন
- আয় ব্যয় বিবরণী
- উদ্বৃত্তপত্র
- তহবিল বিবরণী

আর্থিক পরিকল্পনার মাধ্যমে একজন উদ্যোক্তা তার নিজের ব্যবসায়ের লাভ ও চলমান অর্থের পরিকল্পনা করতে পারবে।

আর্থিক পরিকল্পনার জন্য উদ্যোক্তার নিম্নের বিষয়সমূহ গুরুত্বপূর্ণ

বাজেট: একটি নির্দিষ্ট সময়কে ধরে আয় ব্যয়ের হিসাব হলো বাজেট।

প্রারম্ভিক মূলধন: কোন ব্যবসায় এককালীন সময়ে যে মূলধন প্রয়োজন তাই প্রারম্ভিক মূলধন। প্রারম্ভিক মূলধন হচ্ছে ব্যবসা শুরুর অর্থ, যা অবশ্যই প্রয়োজন এবং কি পরিমাণ প্রারম্ভিক মূলধন দরকার এবং ব্যবসা শুরু করার জন্য কোথা থেকে এই মূলধন পাবেন তা আপনাকে পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে।

প্রারম্ভিক মূলধনের ধরণ ও উৎস: যখন আপনি আপনার ব্যবসা শুরু করার জন্য প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ হিসাব করবেন, পরবর্তী প্রশ্ন হল কোথা থেকে আপনি আপনার মূলধন পাবেন? শুরুতেই আপনার সম্পূর্ণ অর্থের প্রয়োজন হবে কারণ টাকাই হচ্ছে ব্যবসা শুরুর প্রথম মাসের প্রাথমিক বিনিয়োগ। এটা এজন্য গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি ব্যবসা শুরু করতে পারবেন না যতক্ষণ আপনি আপনার প্রয়োজনীয় প্রারম্ভিক মূলধন হাতে না পাচ্ছেন।

প্রারম্ভিক মূলধনের গুরুত্বপূর্ণ ধরন হচ্ছে, ১. নিজস্ব অংশ, ২. ঋণ, ৩. চলতি মূলধন

চলতি মূলধন: ব্যবসায়িক কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য প্রতিনিয়ত যে মূলধন প্রয়োজন তাই চলতি মূলধন

চলতি মূলধনের উৎস: নির্দিষ্ট তহবিল, ধার কর্তৃক, ঋণ ইত্যাদি

ব্যবসার পূর্ব খরচ: ব্যবসা শুরু করার পূর্বে যে খরচ যেমন, বাজার জরিপ, প্রশিক্ষণ, ট্রেড লাইসেন্সসহ বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় লাইসেন্স, ব্যাংক হিসাব খোলা, ফার্গিচার ক্রয়, ডেকোরেশন, দোকান ভাড়া, প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় ইত্যাদি।

মোট বিনিয়োগ: ব্যবসায় অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক খরচ আর অন্যান্য খরচের মোট খরচই হলো মোট বিনিয়োগ

লাভ ক্ষতির হিসাব: ব্যবসার প্রথম মাসেই লাভ করা সম্ভব হয় না। বিক্রয় শুরুর সাথে সাথে টাকা আসে না এর জন্য সময়ের প্রয়োজন হয়। এই সময়ে ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ থাকে এবং আপনাকে অবশ্যই অর্থনৈতিক বিষয়ে নজর রাখতে হবে।

আর্থিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আপনার নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে

১. পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বিক্রয় ও খরচ অনুসরণ করে চলতে হবে।

২. উভয় পরিকল্পনার তুলনামূলক নথি থাকতে হবে।

৩. যে কোন ভুলের ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

৪. শ্রম ব্যয় নির্ধারণ করা (ছক অনুসারে)

৫. নিজের আর্থিক স্বক্ষমতা যাচাই করা।

৬. অর্থের উৎস খুঁজে বের করা (ব্যাংক ও এনজিও)

আর্থিক পরিকল্পনা নিতে নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

১. স্থায়ী সম্পদ (ভূমি, দালান, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ও পরিবহন)

২. চলতি মূলধন: উৎপাদনের সাথে জড়িত জনবল, কারখানার সার্বিক খরচ (উপযোগ রক্ষণাবেক্ষণ, অবচয়, ভাড়া, কঁচামাল খরচ, বিপণন খরচ, প্রশাসনিক খরচ)

৩. ব্যবসায় পূর্ব খরচ (ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ, রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স, চুক্তি সম্পাদন, জনবল নিয়োগ, উপযোগ সংযোগ)

৪. প্রকল্পের মোট ব্যয়/ব্যবসায় মোট বিনিয়োগ

৫. স্থায়ী সম্পদ+ চলতি মূলধন+ ব্যবসা পূর্ব খরচ

নতুন ব্যবসা শুরুর ক্ষেত্রে ২ টি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ,

- অবশ্যই লাভ করতে হবে

- টাকা ছাড়া আপনি ব্যবসা চালু রাখতে পারবেন না

আপনার ব্যবসা কিছু সময়ের জন্য লোকসানে চলতে পারে কারণ আপনি প্রারম্ভিক মূলধন থেকে কিছু টাকা শুরুরতাই বিভিন্ন কাজে ব্যয় করতে পারেন কিন্তু যখন প্রারম্ভিক মূলধন শেষ হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আপনাকে খরচের চেয়ে বেশী বিক্রয় করতে হবে। অন্যথায় আপনার মূলধন শূন্য হয়ে যাবে।

ব্যবসা শুরু করার পূর্বেই আপনাকে লাভ এবং চলমান অর্থ বা খরচ উভয়ের পরিকল্পনা করতে হবে। যখন আপনি ব্যবসা শুরু করবেন আপনাকে অবশ্যই বিক্রয় এবং খরচ অনুসরণ করে চলতে হবে এবং সেটা হতে হবে আপনার পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী। যদি কোন কিছুতে ভুল হয়ে যায় আপনাকে অবশ্যই দ্রুততার সাথে সমস্যা সমাধান করতে হবে।

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অনুসরণ করার মাধ্যমে আপনাকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে,

- বিক্রয় এবং খরচের পরিকল্পনা করতে হবে
- চলতি হিসাব পরিকল্পনা করতে হবে
- উভয় পরিকল্পনার তুলনামূলক নথি প্রতি মাসেই করতে হবে
- যে কোন ভুলের ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে

বিক্রয় এবং খরচ পরিকল্পনা:

বিক্রয় এবং খরচ পরিকল্পনা হচ্ছে আপনার ব্যবসার বিক্রয়, খরচ এবং লাভের প্রতি মাসের হিসাব। বিক্রয় এবং খরচের পরিকল্পনা মূলত বাৎসরিক হয়ে থাকে। ব্যবসার শুরুতেই যদি কোন ভুলের কারণে আপনার ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেক্ষেত্রে বিক্রয় এবং খরচের পরিকল্পনা আপনাকে হতাশায় ফেলতে পারে। বরং ভবিষ্যৎ খরচ আপনি যা চিন্তা করেছেন তার থেকে বেশীও হতে পারে। এই অবস্থায় আপনি মনে করতে পারেন আপনি শুরুতেই যে চিন্তা করেছেন তা হয়তো সঠিকভাবে নাও চলতে পারে।

তথ্যের দিকে তাকিয়ে চিন্তা এবং পরিকল্পনা করেন। উদাহরণস্বরূপ, যখন আপনি পণ্য অথবা সরঞ্জাম এর ভবিষ্যৎ খরচ নির্ধারণ করবেন তখন অবশ্যই সরবরাহকারীর কাছ থেকে মূল্য নিয়ে করতে হবে ধারণা থেকে নয়।

প্রথম বছরের বিক্রয় এবং খরচের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আপনাকে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অনুসরণ করতে হবে,

১. প্রথম বছরের প্রতি মাসের বিক্রয়ের আনুমানিক হিসাব:

২. প্রত্যেক প্রয়োজনীয় উপকরণের আনুমানিক খরচ:

৩. প্রথম বছরের প্রতি মাসের প্রত্যক্ষ উপকরণ খরচ নির্ধারণ:

৪. প্রত্যেক উপকরণের শ্রমব্যয় নির্ধারণ:

৫. প্রথম বছরের প্রতি মাসের সরাসরি শ্রমব্যয় নির্ধারণ:

৬. প্রথম বছরের প্রতি মাসের পরোক্ষ খরচ নির্ধারণ:

৭. বিক্রয় এবং খরচের পরিকল্পনা সম্পন্নকরণ সকল উদ্যোক্তাকে ব্যবসা শুরু থেকে নিম্নোক্ত রেজিস্টারে দৈনন্দিন আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে

নমুনা আয়-ব্যয় হিসাব সংরক্ষণ খাতা

তারিখ	খরচের খাতসমূহ	টাকা	বিক্রয় ও অন্যান্য খাত হতে আয়	টাকা	অপারেটিং লাভ/ক্ষতি

মূলধন এর ধরণ এবং উৎস

মূলধন বলতে মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত সম্পদের সেই অংশকেই বোঝায় যা পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়।

মূলধনের শ্রেণীবিভাগ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূলধন কে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। নিম্নে এসব শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হল -

স্থায়িত্বের ভিত্তিতে:

১) স্থায়ী মূলধন: যে সব মূলধন দীর্ঘদিন ধরে টিকে থাকে এবং বার বার ব্যবহারের পরেও যার কোন পরিবর্তন হয় না তাকে স্থায়ী মূলধন বলে। যেমন- যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা ইত্যাদি। স্থায়ী মূলধন একবার ব্যবহারে নিশেষ হয়ে যায় না। তবে স্থায়ী মূলধনের অবচয় ঘটে।

২) চলতি মূলধন: যে সব মূলধন মাত্র একবার উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয় তাকে চলতি মূলধন বলে। যেমনপাট, কাঠ,তুলা, কয়লা ইত্যাদি চলতি মূলধনের অন্তর্গত। কেননা এগুলো একবার ব্যবহারের পর তার কোন অস্তিত্ব

থাকে না। নিচে ছকের মাধ্যমে স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধনের পার্থক্য দেখানো হলো

ছক ১৪.১.১: স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধনের পার্থক্য

স্থায়ী মূলধন	চলতি মূলধন
১) স্থায়ী সম্পত্তির সাহায্যে স্থায়ী মূলধন প্রকাশ করা হয়।	১) চলতি সম্পত্তির সাহায্যে চলতি মূলধন প্রকাশ করা হয়।
২) ব্যবহারের শুরু লগ্ন থেকে স্থায়ী মূলধনের প্রয়োজন হয়।	২) গঠনের পর ব্যবহারিক কার্যক্রম চালু করতে চলতি মূলধন এর প্রয়োজন হয়।
৩) স্থায়ী মূলধন নগদ আকারে রাখা যায় না।	৩) চলতি মূলধন নগদ আকারেও থাকে।
৪) স্থায়ী মূলধন সহজে পরিবর্তন যোগ্য নয়। এটি অনমনীয়।	৪) চলতি মূলধন সহজে পরিবর্তনযোগ্য। এটি সাধারণত নমনীয়।
৫) দীর্ঘ মেয়াদী উৎস থেকে স্থায়ী মূলধন সংগ্রহ করা হয়।	৫) স্বল্পমেয়াদী উৎস থেকে চলতি মূলধন সংগ্রহ করা হয়।
৬) প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধির সাথে স্থায়ী মূলধন বৃদ্ধি করতে হয়।	৬) প্রাতিষ্ঠানিক আয় বৃদ্ধির জন্য চলতি মূলধন বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় না।
৭) ব্যবসায়ে দীর্ঘ সময় ধরে এ স্থায়ী মূলধনের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।	৭) ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ ১ বছর পর্যন্ত চলতি মূলধনের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

মালিকানা ভিত্তিতে

জাতীয় মূলধন: যে মূলধন রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে তাকে জাতীয় মূলধন বলে। যেমন- ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান, রেলওয়ে, বিমান ইত্যাদি জাতীয় মূলধনের অন্তর্গত।

ব্যক্তিগত মূলধন: যে মূলধন কোন ব্যক্তি বিশেষের মালিকানার থাকে তবে তাকে ব্যক্তিগত মূলধন বলে। যেমনবাড়িঘর, শেয়ার ইত্যাদি ব্যক্তিগত মূলধনের অন্তর্গত।

ব্যবহারের ভিত্তিতে

নিমজ্জমান মূলধন: যে মূলধন একটি বিশেষ ধরনের উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয়, তাকে নিমজ্জমান মূলধন বলা হয়। যেমন- রেলইঞ্জিন, লোহা গালার চুল্লি ইত্যাদি মূলধনের অন্তর্গত।

ভাসমান মূলধন: যে মূলধন বিভিন্ন উৎপাদন কাজে একটি শিল্প থেকে অন্য শিল্পে স্থানান্তর করা যায় তাকে ভাসমান মূলধন বলা হয়। যেমন- কয়লা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি ভাসমান মূলধনের অন্তর্গত।

ভোগের ভিত্তিতে

ভোগের ভিত্তিতে মূলধনকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ১) ভোগ্য মূলধন ২) উৎপাদক মূলধন

ভোগ্য মূলধন : যে মূলধন উৎপাদন চলাকালে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের ভরনপোষন ও জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহার করা হয়, তাকে ভোগ্য মূলধন বলা হয়। যেমন- শ্রমিকের খাদ্য, বস্ত্র বাসস্থান ইত্যাদি ভোগ মূলধনের অন্তর্গত।

উৎপাদক মূলধন : যে সব মূলধন উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে তাকে উৎপাদক মূলধন বলে। যেমন-যন্ত্রপাতি,কাঁচামাল, কল কারখানা ইত্যাদি।

ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন টেমপ্লেট পরিচিতি

ব্যবসার পরিচিতি:

১. প্রতিষ্ঠানের নাম :
২. প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :
৩. প্রতিষ্ঠার তারিখ :
৪. উদ্যোক্তার নাম :
৫. ব্যবসার নাম :
৬. ব্যবসার ধরণ :
৭. প্রধান উৎপাদন পণ্য :

বাজারজাতকরণ পরিকল্পনা :

১. দ্রব্যের বর্ণনা :
২. প্রধান গ্রাহক (ক্ষেত্র) :-----
৩. মোট চাহিদা :-----
৪. উৎপাদনের চাহিদা (অন্তত ৩ বছরের) :

ক্র. নং	বছর	পণ্যের পরিমাণ (প্রতিদিন)	পণ্যের পরিমাণ (বার্ষিক)	মন্তব্য

৫. বাজারজাতকরণের বাজেট :

(ব্যবসার পণ্য/সেবা সম্পাদন এবং বিতরণ করতে নিম্নলিখিত আর্থিক পরিকল্পনা করা হয়েছে)

ক্র. নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১			
২			
মোট :			

৬. বিক্রয় মূল্য :

৭. বিক্রয়ের পূর্বাভাস (অন্তত ৩ বছরের) :

(এটা পূর্বাভাস দেয়া যায় যে, ব্যবসাটি নিম্নলিখিত পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করতে সমর্থ হবে)

বছর	পণ্য	চাহিদা	মূল্য	মন্তব্য

উৎপাদন পরিকল্পনা :

১. উৎপাদন প্রক্রিয়া :

২. স্থায়ী সম্পদের বিবরণ : ক)-----, খ)-----, গ)-----

৩. বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ :

৪. প্রয়োজনীয় কাঁচামাল :

ক্র. নং	বিবরণ	পরিমাণ (বার্ষিক)	প্রতি একক মূল্য(টাকা)	টাকার পরিমাণ (টাকা)
০১				
মোট :				

৫. উৎপাদন খরচ:

ক্র.	বিবরণ	টাকার পরিমাণ (বার্ষিক)	মন্তব্য
০১			
০২			
মোট উৎপাদন খরচ :			

৬. একক উৎপাদন ব্যয়:

সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা :

১. ব্যবসার নাম :

২. ব্যবসায় সাংগঠনিক কাঠামো :

৩. সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় (বার্ষিক) :

ক্র. নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১			
২			
মোট :			

আর্থিক পরিকল্পনা :

১. মোট প্রকল্প ব্যয়:

বিষয়াদি	নিজস্ব তহবিল	ঋণ	মোট
ক. স্থায়ী সম্পদ :			
জমি			
বিল্ডিং			
যন্ত্রপাতি, ফার্নিচার			
অন্যান্য			
মোট স্থায়ীসম্পদ :			
খ. চলতি মূলধন :			
প্রত্যক্ষ শ্রমিক			
কাঁচামাল ক্রয়			
বিক্রয় খরচ			
প্রশাসনিক খরচ			
মোট চলতি মূলধন :			
গ. ব্যবসা শুরু পূর্বের খরচ			
ঘ. মোট প্রকল্প খরচ			
ঙ. নিজস্ব মূলধন - ঋণ			

২. ঋণ পরিশোধ বিবরণী:

বছর	সুদ	আসল	স্থিতি	
১ম বছর				
২য় বছর				

৩য় বছর				
৪র্থ বছর				
৫ম বছর				

৩. প্রকল্পে মূলধন বিনিয়োগ, আয় ও ব্যয় বিশ্লেষণ:

মোট মূলধন বিনিয়োগ	
নিজস্ব মূলধন	
অন্যান্য উৎস (ব্যাংক লোন)	
মোট বার্ষিক ব্যয় (আবর্তক/চলতি)	
মোট বার্ষিক আয়	
নীট বার্ষিক মুনাফা (মোট বার্ষিক আয় - মোট বার্ষিক আবর্তক ব্যয়)	
বিনিয়োগ ফেরৎ সময়কাল (মোট বিনিয়োগ/নীট বার্ষিক মুনাফা)	
আয় ও ব্যয়ের অনুপাত (BCR) = মোট আয় /মোট উৎপাদন ব্যয়	

৪র্থ দিন

পুনরালোচনা: সহায়ক পছন্দসই একটি গেইম এর মাধ্যমে কয়েকজনের কাছ থেকে পূর্বের দিনের শিখন জানতে চাইবেন।

অধিবেশন -৪.১: আর্থিক ব্যবস্থাপনা

দিন-৪, অধিবেশন ৪.১ : সময়: ৯.৩০-১০.০০ ব্যাপ্তি: ৬০ মিনিট

সেশন শিরোনাম	: পরিচিতি পর্ব
সেশন লক্ষ্য	: এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও অর্থায়ন সম্পর্কে অবগত হবেন।
উদ্দেশ্য	: এ সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- - পণ্য ও সেবার খরচ নির্ধারণ সম্পর্কে ধারণা পাবে - অ্যাকাউন্টিং বা রেকর্ড কিপিং সম্পর্কে ধারণা পাবে
উপকরণ	: ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, অডিও/ভিডিও মিউজিক, পোস্টার পেপার/বোর্ড, মার্কার
পদ্ধতি	: ডিপকার্ড, পোস্টার পেপার প্রদর্শন, গল্প বলা, প্রশ্নোত্তর, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা
পঠন উপকরণ	: হ্যান্ডআউট
পূর্ব প্রস্তুতি	: সহায়ক পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও বোর্ড প্রস্তুত করে রাখবেন।
মূল্যায়ন পদ্ধতি	: প্রশ্নোত্তর

প্রক্রিয়া:

৪.১ আর্থিক ব্যবস্থাপনা

যে কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রম বা অর্থনৈতিক লেনদেন করার জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। এইরূপ অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবহার এবং কার্য সম্পাদনের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা, বিজ্ঞানসম্মত নীতি, কাঠামো, সূত্র, পদ্ধতি ও কলা কৌশলের প্রয়োজন হয়। এগুলোর পেছনে রয়েছে একটি সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কলা কৌশলের গুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অর্থায়নের সাথে সম্পৃক্ত কলা কৌশলের গুলো ব্যবহার করে উদ্দেশ্য সাধনের প্রক্রিয়াই আর্থিক ব্যবস্থাপনা।

সুতরাং কোন ব্যক্তি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা সরকারের বিভিন্ন খাতে অর্থের প্রয়োজন, পরিমাণ নির্ণয়, অর্থের বিকল্প উৎসসমূহ সনাক্তকরণ, বিভিন্ন নীতি ও শর্তসমূহ বিবেচনার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ এবং তা সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের বা সরকারের উদ্দেশ্য সাধনের প্রক্রিয়াকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা বলা হয়।

পণ্য ও সেবার খরচ নির্ধারণ

পণ্যের সঠিক খরচ নির্ধারণ করা যেকোন ব্যবসায়ীর জন্য অত্যন্ত কঠিন কাজ। সঠিক খরচ নির্ধারণের সুনির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি নাই। কিন্তু সঠিক খরচ নির্ধারণ করা না হলে তার পরিনতি খুবই খারাপ হয়। এর চূড়ান্ত ফলাফল হল ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়া। পণ্যের খরচ নির্ধারণের সময় সব খরচ বিবেচনায় না নিলে বা বেশি মূল্য নির্ধারণ করার ফলে পণ্য বিক্রয় না হলে এর চূড়ান্ত ফলাফল হিসাবে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

উৎপাদন/ সেবা প্রক্রিয়ায় প্রতিটি পৃথক এককের পেছনে ব্যয়কৃত অর্থ দ্বারা বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করার প্রক্রিয়াকে সাধারণত খরচ নির্ধারণ বা খরচ নিরূপণ বলে। খরচ সাধারণত নিম্নোক্ত উপায়ে নির্ধারণ করা হয়

- **পরিবর্তনশীল খরচ:** একক প্রতি পণ্য/কাঁচামালের খরচ, শ্রম ব্যয়, প্রত্যক্ষভাবে যন্ত্রপাতির অবচয়, জ্বালানী।
- **স্থির খরচ:** জমি, পরোক্ষ কাজে ব্যবহৃত শ্রম, জ্বালানী ও যন্ত্রপাতির অবচয় যা সরবরাহকৃত একক দ্বারা প্রভাবিত নয়।
- **একক প্রতি খরচ:** একক প্রতি পরিবর্তনশীল খরচ + মোট স্থির খরচ।

পণ্যের মূল্য নির্ধারণ কৌশল:

- মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়:
- গ্রাহকের নিকট গ্রহণযোগ্যতাই আপনার পণ্য বিক্রিতে সহায়তা করতে পারে।
- বাজারের প্রতিযোগীদের বর্তমান মূল্য এবং ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতাকে বিবেচনা করতে হবে।
- পণ্যে কী ধরনের মূল্যমান সংযোজন করা হলে গ্রাহক আপনার পণ্য ক্রয়ে উৎসাহিত হবে তাও বুঝতে সহায়তা করবে।
- পরিবর্তনশীল খরচ ও স্থায়ী খরচ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- যথা সম্ভব উৎপাদন খরচ কম রাখা, উৎপাদনকারী প্রতিযোগীর সংখ্যা অনুযায়ী।

সঠিক মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি: পণ্যের বিক্রয় মূল্য স্থির করার জন্য তিনটি প্রণালী/পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। একটি পণ্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সবচেয়ে জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

- **মূল্য সংযোগ পদ্ধতি:** লাভকে সম্ভাব্য অবস্থায় রেখে এই মূল্য নির্ধারণ ইহা করা হয়। যেমনঃ পণ্যের খরচ ৫% থেকে ১৫% মধ্যে রাখা হয়।
- **প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি:** বাজারে অন্যান্য পণ্য ও সেবাদানের সঙ্গে তুলনা করে করা হয়। একই স্তরের প্রতিযোগিতামূলক পণ্য অথবা সেবাদানের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিম্নোক্তভাবে মূল্য স্থির করা হয়। সমমানের পণ্য যদি খরচের কম মূল্য হয়, তাহলে খরচ কমানো উচিত এবং একইভাবে পণ্যের আরো আকর্ষণীয়তা বাড়ানোর পরে প্রতিযোগিতায় যাওয়া উচিত তাহলে বেশি মূল্য আশা করা যায়।
- **ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি:** ইহা পণ্য এবং সেবাদানের চাহিদা ও সরবরাহের সহিত সম্পর্কযুক্ততার উপর নির্ভর করে প্রয়োগ করা হয়। যদি একটি পণ্য বাজারে দুর্বল হয়, তাহলে ইহার মূল্য মূল্য সংযোগ পদ্ধতির চাইতে অধিক মূল্য হবে। অনুরূপভাবে যদি একটি পণ্য বাজারে বেশি হয় তাহলে, তার মূল্য স্থিরকৃত মূল্যের চাইতে কম হবে।

খরচ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা:

প্রাথমিক খরচাবলি: [কোন কারবার শুরু করার পূর্বে] প্লান খরচ, মিটিং খরচ, লাইসেন্স খরচ এবং আরও যাবতীয় খরচ যা কারবার শুরু করা আগে কারবার শুরু করার জন্যে করা হয়েছে এসব খরচের সমষ্টিই প্রাথমিক খরচ। প্রাথমিক খরচাবলি হিসাববিজ্ঞানে সম্পদ হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।

স্টাফ/কর্মীর খরচ নির্ধারণ:

প্রস্তুতকারক বা সেবা প্রদানকারীর জন্য খরচ নিরূপণ (কস্টিং)

প্রস্তুতকারক বা সেবা প্রদানকারীর প্রতিটি পণ্যের মোট মূল্য হিসাব করার জন্য নিচের তিনটি পদক্ষেপ করতে হবে।

প্রতিটি পণ্যের মোট পরিবর্তনশীল খরচ	+	প্রতিটি পণ্যের মোট স্থায়ী খরচ	=	প্রতিটি পণ্যের মোট খরচ
---------------------------------------	---	-----------------------------------	---	------------------------

পণ্যের খরচ নিরূপন(কস্টিং)

(প্রস্তুতকারক বা সেবা প্রদানকারীর জন্য)

পণ্য:

১. পণ্য প্রতি পরিবর্তনশীল খরচ

কলাম ১	কলাম ২	কলাম ৩	কলাম ৪	
খরচের খাত	একক প্রতি ক্রয় খরচ	পণ্য প্রতি আনুমানিক পরিমাণ	পণ্য প্রতি আনুমানিক খরচ	
পণ্য প্রতি মোট পরিবর্তনশীল খরচ (১)				
২. পণ্য প্রতি স্থায়ী খরচ				
প্রতি মাসের মোট স্থায়ী খরচ (২)				
প্রতি মাসে ব্যবসার মোট পরিবর্তনশীল খরচ (৩)				
পরিবর্তনশীল খরচ প্রতি স্থায়ী খরচ (৪) = (২) ÷ (৩)				
পণ্য প্রতি স্থায়ী খরচ (৫) = (৪) × (১)				
পণ্য প্রতি মোট খরচ (৬) = পরিবর্তনশীল খরচ (১) + স্থায়ী খরচ (৫)				

আপনার প্রতিটি পণ্য বা সেবার জন্য পরিবর্তনশীল খরচ নির্ণয় করতে নিচের পাঁচটি পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হবে।

পদক্ষেপ লিখতে হবে

একজন খুচরা বিক্রেতা বা পাইকারী বিক্রেতার জন্য খরচ নিরূপণ (কস্টিং)

খুচরা বিক্রেতা এবং পাইকারী বিক্রেতা একই ধরনের খরচ করেন এবং সাধারণত একই খরচ নিরূপন করতে পারেন। তারা প্রতিটি পণ্যের মোট মূল্য নির্ণয় করার জন্য পদ্ধতিটি অনুসরণ করতে হবে।

প্রতিটি পণ্যের মোট
পরিবর্তনশীল খরচ

+

প্রতিটি পণ্যের মোট স্থায়ী খরচ

=

প্রতিটি পণ্যের মোট খরচ

পণ্যের খরচ নিরূপন (কস্টিং)

(খুচরা বিক্রেতা বা পাইকারী বিক্রেতার জন্য)

স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল খরচের অনুপাত (%)

প্রতি মাসের মোট স্থায়ী খরচ (২)

----- × 100% =

প্রতি মাসের ব্যবসার মোট

পরিবর্তনশীল খরচ (৩)

খরচ(৪)

পরিবর্তনশীল খরচ প্রতি স্থায়ী

	১	২	৩
পন্য	প্রতিটি পণ্যের পরিবর্তনশীল খরচ (১)	প্রতিটি পণ্যের স্থায়ী খরচ (৫) = (১) × (৪)	প্রতিটি পণ্যের মোট খরচ (৬) = (১) + (৫)

পদক্ষেপ লিখতে হবে

অ্যাকাউন্টিং বা রেকর্ড কিপিং

অ্যাকাউন্টিং বা রেকর্ড কিপিং হল অ্যাকাউন্টিং একটি প্রাথমিক পর্যায়ে যাতে আর্থিক ব্যবসায়িক লেনদেনের রেকর্ড রাখা, সম্পদ-দায়, লাভ, ক্ষতি ইত্যাদির সঠিক চিত্র জানা থাকে। উপরন্তু, এটি ব্যয় কমাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সহায়তা করে এবং গুরুত্বপূর্ণ আইনি এবং ট্যাক্স উদ্দেশ্যে তথ্য। অন্য কথায়, একটি অ্যাকাউন্টিং বা রেকর্ড কিপিং সিস্টেম যে কোনো কোম্পানির আর্থিক কার্যামের মেরুদণ্ড।

ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা:

গ্রাহকদের কাছে যেসব পণ্যের প্রয়োজন এবং চাহিদা রয়েছে সেসব পণ্যের মজুদ তৈরী এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রক্রিয়াকে ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা বলা হয়। ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা হলো কাঁচামাল এবং প্রস্তুত পণ্যসমূহের তৈরী, সংরক্ষণ এবং তা থেকে মুনাফা অর্জনের একটি নিয়মানুগ প্রক্রিয়া।

হিসাব ব্যবস্থাপনা:

হিসাব ব্যবস্থাপনা হল প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকদের নিতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজে হিসাবের তথ্যগুলো বিশেষ বিন্যাসে ও পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হল ব্যবস্থাপকরা যেন প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত থাকতে পারেন এবং উক্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষণ করতে পারেন। শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য ও নানাবিধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দ্বারা পরিবেষ্টিত সঙ্গী কর্মব্যস্ত এ আধুনিক হিসাব ব্যবস্থাপনা একটি আধুনিক ধারণা। হিসাব ব্যবস্থাপনা এমন এক কৌশল বা পদ্ধতি যা ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিতি নির্ধারণ ও দৈনন্দিন কার্য পরিচালনায় ব্যাপকভাবে সহায়তা করে থাকে।

লাভ-ক্ষতি নির্ধারণ:

লাভ বা মুনাফা হল রাজস্ব থেকে সমস্ত খরচ বাদ দেওয়ার পরে অবশিষ্ট পরিমাণ অর্থ। আর আয় হচ্ছে একটি ব্যক্তি বা কোম্পানির উপার্জন করা প্রকৃত পরিমাণ অর্থ।

লাভ: লাভ মূলতঃ দুই ধরনের- ক) মোট লাভ ও খ) নীট লাভ

- মোট লাভের ক্ষেত্রে বিক্রয়লব্ধ আয় থেকে শুধুমাত্র উৎপাদন বাবদ খরচকে বাদ দেয়া হয়।
- বিক্রয়লব্ধ আয় থেকে উৎপাদন খরচ, বিপণন ও প্রশাসনিক খরচ, সুদ ও কর বাবদ খরচসমূহ বাদ দিলে নীট লাভ থাকে।

লাভের হার দুইভাবে নির্ণয় করা যায়ঃ

বিক্রয়ের উপর লাভ = নীট লাভ/ বিক্রয়লব্ধ আয় $\times 100$

বিনিয়োগের উপর লাভ = নীট লাভ/ মোট বিনিয়োগ $\times 100$

ক্ষতি = খরচ মূল্য- বিক্রয় মূল্য

আর্থিক লেনদেন:

সাধারণত কোনও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও অপর কোন বাহ্যিক পক্ষের মধ্যকার সম্মতির ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত চুক্তির শর্ত মেনে নগদ অর্থ, তথ্য, পণ্যদ্রব্য বা সেবার বিনিময় হলে সেটিকে লেনদেন বলা হয়।

অর্থের আদান প্রদান বা অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায় এরূপ দ্রব্য বা সেবার আদান প্রদানের দ্বারা কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক

ব্যবসায় চাহিদা, যোগান ও মূল্যের সম্পর্ক:

চাহিদা		সরবরাহ		দাম
চাহিদা বেশী	→	সরবরাহ কম	→	দাম বেশী
চাহিদা কম	→	সরবরাহ বেশী	→	দাম কম

অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে এরূপ আদান প্রদানকে আর্থিক লেনদেন বলে।

৪.৩

অধিবেশন -৪.২: মুনাফার পরিকল্পনা

দিন-৪, অধিবেশন ৪.২ : সময়: ৯.৩০-১০.০০

ব্যাপ্তি: ৬০ মিনিট

সেশন শিরোনাম	:	পরিচিতি পর্ব
সেশন লক্ষ্য	:	এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও অর্থায়ন সম্পর্কে অবগত হবেন।
উদ্দেশ্য	:	এ সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- - ব্রেক-ইভেন পয়েন্ট সম্পর্কে ধারণা পাবে - মুনাফার পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা পাবে

উপকরণ	:	ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, অডিও/ভিডিও মিউজিক, পোস্টার পেপার/বোর্ড, মার্কার
পদ্ধতি	:	ভিপকার্ড, পোস্টার পেপার প্রদর্শন, গল্প বলা, প্রশ্নোত্তর, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা
পঠন উপকরণ	:	হ্যান্ডআউট
পূর্ব প্রস্তুতি	:	সহায়ক পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও বোর্ড প্রস্তুত করে রাখবেন।
মূল্যায়ন পদ্ধতি	:	প্রশ্নোত্তর

প্রক্রিয়া:

ব্রেক-ইভেন পয়েন্ট অর্জনের পরিকল্পনা

যে কোন ব্যবসায় মোট খরচগুলিকে ২টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়

- স্থায়ী খরচ
- পরিবর্তনশীল খরচ

মোট বিক্রি থেকে মোট খরচ বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তা মুনাফা। মোট বিক্রি যদি মোট খরচ অপেক্ষা কম থাকে তবে যে পরিমাণ কম থাকে সে পরিমাণকে লোকসান বলে।

প্রত্যেক ব্যবসাতে প্রথম অবস্থায় বিক্রি মোট খরচ মোট অপেক্ষা কম থাকে। যত দিন যেতে থাকে, বিক্রি বাড়তে থাকে। এভাবে একদিন আসে যখন বিক্রির টাকায় কোন মতে ব্যবসার মোট খরচ পোষায়ে যায়, কোনো লোকসান ও হয়না আবার লাভ ও হয়না। সে পরিমাণ মোট বিক্রিকে ব্রেক-ইভেন পয়েন্ট বলে।

ব্রেক-ইভেন পয়েন্ট বের করার সহজ পদ্ধতি হলো :

১. প্রথম বছরের মোট উৎপাদন (P)
২. প্রতি এককের বিক্রি মূল্য (S)
৩. প্রথম বছরের মোট স্থায়ী খরচ(FC)
৪. প্রথম বছরের মোট পরিবর্তনশীল খরচ(VC)
৫. মোট (VC) কে মোট (p) দ্বারা ভাগ করতে হবে
৬. উপরে ৫ নং এ যা পাওয়া যায়, তাকে প্রতি এককের বিক্রি মূল্য(s)থেকে বিয়োগ করতে হয়, $s-(VC/P)=?$ বের করতে হয়।
৭. এবার ৬ নং যা পাওয়া গেলো তাকে মোট FC দিয়ে ভাগ করলে যা পাওয়া যাবে তা ব্রেক-ইভেন পয়েন্ট হবে

ব্রেক ইভেন পয়েন্টের সুবিধা

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লাভ ও ক্ষতি, প্রয়োজনীয় বিক্রয়ের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয় জানার জন্য ব্রেক-ইভেন পদ্ধতি ব্যবহার

১. ব্রেক ইভেন পয়েন্টের মাধ্যমে সহজেই টার্গেট উৎপাদন এবং বিক্রয় নির্ধারণ করা যায়।
২. এর মাধ্যমে মোট পরিচালন ব্যয়, পরিবর্তনশীল ব্যয় এবং স্থায়ী ব্যয় নিরূপণ করা যায়।
৩. এর মাধ্যমে ব্যয় ও মুনাফার সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়।
৪. ব্রেক ইভেন পয়েন্টের মাধ্যমে দু'টো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তুলনা করা যায়।
৫. মুনাফা পরিকল্পনায় ব্যবহার করা যায়।
৬. এর মাধ্যমে উৎপাদনের বিভিন্ন মাত্রায় উৎপাদন ব্যয় নিরূপণ করা যায়।
৭. ব্রেক ইভেন পয়েন্টের সাহায্যে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

একটি (উদ্যোগের) মুনাফার পরিকল্পনা তৈরি করা

বিক্রয় (আয়)	—	খরচ(ব্যয়)	=	মুনাফা
----------------------	---	-------------------	---	---------------

আপনার মোট বিক্রয় থেকে আপনার ব্যবসার সমস্ত খরচ বাদ দেওয়ার পরে যে পরিমাণ অর্থ অবশিষ্ট থাকে তাই আপনার ব্যবসার মুনাফা। সুতরাং মুনাফার পরিকল্পনা করার আগে, আপনাকে অবশ্যই আপনার ব্যবসার জন্য একটি বিক্রয় পরিকল্পনা এবং একটি খরচের পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে।

বিবরণ	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্ট	নভে	ডিসে	মোট
মোট বিক্রয়(আয়)(১)													
ব্যবসার মোট পরিবর্তনশীল খরচ(২)													
থোক মুনাফা(৩)=(১)- (২)													
মোট স্থায়ী খরচ(৪)													
নিট মুনাফা(৫)=(৩)- (৪)													

প্রক্রিয়া: সহায়ক সবাইকে জিজ্ঞাসা করবেন, বলেন তো, কোনো ব্যবসা বা উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে কী কী লাগে? সবাই বলার পর বলবেন, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জরুরী কী? উত্তরে একেক জন একেকটা বলবেন। তখন আপনি বলবেন, ব্যবসার ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপাদান হলো ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। আর এ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সকল উপাদানের গুরুত্ব থাকলেও মূলধনের গুরুত্ব অনেক বেশি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মূলধনকে জীবনী শক্তির সাথে তুলনা করা হয়। রক্ত ছাড়া যেমন জীবন নিচল হয়ে পড়ে, তেমনি মূলধন ছাড়া ছোট-বড় যে কোনো প্রতিষ্ঠান অসাড় হয়ে পড়ে। এই মূলধন আবার অতিরিক্ত হলেও যেমন চলবে না, তেমনি আবার কম হলেও সঠিক পরিকল্পনা করা এবং বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এজন্য একজন উদ্যোক্তাকে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত করে ব্যবসার মূলধন।

ছোট বড় মাঝারিসহ যেকোনো ধরনের ব্যবসার জন্যই মূলধন অপরিহার্য। তবে এ মূলধন কতটুকু প্রয়োজন-এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা মোটেই সহজ নয়। এজন্য প্রয়োজন আর্থিক পরিকল্পনা। ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ এবং তার উপযুক্ত ব্যবহারের যে পরিকল্পনা করা হয় তাই আর্থিক পরিকল্পনা।

মূলধনের বিষয়টি সবসময় উদ্যোক্তাকে ভাবিয়ে তোলে। মূলধন কোথায় থেকে সংগ্রহ করা হবে এবং কোথায় খরচ করা হবে। ব্যবসায় প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ এবং তার সঠিক ব্যবহারের পরিকল্পনাই হলো আর্থিক পরিকল্পনা। ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, ব্যবসা বানিজ্য এমন কি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্থায়ন পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসা বানিজ্যের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব আরো বেশি। ব্যবসা বানিজ্যের ক্ষেত্রে আর্থিক পরিকল্পনা অবশ্যই অবশ্যই বাস্তবমুখি এবং যুগোপযোগী হতে হবে। তা না হলে ব্যবসার অস্তিত্বই টিকে রাখা সম্ভব হবে না।

সাধারণত কয়েকটি ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজন হয়ে থাকে-

ক) নতুন ব্যবসা স্থাপনের জন্যে অর্থের প্রয়োজন;

খ) মজুত পণ্যের জন্যে অর্থের প্রয়োজন;

গ) ব্যবসার পরিধি বর্ধিতকরণের জন্য অর্থের প্রয়োজন;

ঘ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুনর্বির্ন্যাসের জন্য অর্থের প্রয়োজন;

ঙ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নগদ প্রবাহ অথবা কার্যকরী মূলধন বৃদ্ধির জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়।

প্রতিষ্ঠানের অর্থের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের পর এই প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ কত তা নির্ধারণ করা দরকার। প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য প্রতিষ্ঠানে যে সকল সম্পত্তি প্রয়োজন তার বিবরণ তৈরি করা হয়। তবে অর্থের পরিমাণ এক ব্যবসা থেকে অন্য ব্যবসায় ভিন্ন হয়। কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা নির্ধারণের জন্য সাধারণত তিনটি বিষয়কে বিবেচনা করা হয়:

I. পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ অর্থ নগদে পরিশোধ করতে হবে;

II. প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য কি পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হবে; এবং

III. প্রতিষ্ঠানের অপ্রত্যাশিত খরচ মেটানোর জন্য কি পরিমাণ সঞ্চিতি রাখা হবে।

প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের পর এ অর্থসমূহ কোন কোন উৎস হতে সংগ্রহ করা যাবে তা চিহ্নিত করা উদ্যোক্তার অন্যতম কাজ। সাধারণত নিম্নলিখিত উৎসগুলো হতে অর্থের সংস্থান করতে পারে:

- মালিকের নিজস্ব মূলধন
- ঋণকৃত মূলধন
- ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণ
- বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়স্বজন হতে গৃহীত ঋণ।

প্রয়োজনীয় প্রারম্ভিক মূলধন (স্টার্ট আপ ক্যাপিটাল)

স্টার্টআপ ক্যাপিটাল শব্দটি একটি নতুন ব্যবসা করার জন্য প্রাথমিক খরচ মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থকে বোঝায়। তরুণ উদ্যোক্তা তার নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সবেমাত্র বিকাশের পর্যায়ে রয়েছে তাদের স্টার্টআপ বলা হয়। এই নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এক বা একাধিক ব্যক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যারা সাধারণত একটি পণ্য বা পরিষেবা বিকাশ করতে এবং এটি বাজারে আনতে চান। অর্থ সংগ্রহ করা একটি স্টার্টআপের প্রথম কাজগুলির মধ্যে একটি। এই অর্থায়নকে বেশিরভাগ লোকেরা স্টার্টআপ মূলধন হিসাবে উল্লেখ করে।

স্টার্টআপ মূলধন হল যা উদ্যোক্তারা একটি নতুন ব্যবসা তৈরিতে জড়িত যেকোন বা সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যয়ের জন্য পরিশোধ করতে ব্যবহার করেন। এর মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক বিনিয়োগের জন্য অর্থ, অফিসের স্থান, পারমিট, লাইসেন্স, ইনভেন্টরি, গবেষণা এবং বাজার পরীক্ষা, পণ্য উৎপাদন, বিপণন বা অন্য কোনো অপারেশনাল খরচ। অনেক ক্ষেত্রে, একটি নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য একাধিক বার স্টার্টআপ মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। স্টার্টআপ মূলধনের বেশিরভাগই তরুণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়ে থাকে

আপনার ব্যবসার শুরু করার আগে এতে কতটুকু প্রারম্ভিক মূলধন (স্টার্ট আপ ক্যাপিটাল) প্রয়োজন এবং আপনি এটি কোথায় পাবেন তা জানা আপনার জন্য অপরিহার্য। যেসব কারণে আপনার প্রারম্ভিক মূলধন প্রয়োজন:

- এককালীন বিনিয়োগ বা প্রাথমিক বিনিয়োগ
- চলমান বিনিয়োগ বা চলমান মূলধন

একটি এককালীন বিনিয়োগ বা প্রাথমিক বিনিয়োগ সাধারণত ব্যবসায়ের জন্য কোন ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থায়ী সম্পদকে বোঝায়

প্রারম্ভিক মূলধন (স্টার্ট আপ ক্যাপিটাল) এর উৎসঃ

বিবরণ	টাকা
প্রয়োজনীয় প্রারম্ভিক মূলধন	
প্রারম্ভিক মূলধন এর উৎস	
মালিকানা অংশ (ইকুইটি)	
অন্যান্য উৎস	
মোট (অবশ্যই প্রয়োজনীয় প্রারম্ভিক মূলধন এর সমপরিমাণ)	
ঋণের সদৃশ্য (যদি ঋণের প্রয়োজন হয়)	

প্রাথমিক বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ

যে সময়কালের জন্য: ---/---/----/ থেকে ---/---/---/ পর্যন্ত	
বিনিয়োগ	টাকা
ব্যবসার স্থান	
- নির্মাণ বা ক্রয় - পুনঃনির্মাণ	
সরঞ্জাম	
যন্ত্রপাতি	
আসবাবপত্র	
চলতি মূলধন	
কাঁচামাল এবং তৈরী পণ্য কিনতে বা মজুদ করতে	
প্রচারমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য	
বেতন প্রদান	
ভাড়া প্রদান	
লাইসেন্স	
পানি ও বিদ্যুৎ	
বীমার কিস্তি	
অন্যান্য খরচাপাতি	
মোট প্রাথমিক বিনিয়োগ	

ব্যবসা সম্প্রসারণ

ব্যবসা গুলো শুরু হয় ছোট আকারে। স্মল ইজ বিউটিফুল- ক্ষুদ্রই সুন্দর। কিন্তু সকল উদ্যোক্তাই স্বপ্ন দেখে বড় হওয়ার- আকাশ ছোঁয়ার। কেউ বাড়ে লম্বালম্বি আবার কেউ সমান্তরাল। অধিকাংশ ব্যবসায়ীর হাতে খড়ি বাণিজ্য বা ট্রেডিং দিয়ে। সেখানে সফল হলে উৎপাদনে আসে। আবার কেউ সেবা খাতে যায়। ব্যাপারটা যত সহজে বলছি- বাস্তবে মোটেও সহজ নয়। নতুন উদ্যোক্তার সামনে থাকে অনেক বাঁধা বিপত্তি। অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে তাকে এগোতে হয়। ব্যবসা বাড়ানো দূরে থাক- টিকে থাকাই অনেক ক্ষেত্রে দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। অনেকে বারেও যায়। অর্থ হারায়, উদ্দীপনা হারায়, পরিবারে লান্ধিত হয়।

উদ্যোগের জন্য স্থায়ী বিনিয়োগ/ব্যবসা প্রাঙ্গণের জন্য বিনিয়োগ

চলতি মূলধন: যেকোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য চলতি মূলধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং চলতি মূলধনকে ব্যবসায়ের প্রাণশক্তি বলা হয়। কেননা যতই মেশিনপত্র, দালান-কোঠা ও বিশাল বাজার থাকুক না কেন, চলতি মূলধনের কারণে ব্যবসার সকল কার্যক্রম থেমে যায়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিদিনের কাজসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে যে পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন তাই হলো চলতি মূলধন। কাঁচামাল কেনা, পণ্য উৎপাদন, শ্রমিকদের মজুরি বা বেতন, বিক্রয় খরচসহ অন্যান্য খরচের জন্যে চলতি মূলধন দরকার হয়।

বলেন তো আপনাদের প্রতিদিনে খরচ মেটানোর জন্য কী কী দরকার হয়? সেজন্য টাকা কোথা থেকে পাওয়া যায়?

প্রারম্ভিক মূলধন

আপনার ব্যবসা শুরু করার আগে এতে কতটুকু প্রারম্ভিক মূলধন প্রয়োজন এবং আপনি এটি কোথায় পাবেন তা জানা আপনার জন্য অপরিহার্য যেসব কারণে আপনার প্রারম্ভিক মূলধন প্রয়োজন

১. এককালীন বিনিয়োগ বা প্রাথমিক বিনিয়োগ

২. চলমান বিনিয়োগ বা চলমান মূলধন।

আপনার কি ধরনের প্রাথমিক বিনিয়োগ প্রয়োজন একটি এককালীন বিনিয়োগ বা প্রাথমিক বিনিয়োগ সাধারণত ব্যবসায়ের জন্য কোন ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘসময়ের জন্য স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করাকে বুঝায় প্রয়োজনীয় প্রাথমিক বিনিয়োগকে নিম্নলিখিত দুটি বিভাগের বিভক্ত করা যেতে পারে -

১. ব্যবসার প্রাঙ্গণ

২. সরঞ্জাম

ব্যবসা প্রাঙ্গণ ব্যবসা ধরনের উপর ব্যবসা প্রাঙ্গণের আকার এবং অবস্থান নির্ভর করে। নীচের কলামে টিক দিয়ে আপনার পছন্দের ব্যবসা প্রাঙ্গণের জন্য কোনটি গুরুত্বপূর্ণ অথবা গুরুত্বপূর্ণ নয় তা মূল্যায়ন করুন।

বিবরণ	গুরুত্বপূর্ণ	গুরুত্বপূর্ণ নয়
ব্যবসা প্রাঙ্গণের আকার		
ব্যবসা প্রসারিত করার সম্ভাবনা		
ব্যবসার জন্য নির্দিষ্ট বিন্যাস (আকৃতি)		

অধিবেশন -৪.৩: ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের উৎপাদন

দিন-৪, অধিবেশন ৪.৩

: সময়: ৯.৩০-১০.০০

ব্যাপ্তি: ৬০ মিনিট

সেশন শিরোনাম	: পরিচিতি পর্ব
সেশন লক্ষ্য	: এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও অর্থায়ন সম্পর্কে অবগত হবেন।
উদ্দেশ্য	: এ সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- উৎপাদনের উপাদান/উপকরণসমূহ সম্পর্কে ধারণা পাবে

		● নতুন পণ্য উন্নয়নের ধাপসমূহ সম্পর্কে ধারণা পাবে
উপকরণ	:	ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, অডিও/ভিডিও মিউজিক, পোস্টার পেপার/বোর্ড, মার্কার
পদ্ধতি	:	ভিপকার্ড, পোস্টার পেপার প্রদর্শন, গল্প বলা, প্রশ্নোত্তর, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা
পঠন উপকরণ	:	হ্যান্ডআউট
পূর্ব প্রস্তুতি	:	সহায়ক পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও বোর্ড প্রস্তুত করে রাখবেন।
মূল্যায়ন পদ্ধতি	:	প্রশ্নোত্তর

প্রক্রিয়া: সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাইবেন উৎপাদন বলতে তারা কি বুঝে? কয়জনের উদ্যোগের সাথে উৎপাদন কার্যক্রম সরাসরি জড়িত তা জানতে চাইবেন।

উৎপাদনের অর্থ

উৎপাদনের সমার্থক শব্দ হচ্ছে উদ্ভাবন বা সৃষ্টি। সাধারণভাবে কোন কিছু উদ্ভাবন বা সৃষ্টি করাকেই উৎপাদন বলে। প্রধানত দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ উদ্ভাবন বা সৃষ্টিমূলক কাজে সম্পৃক্ত হয়। প্রথমত ভোগ বা ব্যবহারের মাধ্যমে অভাব বা চাহিদা পূরণ করা। সে অর্থে মানুষের অভাব বা চাহিদা পূরণে সক্ষম এমন কোন কিছু সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে। দ্বিতীয়ত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ কোন কিছু সৃষ্টি করে থাকে। সার্বিক অর্থে উৎপাদন একটি রূপান্তর প্রক্রিয়া।

উৎপাদনের উপাদান/উপকরণসমূহ

কোন কিছু উৎপাদন করতে গেলে নির্দিষ্ট কিছু জিনিস ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করতে হয়। উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত ইনপুট কেই উৎপাদনের উপকরণ বলা হয়। একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইনপুট থেকে আউটপুট তৈরি হয়। এটাকেই উৎপাদন প্রক্রিয়া বলে। সাধারণভাবে উৎপাদনের চারটি উপকরণ রয়েছে। যথা ১) ভূমি, ২) শ্রম, ৩) মূলধন/পুঁজি, ৪) সংগঠন

১) ভূমি: ভূমি বলতে সকল প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদকে বোঝায়। ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, জলজ সম্পদ, আলো, বাতাস, পানি, তাপ, চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি সকল কিছুই ভূমির অন্তর্গত। জলে, স্থলে ও আকাশে বিরাজমান সকল প্রাকৃতিক সম্পদকে ভূমি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২) শ্রম: সাধারণভাবে শ্রম বলতে শ্রমিকের পরিশ্রম বা কর্ম প্রচেষ্টাকে বুঝায়। উৎপাদনকাজে নিয়োজিত মানুষের শারীরিক ও মানসিক প্রচেষ্টাকে শ্রম বলে। তবে কোন শ্রমই সম্পূর্ণ শারীরিক বা মানসিক হয় না। বরং প্রতিটি শ্রমই কিছুটা মানসিক ও কিছুটা শারীরিক। সাধারণভাবে মনে করা হয়, শীর্ষ ব্যবস্থাপনার কাজ মানসিক আর নিম্ন ব্যবস্থাপনার কাজ হচ্ছে শারীরিক। কিন্তু প্রকৃত বিচারে শীর্ষ ব্যবস্থাপনার কাজ প্রধানত মানসিক হলেও কিছু শারীরিক কাজ সম্পৃক্ত থাকে। অনুরূপভাবে নিম্ন ব্যবস্থাপনার কাজ প্রধানত শারীরিক হলেও কিছুটা মানসিক প্রচেষ্টা জড়িত থাকে। তবে যে শ্রম উপযোগিতা সৃষ্টি করে না শ্রম বলে বিবেচিত হবে না। যেমন, ব্যক্তিগত পর্যায়ে শরীর সুস্থ রাখতে ব্যায়াম করলে তা শ্রম হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। তবে ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিকভাবে জিমেনেসিয়াম বা ব্যায়ামাগার স্থাপন করলে এবং সেই ব্যবসা পরিচালনায় বা উন্নয়নে সময় দিলে তা শ্রম হিসেবে বিবেচিত হবে। শ্রমিক থেকে শ্রমকে পৃথক করা সম্ভব না। অপরদিকে শ্রমিকের দক্ষতা বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রধানত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, শারীরিক সুস্থতা ও কর্ম পরিবেশের উপর শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভর করে। একজন শ্রমিকের শ্রমের উপযোগিতার উপর তার পারিশ্রমিক নির্ভর করে।

৩) পুঁজি: মূলধন বা পুঁজি বলতে মানব সম্পদের সে অংশকে বঝানো হয়েছে যা সরাসরি ভোগ না করে পুনরায় সম্পদ সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়। সকল মূলধন জাতীয় পণ্যকে মূলধন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। উদাহরণ হচ্ছে, কারখানা, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, আনুষঙ্গিক উপকরণ, মজুদ কঁচামাল, প্রক্রিয়াধীন পণ্য, জ্বালানী ইত্যাদি মূলধনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব মূলধন উৎপাদনের আদি বা প্রাথমিক উপাদান নয় বরং এটি মানুষের সৃষ্টি। মূলধন দুই ধরনের হয়ে থাকে (ক) স্থায়ী মূলধন (খ) চলতি মূলধন

৪) সংগঠন: ব্যবস্থাপনায় সংগঠন বলতে উৎপাদনের উপকরণসমূহ একত্রিতকরণকে বুঝায়। অর্থাৎ উৎপাদনের অন্য তিনটি উপাদান আনুপাতিক হারে সংগ্রহকরণ, সমন্বিতকরণ ও ব্যবহারের প্রচেষ্টাই হচ্ছে সংগঠন। যে ব্যক্তি এই কাজ করে তাকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলে। সুষ্ঠু সংগঠনের লক্ষ্যে সংগঠক ভূমির মালিককে মূল্য বা ভাড়া প্রদান করেন, শ্রমের জন্য শ্রমিককে মজুরি প্রদান করেন এবং মূলধনের জন্য বিনিয়োগকারীকে সুদ বা মুনাফা প্রদান করেন। সর্বোপরি তিনি উৎপাদনের যাবতীয় ঝুঁকিও বহন করেন। এরপর যা উদ্ভূত থাকে সেটাই প্রতিষ্ঠানের মুনাফা। সুষ্ঠুভাবে উৎপাদন কার্য পরিচালনার মাধ্যমে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের

লক্ষ্যে সংগঠক বা উদ্যোক্তা যা কিছু করেন তার সমষ্টিই হচ্ছে সংগঠন। উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে সংগঠের কাজের আয়তনও বৃদ্ধি পায়।

উৎপাদন পরিকল্পনা

উৎপাদন বলতে উৎপাদনের উপকরণ-ভূমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠন ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করাকে বুঝায়। পক্ষান্তরে, পরিকল্পনা বলতে ভবিষ্যতে করণীয় সম্পর্কে অগ্রীম সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বুঝায়। অতএব, উৎপাদন পরিকল্পনা বলতে উৎপাদনের উপকরণসমূহ দক্ষতা ও মিতব্যয়িতার সাথে ব্যবহার এবং উৎপাদন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি সুচারুরূপে সম্পাদনের লক্ষ্যে গৃহীত অগ্রিম সিদ্ধান্তকে বুঝায়। এখানে উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যাবলি বলতে উৎপাদন পদ্ধতি ও কর্মসূচি নির্ধারণ, চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন, উৎপাদিত পণ্য মানসম্মতকরণ, নকশাকরণ, মোড়কীকরণ, গুদামজতকরণ ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে।

যে কোন কাজের সফলতা নির্ভর করে উক্ত কাজের পরিকল্পনার উপর। পরিকল্পনা মাফিক কাজ করলে কাজ যেমন সহজ ও দ্রুততার সাথে সম্পাদন করা সম্ভব হয় তেমনি ব্যয়ও কম ও কাজের মানও উন্নত হয়। তাই প্রতিটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানেরই উচিত পরিকল্পনা মাফিক উৎপাদন কার্য পরিচালনা করা। উৎপাদন পরিকল্পনা কতগুলো বিষয়ের মধ্যে একটি মৌলিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। বিষয়গুলো হচ্ছে-(১) বিক্রয় পূর্বানুমান, (২) উৎপাদন ক্ষমতা, (৩) মজুদের পরিমাণ, (৪) চলতি মূলধন, (৫) কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তা, (৬) উৎপাদন সুবাধাদি, (৭) পণ্য নকশা ও উৎপাদন কার্যক্রম, (৮) জনশক্তির প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি। উৎপাদন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে এসব উপাদানের মধ্যে উত্তম অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা।

উৎপাদন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ

উৎপাদন পরিকল্পনা উৎপাদন ব্যবস্থাপনার মূল ভিত্তি। কারণ, পরিকল্পনা ছাড়া কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, সামর্থ্য, কাজের ধরন, নির্বাহীদের মান, শ্রমিকের অবস্থা ইত্যাদির ভিত্তিতে পরিকল্পনা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। উৎপাদন পরিকল্পনার কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা নিম্নরূপ:

১. উদ্দেশ্যমুখিতা
২. সহজবোধ্যতা
৩. তথ্য নির্ভরশীলতা
৪. বাস্তবমুখিতা
৫. নিরবিচ্ছিন্নতা
৬. নমনীয়তা
৭. উপায়-উপকরণের পূর্ণ ব্যবহার

উৎপাদন পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়সমূহ

একটি কার্যকর উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ব্যবস্থাপক বা পরিকল্পনাবিদকে কতগুলো বিষয় বা উপাদান বিবেচনা করতে হয়। এসব উপাদানকে দুটি প্রধানভাগে ভাগ করা যায়। যথা: (ক) অভ্যন্তরীণ বিবেচ্য বিষয়, (খ) বাহ্যিক বিবেচ্য বিষয়

ক. অভ্যন্তরীণ বিবেচ্য বিষয়

১. মূলধনের প্রাপ্তব্যতা
২. মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা
৩. মেশিন চালনা পদ্ধতি
৪. কার্যক্রম বিবেচনা
৫. কার্য সময়
৬. দ্রব্যের মান
৭. কর্মদক্ষতা

৮. মজুদ পণ্যের পরিমাণ

খ. বাহ্যিক বিবেচ্য বিষয় বা উপাদান:

১. বাজার চাহিদা

২. উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত মালামাল

৩. মালামালের প্রাপ্তব্যতী

৪. শ্রমিক সরবরাহ

৫. প্রতিযোগীদের অবস্থান

৬. আধুনিক প্রযুক্তি

৭. রাজনৈতিক অবস্থা

৮. আইনগত অবস্থা

উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ

প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নির্ভর করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্রেতা সন্তুষ্টির সামর্থ্য বা ক্ষমতার উপর। এই ক্রেতা সন্তুষ্টি নিশ্চিত করতে হলে যথাসময়ে মানসম্মত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। সে লক্ষ্যে প্রতিটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উচিত একটি উত্তম উৎপাদন পরিকল্পনার উন্নয়ন এবং তার যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অর্থাৎ সুশৃঙ্খল ও নিয়মিত উৎপাদন প্রবাহ অর্জনের জন্য যেমন উৎপাদন পরিকল্পনার প্রয়োজন তেমনি উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন।

সাধারণভাবে উৎপাদন পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে ও মানে নির্ধারিত পরিমাণ পণ্য উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে ব্যবস্থা গৃহীত হয় তাকেই উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ বলে। অর্থাৎ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ উৎপাদন পরিকল্পনার উপর নির্ভরশীল। অন্যভাবে বললে পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদন হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্ধারণপূর্বক উপযুক্ত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার কাজই হচ্ছে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ।

উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ বলতে সবচেয়ে উত্তম এবং সস্তা পদ্ধতি প্রয়োগ করে যথাসময়ে কাম্য মানের পর্যাপ্ত পরিমাণে পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে সর্বাধিক উৎপাদন দক্ষতা অর্জন করাকে বুঝায়।

উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যাবলি

উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভোক্তা সন্তুষ্টি বিধান করা। নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের এই উদ্দেশ্য অর্জিত হয়:

১. পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন

২. যথাসময়ে পণ্য সরবরাহ

৩. পণ্যমান বজায় রাখা

৪. মিতব্যয়িতা অর্জন

৫. উৎপাদনের গতিশীলতা বজায় রাখা

৬. উৎপাদনে নমনীয়তা অর্জন

৭. উপকরণসমূহের উত্তম ব্যবহার
৮. সমন্বিত কর্মসূচি
৯. উৎপাদন উপকরণের মজুত সংরক্ষণ
১০. কর্মীদের সন্তুষ্টি বিধান
১১. কারখানার ক্ষমতা পরিকল্পনা
১২. উত্তম পদ্ধতির ব্যবহার
১৩. মজুদমাল সংরক্ষণ
১৪. উৎপাদন ও বিক্রয় পরিকল্পনা

উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের বিবেচ্য বিষয়।উপাদানসমূহ

যে কোন একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজকে ফলপ্রসূ বা কার্যকর করার লক্ষ্যে কতগুলো বিষয় বা উপাদান বিবেচনা করা আবশ্যিক।

১. পেশকৃত ফরমায়েশের পরিকল্পনা
২. কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ
৩. উপকরণ নিয়ন্ত্রণ (controlling inputs)
৪. শ্রমিকের দক্ষতা নিয়ন্ত্রণ
৫. পণ্যের পরিমাণ ও মান নিয়ন্ত্রণ
৬. সময় নিয়ন্ত্রণ
৭. উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ
৮. প্রতিষ্ঠানের সুনাম
৯. প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য
১০. ফরমায়েশের অগ্রগতি নিয়ন্ত্রণ

পণ্য বা দ্রব্যের সংজ্ঞা

সাধারণত পণ্য বলতে বিক্রয়যোগ্য সামগ্রিকে বুঝায়। এখানে বিক্রয়যোগ্য সামগ্রী বলতে বস্তুগত বা অবস্তুগত যে কোন সামগ্রীকে বুঝানো হয়েছে যা মানুষের অভাব বা চাহিদা পূরণে সক্ষম। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পণ্যকে বিভিন্নভাবে আখ্যায়িত করা যায়। যেমন-(১) উৎপাদকের দৃষ্টিকোণ থেকে, ভোগের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত বস্তুকেই পণ্য বল। (২) অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, যা দ্বারা মানুষের অভাব বা চাহিদা পূরণ করা যায় তাই পণ্য। (৩) বিপণনের দৃষ্টিকোণ থেকে, পণ্য হলো এমন এক ধরনের উদ্দীপক যা ভোক্তার মনের সুপ্ত বাসনা ও প্রয়োজনবোধকে জাগ্রত করে এবং ভোক্তার সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে বিপণনকারীকে মুনাফা অর্জনে সহায়তা করে।

পণ্য উন্নয়ন/নতুন পণ্য উন্নয়ন

উৎপাদক ও বিপণনকারীর উদ্দেশ্যই হচ্ছে ক্রেতা সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা। কিন্তু ক্রেতার আয়, রুচি, পছন্দ, প্রত্যাশা, সন্তুষ্টি, চাহিদা, অভ্যাস, জীবনযাত্রার ধরন ইত্যাদি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীল চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে উৎপাদক যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাকেই বলে পণ্য উন্নয়ন বা নতুন পণ্য উন্নয়ন।

সাধারণত উৎপাদকগণ দুভাবে এই পণ্য উন্নয়ন করে থাকে। যথা: (১) বাজারে বিদ্যমান পণ্যের বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ, মডেল, ডিজাইন, আকার, রঙ ইত্যাদির গ্রহণযোগ্য পরিবর্তনের মাধ্যমে; (২) ব্যাপক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে নতুন পণ্য উদ্ভাবনের মাধ্যমে। এখানে উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে মোট উৎপাদিত পণ্যের ১০% ভাগেরও কম পণ্য প্রকৃত অর্থে নতুন। গবেষণায় দেখা গেছে নতুন ভোগ্য পণ্যের ব্যৱরখতার হার ৮০ শতাংশ।

Kotler ও Armstrong-এর মতে পণ্য উন্নয়ন বলতে কোন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব গবেষণা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে মৌলিক পণ্যের উন্নয়ন, পণ্যের উৎকর্ষ সাধন, পণ্যের পরিবর্তন এবং নতুন ব্রান্ড উন্নয়ন বুঝায়।

পণ্য উন্নয়ন বা নতুন পণ্য উন্নয়নের পদক্ষেপসমূহ

নতুন পণ্য উন্নয়ন বেশ জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। একটি নতুন পণ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রচুর সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে ব্যাপক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হয়। অনেক অর্থ ও সময় বিনিয়োগের পরও অনেক ক্ষেত্রে পণ্য উন্নয়ন সফল হয় না বা হলেও ক্রেতা কতৃক তা গৃহীত নাও হতে পারে। এজন্যই নতুন পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদক বা উদ্যোক্তাকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হয়। ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে পণ্য উৎপাদিত হলে একে পণ্য উন্নয়ন প্রক্রিয়া বলে। সাধারণত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো পণ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত আটটি (০৮) পদক্ষেপ অনুসরণ করে থাকে:

১. ধারণা সৃষ্টি (Idea generation)
২. ধারণা বাছাই (Screening Ideas)
৩. ধারণার উন্নয়ন ও পরীক্ষা (Development and testing idea)
৪. বিপণন কৌশল উন্নয়ন (Development of marketing strategy)
৫. ব্যবসায়িক বিশ্লেষণ (Business Analysis)
৬. পণ্য উন্নয়ন (Product Development)
৭. পরীক্ষামূলক বিপণন (Test marketing)
৮. বাণিজ্যিকীকরণ (Commercialization)

পণ্যের জীবন-চক্র

একটি নতুন পণ্য উন্নয়ন ও বাণিজ্যিকীকরণের পর উৎপাদক বা ব্যবস্থাপক পণ্যটির দীর্ঘ জীবন কামনা করেন। কিন্তু কোন পণ্যই অনন্তকাল বাজারে টিকে থাকতে পারে না। মানুষ যেমন জন্মের পর স্বাভাবিক নিয়মে বড় হয় এবং একসময় পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। ঠিক তেমনি একটি পণ্য বাজারে আসার পর পরিচিতি, প্রবৃদ্ধি ও পূর্ণতা লাভ করে পতনের মাধ্যমে বাজার থেকে বিদায় নেয়। কোন বাণিজ্যিক পণ্যের এরূপ স্তর বা ধাপ অতিক্রম প্রক্রিয়াকে পণ্যের জীবন-চক্র বলে।

পণ্যের জীবন চক্রের বিভিন্ন স্তরসমূহ

একটি নতুন পণ্য উদ্ভাবনের পর উদ্ভাবক প্রত্যাশা করে ব্যাপক বিক্রয়ের মাধ্যমে উক্ত পণ্যের পিছনে ব্যয়িত অর্থ ও শ্রমের প্রতিদানস্বরূপ সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের। সে জন্য পণ্যটি জীবন চক্রের কোন স্তরে অবস্থান করছে তা চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী বিপণন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এরপর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উদ্ভাবিত পণ্যের দুর্বল দিকগুলো নির্ধারণ পূর্বক বিপণন কৌশলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনেন। একটি পণ্যের জীবন চক্রে মোট ছয়টি স্তর পরিলক্ষিত হয়। যথা:

১. পণ্য উন্নয়ন
২. সূচনা

৩. প্রবৃদ্ধি

৪. পরিপক্বতা

৫. পূর্ণতা

৬. পতন

উৎপাদন পূর্বাভাস, পরিকল্পনা এবং নিয়ন্ত্রণ (Production Forecasting, Planning And Control)

উৎপাদনের পূর্বাভাস হল খুচরা পণ্যগুলির ভবিষ্যতের চাহিদা অনুমান করার প্রক্রিয়া, সেইসাথে সেই পণ্যগুলি তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ।

সাধারণত, এই সম্পদগুলির মধ্যে রয়েছে কায়িক শ্রম, অর্থ, যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল।

উৎপাদনের পূর্বাভাস পণ্য-ভিত্তিক ব্যবসায় সর্বোত্তম ইনভেন্টরি বজায় রাখতে সহায়তা করে। এইভাবে, তারা গ্রাহকদের খুশি রাখতে এবং তাদের সামগ্রিক লাভকে বাড়িয়ে তুলতে পারে।

এটি কিভাবে হয়? সঠিকভাবে সম্পন্ন হলে, উৎপাদনের পূর্বাভাস আপনাকে ভবিষ্যতের চাহিদার আরও সঠিক অনুমান করতে সাহায্য করে। এইভাবে, কম বা ওভারস্টকিং এড়িয়ে আপনার চাহিদা মেটাতে যা প্রয়োজন তার জন্য আপনি ক্রয় আদেশ (POs) প্রদান করতে পারেন।

সঠিক পূর্বাভাসের ফলাফল হতে পারে:

- সাপ্লাই চেইনের প্রতিটি পর্যায়ে দক্ষতা উন্নত করুন
- স্টকআউট পরিস্থিতি এবং পরবর্তীতে বিক্রয় হারিয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করুন
- সর্বোত্তম অর্ডার পরিমাণ অর্জনের মাধ্যমে আপনার কোম্পানির অর্থ সাশ্রয় করে

একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ, উর্ধ্বমুখী গতিপথে নগদ প্রবাহ রাখুন এই সুবিধাগুলির প্রতিটি আপনার কোম্পানির সাফল্যে ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সব থেকে বড় সুবিধা কি? উৎপাদনের পূর্বাভাস আপনার ই-কমার্স সাপ্লাই চেইন জুড়ে অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে আপনার ব্র্যান্ডকে আরও বেশি স্থিতিস্থাপক করে তোলে।

উৎপাদনের পূর্বাভাসের প্রকারভেদঃ

১. গুণগত পূর্বাভাস

গুণগত পূর্বাভাস ব্যবহার করা হয় যখন ঐতিহাসিক তথ্য দুস্প্রাপ্য বা অস্তিত্বহীন - উদাহরণস্বরূপ, একটি নতুন ব্র্যান্ড বা পণ্য লঞ্চ করার সময়।

এই তথ্য ছাড়া, উৎপাদন পরিচালকদের তাদের সেবা চিন্তাভাবনা ব্যবহার করতে হবে। বিকল্পভাবে, তারা সমীক্ষা, পোল এবং অন্যান্য অনুরূপ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত তাদের গ্রাহকদের এবং অভ্যন্তরীণ বিক্রয় দল থেকে গুণগত তথ্যের উপর নির্ভর করতে পারে।

আপনার গ্রাহকদের জরিপ করে, আপনি এমন অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে পারেন যা শুধুমাত্র বিক্রয় তথ্য থেকে সংগ্রহযোগ্য নয়, যেমন অন্তর্দৃষ্টি যা আপনার ব্র্যান্ডের প্রতি সন্তুষ্টি মূল্যায়ন করে বা একটি নতুন পণ্য বাজারে নিয়ে আসতে ক্রেতার আগ্রহের পরিমাপ করে।

আপনার সেলস্ টিম জরিপ করে আপনাকে একটি নতুন পণ্য কতটা ভাল বিক্রি হবে তা অনুমান করতেও সাহায্য করতে পারে। এইভাবে, আপনি আপনার বিভিন্নধর্মী চাহিদা মেটাতে উৎপাদন পূর্বাভাস তৈরি করতে পারেন।

একবার আপনি গুণগত তথ্য সংগ্রহ করলে, আপনি এটিকে আপনার তৈরি পণ্য এবং কাঁচামালের পরিমাণগত অনুমানে পরিণত করতে পারেন। এটি গুণগত পূর্বাভাসকে তুলনামূলকভাবে সঠিক করে তোলে, যদিও এটি প্রাথমিকভাবে বিষয়ভিত্তিক মতামত এবং রায়ের উপর ভিত্তি করে ছিল।

খুচরা বিক্রেতারা গুণগত পূর্বাভাসের সরঞ্জামগুলি প্রয়োগ করতে পারে যখন তাদের কাছে ঝুঁকে পড়ার মতো কোনও ঐতিহাসিক তথ্য থাকে না। এই পূর্বাভাস মডেলটি প্রায়শই সেই ব্র্যান্ডগুলি দ্বারা ব্যবহৃত হয় যা শুরু হচ্ছে বা যারা একটি নতুন পণ্য বা পণ্য লাইন চালু করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

২. কার্যকারণ মডেলিং

কার্যকারণ মডেলিং হল যখন ব্র্যান্ডগুলি খুচরা বাজারের মধ্যে ভবিষ্যতের ঘটনাগুলির পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা করে।

এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ভেরিয়েবল বিবেচনা করে যা প্রায়শই পণ্যের গতিবিধি এবং বাজারের প্রবণতাকে প্রভাবিত করে, যেমন ইনভেন্টরি প্রাপ্যতা এবং ভোক্তাদের পছন্দগুলি।

কার্যকারণ মডেলিংয়ের পিছনে ধারণাটি হল সেই ভেরিয়েবলগুলির প্রকৃত চাহিদা এবং অর্ডারগুলি পূরণ করার আপনার ক্ষমতার উপর কী প্রভাব পড়বে তা নির্ধারণ করা।

উদাহরণস্বরূপ, ইনভেন্টরি প্রাপ্যতার অভাব কি খুচরা পরিপূর্ণতা বিলম্বের দিকে পরিচালিত করবে? নাকি একটি নির্দিষ্ট পণ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হবে, যার ফলে চাহিদা বাড়বে?

সাধারণভাবে বলতে গেলে, কার্যকারণ মডেলিং শুরু হয় বাজারের মূল্যায়নের সাথে যেটি বর্তমানে অবস্থান করছে, আপনার প্রতিযোগীদের তুলনায় আপনার কোম্পানির অবস্থান কোথায় তা সহ।

সেখান থেকে, আপনাকে এমন সমস্ত ভেরিয়েবল সনাক্ত করতে হবে যা বাজারের গতিপথকে প্রভাবিত করতে পারে। আবার, এর মধ্যে বিষয়গুলো রয়েছে:

- ক্রেতার আচরণ এবং পছন্দ
- আপনার সাপ্লাই চেইনের প্রবাহ
- পণ্য এবং উপকরণ সহজলভ্য কিনা

বৃহত্তর বাজারের সাথে কী ঘটবে সে সম্পর্কে আপনার ভাল ধারণা হয়ে গেলে, আপনি সেই ভেরিয়েবলগুলিকে আপনার পূর্বাভাসের অনুমানগুলিতে প্রয়োগ করতে পারেন।

৩. টাইম সিরিজ বিশ্লেষণ

টাইম সিরিজ বিশ্লেষণ হল একটি কৌশল যা টাইম-স্ট্যাম্পড তথ্যের উপর ভিত্তি করে পূর্বাভাস তৈরি করে। আরও নির্দিষ্টভাবে, একজন বণিক এলোমেলোভাবে রেকর্ড করার পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধারাবাহিক বিরতিতে এই ডেটা সংগ্রহ করে।

তারপর আপনার টিম এই ডেটা বিশ্লেষণ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, যা বিভিন্ন ইনভেন্টরি ফলাফলের পিছনে "কেন" এর উপর আলোকপাত করতে পারে, যেমন কেন ব্যবসার বিক্রয় মালভূমি তে হয়েছিল।

টাইম সিরিজ বিশ্লেষণ এছাড়াও প্রকাশ করতে পারে কিভাবে ভেরিয়েবলগুলি সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় — উদাহরণস্বরূপ, কিভাবে আপনার পরিবর্তনশীল তথ্য কয়েক সপ্তাহ, মাস, কোয়ার্টার বা এমনকি এক বছরের মূল্যের বিক্রয়ের উপর ওঠানামা করে।

যাইহোক, একটি টাইম সিরিজ বিশ্লেষণের জন্য তথ্যের একটি বড় পরিসরের প্রয়োজন।

খুব কম তথ্য আপনার বিশ্লেষণে দুর্বলতা তৈরি করতে পারে, যা ভুল বা অবিশ্বাস্য ইনভেন্টরি পূর্বাভাসের কারণ হতে পারে। অন্যদিকে, একটি বিস্তৃত তথ্য সেট আপনাকে বিক্রির প্রবণতা এবং চাহিদার ঋতু পরিবর্তনের মতো আগাছা আউটলায়ারগুলিকে উন্মোচন করার ক্ষমতা দেবে। খুচরা বিক্রেতারা টাইম সিরিজ বিশ্লেষণের সুবিধা নিতে পারে যখন তাদের কাছে প্রচুর অস্থির ডেটা থাকে, যেমন পরিবর্তনশীল কেনাকাটা প্যাটার্ন। নির্দিষ্ট ইনভেন্টরি অ্যাসেস্ট বা ডেটা পয়েন্ট কীভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিবর্তন এবং পরিবর্তন হয় তা দেখতে এই পদ্ধতিটি কার্যকর হতে পারে।

চাহিদা পূর্বানুমান হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অতীতের ডাটা এবং অন্যান্য তথ্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভবিষ্যতে

কাস্টমারের চাহিদার ব্যাপারে অনুমান করা যায়। আর যেসব উপকরণ চাহিদা পূর্বানুমানে প্রভাব বিস্তার করে সেগুলো নিম্নরূপ:

১. আলোচ্য দ্রব্যের দাম
২. উদ্দিষ্ট ভোক্তা বা ক্রেতার আয়
৩. উদ্দিষ্ট ভোক্তার রুচি বা পছন্দ
৪. সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম
৫. ভবিষ্যত দাম সম্পর্কে ভোক্তার প্রত্যাশা
৬. বিজ্ঞাপন
৭. অন্যান্য প্রাসঙ্গিক উপকরণ।

নিম্নে এসব নির্ধারকসমূহ আলোচনা করা হলো:

আলোচ্য দ্রব্যের দাম: ভোক্তা বা ক্রেতা কোন দ্রব্য কতটুকু কিনবে তা নির্ভর করে দ্রব্যের দামের উপর। অন্যান্য সবকিছু অপরিবর্তিত থাকলে

দ্রব্যের দাম কম থাকলে দ্রব্য বেশী পরিমাণে কিনে এবং দ্রব্যের দাম বেশী থাকলে দ্রব্য কম পরিমাণে কিনে।

ভোক্তা বা ক্রেতার আয়: চাহিদার একটি অন্যতম নির্ধারক হচ্ছে ভোক্তার আয়। যদি কেউ গ্রীষ্মকালে চাকুরী হারায়, তাহলে সে সময় তার আইসক্রীম এর চাহিদা ক্রিয়াকারী হতে পারে বলে আপনি মনে করেন। অবশ্যই চাহিদা হ্রাস পাবে। নিম্ন আয় মানেই ব্যয়ের পরিমাণ কমে যাবে এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তা দ্রব্য বা সেবার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যদি আয় কমার সাথে সাথে কোন দ্রব্যের চাহিদা কমে যায় তবে দ্রব্যটি স্বাভাবিক দ্রব্য। তবে সব দ্রব্যই স্বাভাবিক দ্রব্য নয়। যদি আয় কমার সাথে সাথে দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে তবে দ্রব্যটি নিকৃষ্ট দ্রব্য। সাদা-কালো টিভিকে নিকৃষ্ট দ্রব্যের উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে। যদি ভোক্তার আয় কমে যায় তাহলে সে রঙীন টিভির পরিবর্তে সাদা কালো টিভি ক্রয় করবে।

ভোক্তার রুচি বা পছন্দ: ভোক্তার রুচি, পছন্দ, অভ্যাস ইত্যাদির উপরও দ্রব্যের চাহিদা নির্ভর করে। ভোক্তার রুচি ও পছন্দের পরিবর্তন ঘটলে চাহিদারও পরিবর্তন হয়। কেউ হয়তো আইসক্রীম খেতে পছন্দ করে। আবার কেউ সফট ড্রিংকস (পেপসি, সেভেন-আপ, কোকা-কোলা) পছন্দ করে। তাদের পছন্দের পরিবর্তন ঘটলে চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে।

সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম: কোন দ্রব্যের চাহিদা শুধু সেই দ্রব্যের দামের উপর নির্ভর করে না, সম্পর্কিত দ্রব্যের দামের উপরও নির্ভর করে। সম্পর্কিত দ্রব্য বলতে আমরা দ্রব্য ও পরিপূরক দ্রব্য বুঝি। যদি চটপটির দাম বেড়ে যায় তাহলে চটপটির ভোগ বাদ দিয়ে ফুচকার ভোগ বেড়ে যাবে। কারণ, চটপটি ও ফুচকা দুটি প্রায় একই ধরনের উপকরণ দিয়ে তৈরী, প্রায় একই সুগন্ধ ও স্বাদের হয়ে থাকে। যখন কোন একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির কারণে অন্য দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় তখন দ্রব্য দুটিকে পরিবর্তক দ্রব্য বলা হয়। এখন ধরি, গ্যাসের দাম যদি বেড়ে যায় তাহলে গ্যাস কম ব্যবহৃত হবে। সাথে সাথে গাড়ীর চাহিদাও কমে যাবে। যখন কোন দ্রব্যের দাম বাড়ার ফলে অন্য দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায় তখন দ্রব্য দুটিকে পরিপূরক দ্রব্য বলা হয়।

ভবিষ্যত দাম সম্পর্কে ভোক্তার প্রত্যাশা: ভোক্তার কোন দ্রব্য বা সেবার ভবিষ্যত দাম সম্পর্কে প্রত্যাশা অনেক সময় ঐ দ্রব্য বা সেবার চাহিদার উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি মনে করেন আগামী মাসে আপনার আয় বাড়বে, তাহলে আপনার পছন্দের কোন দ্রব্য (ধরি, আইসক্রীম) কেনার জন্য আপনার বর্তমান সঞ্চয় থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করবেন। আবার, আপনি যদি আশা করেন আগামী দিনে আইসক্রীমের দাম কমবে তাহলে বর্তমান দামে আইসক্রীম কেনার আগ্রহ কম থাকবে।

বিজ্ঞাপন: আধুনিক কালে বিজ্ঞাপন চাহিদার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। বর্তমানে প্রচার মাধ্যমের প্রসারের সাথে সাথে বিজ্ঞাপনের প্রভাবও বাড়ছে। প্রয়োজন না থাকলেও বিজ্ঞাপন দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে আমরা অনেক দ্রব্য ক্রয় করে থাকি।

অন্যান্য উপকরণ: এর মধ্যে রয়েছে বিশেষ ঘটনা, বিশেষ উপলক্ষ, ধর্মীয় বা রাষ্ট্রীয় উৎসব, বিশেষ সময় ইত্যাদি। যেমন- বর্ষা ঋতুতে ছাতার চাহিদা বেড়ে যায়। আবার শীতে গরম কাপড় ও গরমে এয়ারকন্ডিশনের চাহিদা বাড়ে। আমাদের দেশে ঈদের সময় পোশাক ক্রয়ের পরিমাণ বেড়ে যায়। রোজার সময় বিশেষ ধরনের খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যায়।

উপকরণ ব্যবস্থাপনা (Materials Management)/সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট

একটি প্রোডাক্ট বা সার্ভিস নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় কয়েকটি ধাপ পার করে কাস্টমারের কাছে পৌঁছায়। এ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট ব্যবহার করা হয়। আপনি প্রোডাক্ট বা সার্ভিস নিয়ে কাজ করতে গেলে এ ব্যাপারে ধারণা থাকা প্রয়োজন। কোনও প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল কেনা থেকে শুরু করে পরিকল্পনা, পণ্যের উৎস, মজুদকরণ, প্রস্তুত ও বিপণন কার্যক্রম দক্ষতা দিয়ে সময়মতো ও কম খরচে সম্পন্ন করাই হলো সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা (Supply Chain Management), একজন সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাপককে পুরো প্রক্রিয়াটি প্রতিষ্ঠানের সব শাখার জনবলের সঙ্গে যোগাযোগ বা সমন্বয় রেখে করতে হয়।

ব্যবসা এবং অর্থসংস্থানে, সরবরাহ প্রবাহ ব্যবস্থাপনা (Supply Chain Management) থেকে গ্রাহকের কাছে পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহের সাথে জড়িত সংস্থাগুলি, লোকজন, ক্রিয়াকলাপ, তথ্য এবং সংস্থানগুলির একটি পদ্ধতি। তবে সময়মতো ও কম খরচে পণ্য সরবরাহ করাই হলো সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট বা সরবরাহ প্রবাহ ব্যবস্থাপনা। সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের পারিভাষিক অর্থ হল- একটি পণ্যের প্রাথমিক উৎস থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের নিকট সেটিকে পৌঁছে দেয়াই হলো সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট। সরবরাহ শৃঙ্খলার ক্রিয়াকলাপগুলি প্রাকৃতিক সম্পদ, কাঁচামাল এবং একটি সম্পূর্ণ পণ্য হিসাবে রূপান্তর করে যা শেষে গ্রাহকের কাছে সরবরাহ করা হয় তবে আধুনিক কালে পণ্য শুধু সরবরাহ করলেই হবেনা। পণ্যের মান এবং প্রতিশ্রুতি সময় রক্ষা করা পণ্য সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

এমনকি বিক্রয় পরবর্তী সেবাও সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের অন্তর্ভুক্ত। সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে সাপ্লাই চেইনের সার্বিক তত্ত্বাবধান। অর্থাৎ একটি প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের উৎপাদন থেকে শুরু করে তা কাস্টমারের কাছে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেয়া। প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ও কাস্টমারদের আস্থা নিশ্চিত করার জন্য সাপ্লাই চেইনের সঠিক ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা জরুরি। এর মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান কয়েক ধরনের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে। নিম্নে এর গুরুত্ব আলোচনা করা হলো-

- গ্রাহক সবসময় সঠিক পরিমাণে সঠিক প্রোডাক্ট বা সার্ভিস চায়। অর্ডার করা প্রোডাক্টের সাথে ডেলিভারি করা প্রোডাক্টের বৈসাদৃশ্য থাকলে অথবা ডেলিভারিতে দেরি হলে সে প্রতিষ্ঠানের উপর গ্রাহক তার আস্থা হারাতে পারে।
- কোন প্রোডাক্ট বা সার্ভিস বিক্রি হবার পর গ্রাহক কোন সমস্যায় পড়লে যদি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পর্যাপ্ত সহযোগিতা পাওয়া না যায়, তাহলে গ্রাহকের অসন্তুষ্টি তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজন হয়।
- উৎপাদন কাজে দেরি হলে কোন প্রতিষ্ঠানের বিশাল ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। নির্ধারিত সময় ও খরচের মধ্যে যেন প্রোডাক্ট বা সার্ভিস উৎপাদিত হয়, তা নিশ্চিত করে সঠিক ব্যবস্থাপনা। এছাড়া, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজাররা প্ল্যান্ট, গুদামঘর ও পরিবহনে প্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবহার কমাতে সক্ষম। এতে উৎপাদনের খরচ হ্রাস পায়।
- প্রস্তুতকারকের কাছে কাঁচামাল আসা ও উৎপাদিত প্রোডাক্ট বা সার্ভিস কাস্টমারের কাছে সরবরাহের খরচ যথাসম্ভব কম রাখার জন্য ভালো পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা দরকার।
- মূল্যবান প্রোডাক্ট বা সার্ভিস মজুদ করে রাখা খুচরা বিক্রেতাদের জন্য আর্থিক চ্যালেঞ্জের বিষয়। এ খরচ কমাতে সাহায্য করে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট।

সরবরাহ প্রবাহ কৌশল

- পণ্য ও সেবার লাইফ সাইকেল অনুযায়ী কখন কোন কাজ করতে হবে তা নথিভুক্ত করা।
- যেকোন কাজ শুরুর আগে প্রস্তুতি সময় রাখা
- কাজ শেষ করার নির্ধারিত সময় নির্ধারণ করা।
- যেকোন পরিবর্তন মানিয়ে নেবার জন্য ব্যাক-আপ প্ল্যান রাখা।
- পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন করতে ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে পরিকল্পনার সকল অংশ বিস্তারিত বোঝানো।
- সিজনাল ইম্প্যাক্ট সম্পর্কে ধারণা রাখা।

সহায়কের জন্য:

উৎপাদন পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়

উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ কি? উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব ও উপাদানসমূহ

যে পরিমাণ উৎপাদন করা হলে পণ্য নষ্ট হবে না আবার পণ্যের অভাব দেখা দিবে না তাকে ঐ পণ্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ বলে।

উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ এ অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো নিম্নরূপ

১. উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ এ কাঁচামালকে চূড়ান্ত পণ্যে পরিণত করা
২. নূন্যতম ব্যয়ে পণ্য উৎপাদন করা হয়
৩. পণ্যের গুণগতমান উন্নত করা যায়

উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বসমূহ:

পরিকল্পনার দ্রুত বাস্তবায়ন করা যায়, কাজের পার্থক্য দূর করে, শৃঙ্খলা বিধান নিশ্চিত করে, সময়স্বয় সাধন করে, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে, জবাবদিহিতা সৃষ্টি করে, , প্রলোভন দূরীকরণ করা যায়, অপচয় হ্রাস করা যায়, দ্রুত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, কর্মভার কমে যায়, দ্বৈত-অধীনতা পরিহার করা যায়।

উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের উপাদানসমূহ

উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় এমন সবকিছুই উৎপাদনের উপাদান হিসেবে বিবেচিত। উৎপাদন বলতে কোনো কিছু সৃষ্টি করাকে বুঝায়। হয়। উৎপাদন করতে হলে কতকগুলো উপকরণ বা উপাদান ব্যবহার করতে হয়। যেমন- ফসল উৎপাদিত করতে হলে কেবল ভূমি হলে চলবে না, সেখানে কৃষকের শ্রম, মূলধন ও সংগঠন লাগবে। আবার কারখানার উৎপাদন করতে হলে শুধু মেশিন (মূলধন) থাকলে চলবে না, সেখানে ভূমি, শ্রম ও সংগঠনের প্রয়োজন পড়বে। অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ হতে উৎপাদনের চারটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো- ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন

পণ্য উন্নয়ন/নতুন পণ্য উন্নয়ন

পণ্য বলতে আমরা সাধারণত দ্রব্যসামগ্রীকে বুঝে থাকি। কিন্তু বিপণনের ভাষায় পণ্য শব্দের সংজ্ঞা আরো ব্যাপক। বিপণনের দৃষ্টিকোণ থেকে পণ্য বলতে এমন সব বস্তু বা সেবাকে বুঝায় যা মানুষের চাহিদা মেটাতে পারে।

পণ্য উন্নয়ন পণ্য জীবনচক্রের প্রথম ধাপ। এটি পণ্য, বাজার বিশ্লেষণ এবং একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পর্কে ধারণাকে বিপণনযোগ্য পণ্যে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া। যা পণ্য বিকাশ প্রক্রিয়ায় মূল্য নির্ধারণ কৌশল, অবস্থান এবং বিপণন ও বিতরণ দিকগুলি বিবেচনা করতে সাহায্য করে।

পণ্য উন্নয়নের পদক্ষেপসমূহ/স্তরসমূহ

পণ্য উন্নয়নের প্রক্রিয়ার ধাপ সমূহ

- নতুন পণ্য সংক্রান্ত ধারণা সৃষ্টি
- ধারণাসমূহের বাছাই
- ব্যবসায়িক বিশ্লেষণ
- পণ্য উন্নয়ন
- বাণিজ্যিকীকরণ
- পরীক্ষামূলক বিবরণ

পণ্যের জীবনচক্র

পণ্য বাজারে ছাড়ার পর কোম্পানী স্বভাবতই আশা করে যে, পণ্যটির বিক্রির পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়বে এবং বহুদিন যাবত এটি বাজারে টিকে থাকবে। তবে প্রত্যেক কারবারী প্রতিষ্ঠান একথা অবশ্যই স্বীকার করতে বাধ্য যে, কোন পণ্যই চিরকাল একইভাবে বাজার দখল করে রাখতে পারে না, বিভিন্ন কারণে পণ্যের জীবনে উত্থান পতন ঘটে থাকে, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সজাগ থাকেন যে, প্রত্যেক পণ্যেরই একটি জীবন চক্র রয়েছে। একটি পণ্যের জীবদ্দশায় তাকে যে সব পর্যায় বা ধাপ অতিক্রম করতে হয় সেই পর্যায়গুলোকে পণ্যের জীবন চক্র বলে। উদ্ভিদ এবং প্রাণীর ক্ষেত্রে আমরা যেমন জন্ম, বৃদ্ধি এবং শেষ পরিনতি দেখতে পাই ঠিক তেমনি পণ্যকে উৎপাদনের পর থেকে আরম্ভ করে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যে সব পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে যেতে হয় তাকে বলা হয় পণ্যের জীবন চক্র।

পণ্যের জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরসমূহ

পণ্যের জীবন-চক্রের পর্যায় বা স্তর সমূহ:

পণ্যের জীবন-চক্রের ৪ (চার)টি স্তরে ভাগ করা যায় যেমন ক) প্রবর্তন, (খ) প্রবৃদ্ধি, (গ) পূর্ণতা প্রাপ্তি, (ঘ) অধঃগতি

জীবন-চক্রের বিভিন্ন স্তর সমূহ নিম্নে আলোচিত হলো

ক) **প্রবর্তন:** এ পর্যায়ে নতুন পণ্য বাজারে ছাড়া হয় এবং একে সম্ভাব্য গ্রাহকদের নিকট পরিচিত করানোর জন্য প্রচার মূলক কার্য চালানো হয়। এ পর্যায়ে বিক্রির পরিমাণ তেমন বেশী হয় না এবং প্রায় ক্ষেত্রে মুনাফাও অর্জিত হয় অতি সামান্য অনেক ক্ষেত্রে মুনাফা একেবারেই হয় না। পণ্য প্রবর্তনজনিত বহুল খরচ এবং গ্রাহকের সংখ্যার মুনাফা না হওয়ার প্রধান কারণ। ভবিষ্যতে মুনাফার আশায় এ পর্যায়ে পণ্যের পেছনে বিস্তার টাকা পয়সা খরচ করা হয়।

খ) **প্রবৃদ্ধি:** পণ্যের জীবনচক্রের দ্বিতীয় পর্যায়ে পণ্যের কাটতি বাড়ে, গ্রাহকের মধ্যে পণ্যের কদর বৃদ্ধি পায়, ফলে মুনাফার পরিমাণও বাড়তে থাকে। পণ্য প্রবৃদ্ধির পর্যায়ে বিক্রির পরিমাণ দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায় এবং সেই গতিতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। পণ্যের চলমান জীবনের এ পর্যায়ে প্রতিযোগীরা উন্নতমানের কিংবা কম ব্যয়ের পণ্য নিয়ে বাজারে প্রবেশ করতে থাকে। কোম্পানীর জন্য সর্বোচ্চ মুনাফার এটাই সময় তবে প্রতিযোগিতার দরুন এটা মুনাফার অগ্রগতি শুরুর সময়।

গ) **পূর্ণতা প্রাপ্তি:** এ পর্যায়ে প্রতিযোগিতা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে ফলে বিক্রির পরিমাণ সর্বোচ্চ খরচ করতে হয় যাতে পণ্যকে প্রতিযোগিতার মুখে টিকিয়ে রাখা যায়। এ পর্যায়ে প্রতিযোগীর সংখ্যা শুধু বাড়তেই থাকে না অনেক প্রতিযোগী বাজার দখল করার মতলবে মূল্য হ্রাসের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে।

ঘ) **অধঃগতি:** পণ্যের জীবন-চক্রের এই ধাপে। বিক্রির পরিমাণ আরও হ্রাস পেতে থাকে। ফলে শেষ পর্যন্ত মুনাফা অর্জন করা আর সম্ভব হয়ে উঠে না। যদি পণ্যটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয়া না হয় তাহলে পণ্যটির বিলুপ্তি ঘটে

গ্রাফ দেওয়া যেতে পারে।

উৎপাদন পূর্বাভাস, পরিকল্পনা এবং নিয়ন্ত্রণ (Production Forecasting, Planning And Control)

চাহিদা বিশ্লেষণ

ব্যবসার ক্ষেত্রে চাহিদা বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চাহিদা বিশ্লেষণের যে সকল ধাপ সমূহ তা উল্লেখ করা হইল:

- পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও এবং উদ্দেশ্য সমূহ নির্দিষ্ট করন
- মধ্যম পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা
- বাজার জরিপ পরিচালনা
- বাজারের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা
- চাহিদার পূর্বানুমান করা

উপকরণ ব্যবস্থাপনা (Materials Management)/সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট

চাহিদা ও যোগান

চাহিদা এবং যোগান বলতে কোন একটি পণ্যের বা সেবার ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বিদ্যমান বাজার সম্পর্ক বোঝায়। বাজারে কোন পণ্যের দাম এবং সরবরাহ কী-রূপ হবে তা চাহিদা ও যোগানের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ক দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

যে কোন ব্যবসার প্রেক্ষাপটে চাহিদা ও সরবরাহের সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একজন ব্যবসায়ীর সফলতা নির্ধারণে বিষয়টি মূলনীতি হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। নিচের সূচকগুলোর সাহায্যে চাহিদা ও সরবরাহের সম্পর্ক সহজেই চিহ্নিত করা যায়।

- একজন ব্যবসায়ী কী পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করতে পারে?
- কজন ব্যবসায়ী তার পণ্যের উপর কী পরিমাণ মূল্য ধার্য করতে পারে?

উৎপাদন পরিকল্পনা

উৎপাদন পরিকল্পনা বলতে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহের অগ্রিম নির্ধারণ বুঝানো হয়। প্রকৃতপক্ষে উৎপাদিত পণ্যের ডিজাইন, গঠন, উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কার্যক্রম, যন্ত্রপাতি বা মেশিনারির উৎপাদন ক্ষমতা ইত্যাদির পূর্ব-নির্দেশনাই উৎপাদন পরিকল্পনা।

উৎপাদন পরিকল্পনা :

১. উৎপাদন প্রক্রিয়া :

২. স্থায়ী সম্পদের বিবরণ : ক)-----, খ)-----, গ)-----

৩. বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ :

৪. প্রয়োজনীয় কাঁচামাল :

ক্র. নং	বিবরণ	পরিমাণ (বার্ষিক)	প্রতি একক মূল্য(টাকা)	টাকার পরিমাণ (টাকা)
০১				
মোট :				

৭. উৎপাদন খরচ:

ক্র.	বিবরণ	টাকার পরিমাণ (বার্ষিক)	মন্তব্য
০১			
০২			
মোট উৎপাদন খরচ :			

৫ম দিন**অধিবেশন -৫.১: ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের বাজারজাতকরণ/বিপণন**

দিন-৫, অধিবেশন ৫.১

সময়: ৯.৩০-১০.০০

ব্যাপ্তি: ৬০ মিনিট

সেশন শিরোনাম

: পরিচিতি পর্ব

সেশন লক্ষ্য

: এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ বিপণনের মৌলিক ধারণাসমূহ, বাজার, বিক্রয় ও বিপণন সম্পর্কে অবগত হবেন।

উদ্দেশ্য

: এ সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- বিপণনের ধারণা, ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পাবেন
- বিপণনের মৌলিক ধারণাসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন
- বাজার, বিক্রয় ও বিপণন সম্পর্কে ধারণা পাবেন
- বিপণনের গুরুত্ব ও আওতা সম্পর্কে অবহিত হবেন

উপকরণ

: ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, অডিও/ভিডিও মিউজিক, পোস্টার পেপার/বোর্ড, মার্কার

পদ্ধতি

: ভিপকার্ড, পোস্টার পেপার প্রদর্শন, গল্প বলা, প্রশ্নোত্তর, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা

পঠন উপকরণ

: হ্যান্ডআউট

পূর্ব প্রস্তুতি

: সহায়ক পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও বোর্ড প্রস্তুত করে রাখবেন।

মূল্যায়ন পদ্ধতি

: প্রশ্নোত্তর

বিপণনের ধারণা (Concept of Marketing)

মানুষ জন্মগ্রহণ করার পর থেকে আমৃত্যু বিভিন্ন পণ্য ব্যবহার করে। মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে তার চাহিদা মেটানোর জন্য প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের পণ্য বা সেবা ক্রয় ও ভোগ করে থাকে। ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাবার ক্রয় করে, বাসস্থানের জন্য ঘর-বাড়ি ক্রয় করে আবার চিকিৎসার জন্য চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে। পণ্য বা সেবা ভোগ করার জন্য মানুষ নির্দিষ্ট বাজার থেকে যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজন অনুসারে ক্রয় ও ভোগ করে। লক্ষ্য করা যায় যে, পণ্য বা সেবার ধারণার সৃষ্টি থেকে শুরু করে, ক্রেতাদের মাঝে তা পরিচিতিকরণ, ক্রয়ে উৎসাহ প্রদান, পণ্য বণ্টন, মূল্য নির্ধারণ, ক্রয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা প্রদান এবং বিক্রয়োত্তর সেবাসহ বিভিন্ন কাজের সাথে বিপণন বা বাজারজাতকরণ জড়িত।

ল্যাটিন শব্দ **Marcatus** থেকে ইংরেজী **Market** শব্দের উৎপত্তি। এই **Market** শব্দ থেকে পরবর্তীতে **Marketing** শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো বিপণন বা বাজারজাতকরণ।

অনেক সময়ই বিপণন বা মার্কেটিং দিয়ে শুধুমাত্র ক্রয়-বিক্রয় বা প্রচারণাকার্যকে বুঝানো হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ক্রয়বিক্রয় বা প্রচারণা হচ্ছে বিপণনের অনেক কাজের অংশবিশেষ। বিপণন একটি পরিবর্তনশীল ও জটিল বিষয়। বর্তমান সময়ে বিপণন বলতে সন্তোষজনকভাবে ক্রেতা বা ভোক্তার প্রয়োজনসমূহ পূরণকে বোঝায়। বিপণনের মূল উদ্দেশ্য হলো ক্রেতা ভ্যালু বা সুবিধা সরবরাহের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে নতুন ক্রেতাকে আকৃষ্ট করা এবং সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে বর্তমান ক্রেতাকে ধরে রাখা ও সন্তুষ্টি ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

পণ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে পণ্য ক্রেতা বা ভোক্তার নিকট পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত বিপণন বিভিন্ন ধরনের কাজের সাথে জড়িত থাকে। বিপণনের কাজকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়; যথা- পণ্য উৎপাদনের পূর্বে, পণ্য উৎপাদনের পরে, এবং পণ্য বিক্রয় করার পরবর্তীতে। পণ্য উৎপাদনের পূর্বে বিপণনের কাজগুলো হচ্ছে বাজার জরিপ, চাহিদা নির্ধারণ, অর্থ-সংস্থান, প্রতিযোগীদের চিহ্নিত করা ইত্যাদি। উৎপাদনের পরে বিপণনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো মান নির্ধারণ বিভক্তিকরণ, মোড়কীকরণ, মূল্য নির্ধারণ, পরিবহণ, গুদামজাতকরণ, বণ্টন, ঝুঁকিগ্রহণ, পণ্য প্রসার ইত্যাদি। সর্বশেষে পণ্য ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেয়া অথবা পণ্য ভোক্তার কাছে বিক্রয় করা হলেই বিপণনের কার্যক্রম শেষ হয় না। ভোক্তার কাছে পৌঁছানোর পরও বাজারজাতকরণের কিছু কাজ থাকে। যেমন- বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান, ভোক্তা বা ক্রেতার সন্তুষ্টি পরিমাপ, সন্তুষ্টি বজায় রাখা এবং বৃদ্ধি করা, মার্কেটিং এর নানাবিধ কার্যক্রম মূল্যায়ন করা।

বিপণনের সংজ্ঞা (Definition of marketing)

সাধারণ অর্থে, বিপণনকে একটি প্রক্রিয়াভিত্তিক কাজ বলা হয় যা ভোক্তাদের জন্য ভ্যালু বা সুবিধা সৃষ্টি করে, ভোক্তাদের সন্তুষ্টি বিধান করে এবং দীর্ঘমেয়াদী ক্রেতা-সম্পর্ক সৃষ্টি করে ও বজায় রাখে। অন্য অর্থে, ভোক্তার প্রয়োজন ও অভাব সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে উৎপাদন পূর্ব কিছু কার্যক্রম থেকে শুরু করে উৎপাদনকারীর নিকট থেকে পণ্য বা সেবা ভোক্তা বা ক্রেতার নিকট পৌঁছানো এবং ভোগ বা

ব্যবহারের পরবর্তী পর্যায়ের কার্যক্রমের সমষ্টিকে বিপণন বলে। ফিলিপ কটলার ও গ্যারি আর্মস্ট্রং এর মতে, বিপণন হচ্ছে একটি সামাজিক এবং ব্যবস্থাপনাকীয়া প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তিগত এবং দল অন্যদের সাথে পণ্যদ্রব্য ও ভ্যালু সৃষ্টি এবং বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজন ও অভাব পূরণ করে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বিপণন সম্পর্কে নিম্নের ধারণাগুলো পাওয়া যায়:

১. বিপণন হলো সামাজিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রক্রিয়া;
২. বিপণনের মূল বিষয় হলো ক্রেতার ও ভোক্তার সন্তুষ্টি বিধান করা;
৩. বিপণনের কাজ শুরু হয় উৎপাদনের চিন্তার মাধ্যমে এবং সন্তোষজনক উপায়ে ক্রেতাকে বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানের মাধ্যমে তা চলতে থাকে;
৪. ক্রেতার প্রয়োজন অনুযায়ী ভ্যালু সৃষ্টি করে সেই অনুযায়ী পণ্য বাজারজাত করা বিপণনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
৫. বিপণনে ক্রেতা ও ভোক্তার সাথে দীর্ঘমেয়াদী শক্তিশালী সম্পর্ক তৈরির উপর জোর দেওয়া হয়।

তাই পরিশেষে বলা যায়, বিপণন হচ্ছে একটি সামাজিক ও ব্যবস্থাপনাকীয়া প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ক্রেতাদের প্রয়োজন অনুসারে পণ্য ও সেবা তৈরি ও বিনিময় করার মাধ্যমে প্রয়োজন ও অভাব মিটিয়ে তাদের সন্তুষ্টি বিধান করা হয়।

বিপণনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Marketing)

ভোক্তার প্রয়োজন, চাহিদা ও সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে বিপণনের কার্যক্রম প্রবাহিত হয়। বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্নভাবে বিপণনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তার প্রেক্ষিতে বিপণনের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১. সামাজিক প্রক্রিয়া: বিপণন একটি সামাজিক প্রক্রিয়া কারণ বিপণন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের অভাব, প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে পণ্য ও সেবা উৎপাদন করে সরবরাহ করে এবং তাদের সন্তুষ্ট করতে সচেষ্ট থাকে। আবার সামাজিক বিপণন মতবাদে সমাজের কল্যাণকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয় যার ফলে সমাজের জন্য ক্ষতিকর পণ্য বা সেবা প্রস্তুত ও সরবরাহ থেকে বিরত রাখা হয়।

২. ব্যবস্থাপনামূলক প্রক্রিয়া: বিপণনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য প্রতিটি পর্যায়ে সঠিক কৌশল অবলম্বনের জন্য ব্যবস্থাপনার কাজ করতে হয়। যেমন- পরিকল্পনা গ্রহণ, সংগঠিতকরণ, প্রেষণা দান এবং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজের সমন্বয়ে বিপণনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

৩. অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া: বিপণনের কার্যক্রমের সাথে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার স্থানগত, সময়গত ও স্বত্বগত উপযোগ সৃষ্টির কাজ জড়িত। বিপণন পরিবহনের মাধ্যমে স্থানগত উপযোগ, গুদামজাতকরণের সাথে সময়গত এবং ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে স্বত্বগত উপযোগ সৃষ্টি করে। এ কারণে বিপণনকে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া বলা হয়।

৪. বিনিময় প্রক্রিয়া: ভোক্তা তার প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের জন্য অর্থ বিনিময়ের মাধ্যমে পণ্য ও সেবার আদান-প্রদান করে থাকে বলে বিপণনকে বিনিময় প্রক্রিয়া বলা হয়ে থাকে। বিপণনকারী ভোক্তাদের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী সুসম্পর্ক তৈরি ও বজায় রাখার জন্য বিপণনের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে।

৫. ভোক্তামুখী প্রক্রিয়া: আধুনিক বিপণনের মূলে রয়েছে ভোক্তার প্রয়োজন, অভাব, চাহিদা ও সন্তুষ্টি। ভোক্তাকে কেন্দ্র করেই বিপণনের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পন্ন হয় বলে বিপণনকে ভোক্তামুখী প্রক্রিয়া বলা হয়।

৬. গতিশীল প্রক্রিয়া: বিপণন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। সময়ের সাথে সাথে ভোক্তার রুচি, অভাব, প্রয়োজন, চাহিদা, ক্রয় ক্ষমতা, ক্রয় আচরণ ইত্যাদি পরিবর্তিত হয়। শুধু তাই নয়, ব্যবসায়িক পরিবেশ এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রযুক্তির পরিবর্তনের কারণে সামগ্রিক পরিবেশেও পরিবর্তন হচ্ছে। এর ফলে বিপণনকারী পরিবর্তিত অবস্থার সাথে তাল মেলানোর জন্য নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করে।

৭. অনুসন্ধানমূলক প্রক্রিয়া: বিপণনের কার্যাবলি অনুসন্ধানমূলক কাজের সাথে জড়িত। কারণ নতুন বাজার সৃষ্টি, নতুন ক্রেতা খুঁজে বের করা, নতুন পণ্য উন্নয়ন করা, প্রতিদ্বন্দীদের কৌশল সম্পর্কে জানা, ক্রেতাদের নতুন নতুন পদ্ধতিতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিপণনকারীকে সবসময়ই তথ্য অনুসন্ধান করতে হয়।

৮. মধ্যস্থকারীদের অবস্থান: বিপণন কার্যক্রমের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা ক্রেতা ও ভোক্তার নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়। আর এই পণ্য সরবরাহের কাজে পাইকারী, খুচরা ব্যবসায়ী, প্রতিনিধি, পরিবেশক ইত্যাদি মধ্যস্থকারীদের ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং বিপণনের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য মধ্যস্থকারীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

৯. সমন্বিত প্রক্রিয়া: বিপণনের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য বিপণনের সাথে জড়িত বিভিন্ন কার্যাবলির সমন্বয় সাধন করতে হয়। বিপণনের যেকোন একটি কার্যের পরিবর্তন হলে অন্য কার্য বা কার্যাবলির পরিবর্তন হতে পারে, কারণ বিপণন কার্যাবলি বিচ্ছিন্ন কয়েকটি কাজের সমষ্টি নয়।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বিপণন একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোম্পানি ভোক্তার সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন করে।

ভোক্তাদের প্রয়োজন নির্ধারণ, সেইভাবে পণ্য উৎপাদন ও বণ্টন এবং ভোক্তাদের সন্তুষ্টি বিধান হলো বিপণনের একমাত্র লক্ষ্য। বিপণন সম্পর্কে আলোচনার জন্য এবং ই বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান লাভের নিমিত্তে কতকগুলো ধারণা সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

১. প্রয়োজন, অভাব ও চাহিদা (Needs, Wants and Demands)

দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার আবশ্যিকতা অনুভব করাকে প্রয়োজন (ঘববফ) বলে। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, নিরাপত্তা, চিকিৎসা, সেবা ইত্যাদি অপরিহার্য। যেমন, ক্ষুধা নিবারণের জন্য মানুষ খাদ্য গ্রহণ করে আবার মানুষ বাসস্থানের প্রয়োজন বোধ করে নিরাপদে ও আরামের থাকার জন্য। মানুষের এই প্রয়োজন পূরণ করা থেকে বিপণনের মৌলিক ধারণার শুরু হয়েছে।

সমাজ, সংস্কৃতি বা ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ‘প্রয়োজন’ যখন দ্রব্য সামগ্রী ও সেবার আকারে প্রকাশ পায় তখন তাকে অভাব (ডখহঃ) বলে। মানুষ ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজন অনুভব করে। যেমন, বাসস্থানের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য মানুষের টিনের তৈরি ঘর, ইটের তৈরি অট্টালিকা বা কাঠের তৈরি ঘরবাড়ি প্রয়োজন হতে পারে। ভোক্তার বাসস্থানের এই প্রয়োজন কোনম ধরনের আবাসন দিয়ে পূরণ হবে তা ভোক্তার সংস্কৃতি, ব্যক্তিত্ব বা সমাজ দ্বারা নির্ধারিত হয়। সাধারণত বাংলাদেশের নিম্নবিত্তের ভোক্তা টিনের তৈরি ঘর দিয়ে বাসস্থানের প্রয়োজন পূরণ করে, আবার উচ্চ বিত্তের ভোক্তা রড- ইট বালু-সিমেন্টের তৈরি অট্টালিকা এবং পাহাড়ি এলাকার ভোক্তা কাঠের তৈরি ঘর-বাড়ি দিয়ে তার প্রয়োজন পূরণ করে।

কোন দ্রব্য বা সেবার অভাব থাকলে এবং সেটি ক্রয় করার জন্য অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকলে তাকে চাহিদা (উবসধহফ) বলে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোন ভোক্তার বাসস্থানের অভাব রয়েছে, একারণে সে টিনের তৈরি ঘর বা ইটের তৈরি অট্টালিকা অথবা কাঠের তৈরি ঘর তৈরি করে তার বাসস্থানের অভাব পূরণ করতে পারে। আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী ভোক্তা যখন টিনের ঘর তৈরি করার জন্য করার ইচ্ছা করে, তখন বলা যায় যে তার নিকট টিনের চাহিদা রয়েছে।

২. পণ্য, সেবা ও অভিজ্ঞতা (Products, Services and Experience)

ভোক্তার প্রয়োজন ও অভাব পূরণ করতে পারে এমন যা কিছু বাজারে বিক্রয়ের জন্য ছাড়া হবে তাকে পণ্য বলে। পণ্য দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান হতে পারে। খাতা, কলম, বই, চাল, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি দৃশ্যমান পণ্য। অন্য দিকে, সেবা জাতীয় পণ্য হলো অদৃশ্যমান পণ্য। চিকিৎসকের চিকিৎসা, শিক্ষকের শিক্ষা দান, নাপিতের চুল কাটা ইত্যাদিকে সেবা বলা হয়।

৩. ভ্যালু এবং সন্তুষ্টি (Value and Satisfaction)

কোন পণ্য ক্রয় ও ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রেতা যে উপকারিতা পায় এবং পণ্যটি অর্জনের জন্য যে অর্থ ব্যয় করে, এ দুয়ের পার্থক্যকে ‘ক্রেতার ভ্যালু’ বলা হয়। পণ্য বা সেবার মান, মূল্য, ব্র্যান্ড ইত্যাদির সমন্বয়ে ক্রেতার মধ্যে সে পণ্য বা সেবা সম্পর্কে একটি মনোভাব তৈরি হয়, যার ভিত্তিতে ক্রেতার ভ্যালু নির্ধারিত হয়। ভোক্তা কোন পণ্য বা সেবা ক্রয়ের সময় যেসব সুবিধা প্রত্যাশা করে, তার সাথে ব্যবহারের পর প্রাপ্ত সুবিধার তুলনা করে ভোক্তার মধ্যে যে আনন্দ বা নৈরাশ্যের অনুভূতি সৃষ্টি হয় তাকে সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি বলে। ভোক্তা তারা প্রত্যাশা অনুসারে পণ্য বা সেবা হতে সুবিধা পেলে সন্তুষ্ট হবে এবং না পেলে অসন্তুষ্ট হবে।

৪. বিনিময়, লেনদেন এবং সম্পর্ক (Exchange, Transactions and Relationships)

কোন কিছু প্রদানের মাধ্যমে অন্যের কাছ থেকে কাস্তিত পণ্য লাভের উপায়কে বিনিময় বলে। যেমন, কোন শিল্পী যদি তার চিত্রকর্ম প্রদর্শন করে দর্শকের সংখ্যা বাড়াতে চায়, তাকে বিনিময় বলা হবে। দুইটি পক্ষের মধ্যে মূল্য বা অর্থের মাধ্যমে কোন বিনিময় সংঘটিত হওয়াকে লেনদেন বলে। যদি ১০০ টাকার বিনিময়ে প্রবেশ টিকেট বিক্রয় করে শিল্পীর চিত্রকর্ম প্রদর্শন করা হয়, তাকে লেনদেন বলা হবে। সম্পর্কভিত্তিক বিপণন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিপণনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য পণ্য বা সেবার বিনিময়ের সাথে জড়িত পক্ষগুলোর (ক্রেতা, ভোক্তা, বিক্রেতা, সরবরাহকারী, পরিবেশক ইত্যাদি) মধ্যে দীর্ঘকালীন সুসম্পর্ক সৃষ্টি ও রক্ষা করা হয়।

৫. বাজার (Market)

বিপণনের পরিভাষায় বাজার বলতে ক্রেতা-বিক্রেতার একটি সমষ্টিকে বুঝায় যাদের ব্যক্তি বা কোম্পানি হিসেবে পণ্য বা সেবার প্রয়োজন থাকে এবং সেই পণ্য বা সেবা ক্রয়ের সামর্থ্য, ইচ্ছে ও কর্তৃত্ব থাকে। এক কথায়, পণ্য বা সেবা ক্রয় করতে সক্ষম এমন বর্তমান ক্রেতা এবং সম্ভাব্য ক্রেতার সমষ্টিকে বাজার বলা যায়। সাধারণত বিপণন কর্মকান্ড বাজারকে লক্ষ্য করেই পরিচালিত হয়। যেমন, কোন শিশু চকোলেট ক্রয় করলে চকোলেট পণ্যের সে বর্তমান ক্রেতা হিসেবে চকোলেট বাজারের অন্তর্গত। আবার শিশুটি বড় হয়ে ভবিষ্যতে কম্পিউটার ক্রয় করতে পারে বলে সম্ভাব্য ক্রেতা হিসেবে সে কম্পিউটার বাজারের অন্তর্গত হতে পারে।

বাড়ির কাজ: রহিমা স্থানীয় কোন দোকান থেকে দামী একটি ফ্রিজ ক্রয় করেছেন। এখানে রহিমার প্রয়োজন, অভাব ও চাহিদা নির্ণয় করুন।

বাজারের সংজ্ঞা (Definition of Marketing)

সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মূল ভিত্তি হলো বাজার। বিপণনকারী নিজ প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ব্যবহার করে উপযুক্ত ও আকর্ষণীয় বাজার খুঁজে বের করে এবং সেই বাজারের চাহিদা পূরণ করে প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্য অর্জন করে। বাজার শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। একজন সাধারণ ভোক্তার কাছে পণ্য কেনাকাটার স্থান হলো বাজার। যেমন কাওরান বাজার, নিউ মার্কেট ইত্যাদি। চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থা বোঝানোর জন্যও বাজার শব্দ ব্যবহার করা হয়।

যেমন চালের বাজার মন্দা যাচ্ছে — এ কথার মাধ্যমে চালের চাহিদার মন্দাভাব বোঝানো হচ্ছে। আবার অর্থনীতির ভাষায় বাজার হলো ক্রেতা-বিক্রেতার সমষ্টি যারা নির্দিষ্ট পণ্য লেনদেন করে। যেমন সবজির বাজার, মাছের বাজার ইত্যাদি। বিপণনের ভাষায় বাজার হলো কোন পণ্যের বর্তমান ও সম্ভাব্য ক্রেতার (ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান) সমষ্টি যাদের অভাব আছে, অভাব মেটানোর সামর্থ্য আছে, অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছে আছে এবং পণ্য বা সেবা ক্রয়ের অধিকার আছে। ফিলিপ কটলার ও গ্যারি আর্মস্ট্রং এর মতে, বাজার হলো কোন পণ্য বা সেবার প্রকৃত ও সম্ভাব্য ক্রেতাদের সমষ্টি।

বিক্রয়ের সংজ্ঞা (Definition of sales)

সাধারণ অর্থে, বিক্রয় হলো পণ্যের মালিকানা ক্রেতার নিকট হস্তান্তরের প্রক্রিয়া। বিপণনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিক্রয় শুধুমাত্র মালিকানা হস্তান্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ভোক্তার প্রয়োজন নির্ধারণ, চাহিদা সৃষ্টি, ক্রেতা অনুসন্ধান, পণ্য সম্পর্কে ক্রেতাকে তথ্য প্রদান, উপদেশ দেওয়া এবং আলোচনার মাধ্যমে পণ্যের মালিকানা হস্তান্তরের কার্যক্রমকে বিক্রয় বলা হয়।

সুতরাং, বিক্রয় হলো কতগুলো কাজের সমষ্টি, যে কাজগুলো হলো ভোক্তার প্রয়োজন নির্ধারণ, চাহিদা সৃষ্টি, ক্রেতা অনুসন্ধান, পণ্য সম্পর্কে ক্রেতাকে পরামর্শ ও উপদেশ দান, মালিকানা হস্তান্তর, চাহিদা অনুযায়ী বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান ইত্যাদি।

বাড়ির কাজ: আপনার ব্যবসায়ের ধরণ বিবেচনায় নিয়ে বাজার, বিক্রয় ও বিপণনের মধ্যে পার্থক্য উদাহরণ সহকারে লিখুন।

১. সুজিত রাজশাহীতে একটি আমের জুস তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। তিনি বাগান চাষিদের কাছ থেকে আম ক্রয় করে কারখানায় এনে মানসম্মত জুস তৈরি করেন। পরে উৎপাদিত জুস প্যাকেটজাত করে তিনি দেশের বিভিন্ন বাজারে নিজস্ব পরিবহনের মাধ্যমে সরবরাহ করেন। জুস তৈরি ও সরবরাহ তেমন লাভজনক না হওয়ায় তিনি এর পাশাপাশি জ্যাম-জেলি উৎপাদন ও বিপণনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

ক. বিক্রয় কী?

খ. এই ব্যবসায়ের প্রেক্ষিতে সুজিত ক্রেতা নাকি ভোক্তা? ব্যাখ্যা করুন।

গ. সুজিত দেশের ও আন্তর্জাতিক বাজারে জুস সরবরাহ করছেন- এ পরিপ্রেক্ষিতে বাজারের ৩টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

ঘ. জ্যাম-জেলি উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত সুজিতের সিদ্ধান্ত কতটুকু বাস্তবসম্মত বলে আপনি মনে করেন? যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করুন।

২. সালমান একটি ব্যবসায় কোম্পানির ব্যবস্থাপক। তার কোম্পানিটি গবেষণার মাধ্যমে ভোক্তার চাহিদা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করে সে অনুযায়ী পণ্য বা সেবা উৎপাদন, মূল্য নির্ধারণ, প্রচারণা এবং সরবরাহের কাজ করে। কোম্পানিটি মনে করে ভোক্তাই রাজা। তাই ভোক্তার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই কোম্পানির সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ক. ক্রেতা সন্তুষ্টি কী?

খ. সম্ভাব্য ক্রেতা কে হতে পারে? ব্যাখ্যা করুন।

গ. সালমানের কোম্পানিটি বিপণনের কোন যুগের কৌশল গ্রহণ করেছে? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. উদ্দীপকে, ভোক্তাকে কেন্দ্র করে বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত কতটা যৌক্তিক তা বিশ্লেষণ করুন।

বিপণন পরিবেশ (Marketing Environment)

পরিবেশ বলতে কী বুঝায়?

সাধারণভাবে মানুষ যেখানে বাস করে তার চারপাশের সবকিছুকে একসাথে পরিবেশ বলে। অর্থাৎ পরিবেশ হলো মানুষের জীবনধারা এবং কার্যাবলির উপর প্রভাব বিস্তারকারী পারিপার্শ্বিক অবস্থা। অন্যভাবে বলা যায়, কোন মানুষের উপর কতকগুলো পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেমন ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, খনিজদ্রব্য, নদ-নদী, ধর্মীয় বিশ্বাস, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ইত্যাদি প্রভাব বিস্তার করে এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে পরিবেশ বলে। উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে বাংলাদেশের খাল, বিল, মাঠ ঘাট, রাস্তা, বাড়ি, ঘর থেকে আরম্ভ করে সমস্ত প্রাকৃতিক বিষয়কে বোঝাবে। পরিবেশ ব্যক্তি জীবনের সাথে সাথে সাংগঠনিক, রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

বিপণন পরিবেশ বলতে কী বুঝায়?

নির্দিষ্ট কোনো পণ্য বা সেবাবিপণনে যে সমস্ত বিষয় পণ্য বা সেবার উপর প্রভাব বিস্তার করে, সেটিই হলো পণ্যের বিপণন পরিবেশ। কোনো একটি পণ্য বা সেবা বিপণন করতে গেলে যে সমস্ত নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত উপাদান বা শক্তি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তাদের সমষ্টিকে বিপণন পরিবেশ বলে।

ফিলিপ কটলার ও গ্যারি আর্মস্ট্রং এর মতে, বিপণন পরিবেশ হলো বিপণন-বহির্ভূতকতগুলো পক্ষ বা শক্তির সমষ্টি যা অভীষ্ট ক্রেতার সাথে সফল সম্পর্ক তৈরি ও বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিপণন ব্যবস্থাপনার সামর্থ্যকে প্রভাবিত করে।

বিপণন পরিবেশের প্রকাণ্ড

বিপণন কার্যক্রমের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী পরিবেশের উপাদানসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ-

১. ব্যষ্টিক পরিবেশ (Micro-environment): কোন কোম্পানির বিপণন কার্যক্রমের উপর নিয়ন্ত্রণযোগ্য যেসব শক্তি, উপাদান বা পক্ষসমূহ প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে তাদেরকে একত্রে ব্যষ্টিক পরিবেশ বলে। ব্যষ্টিক পরিবেশের উপাদানগুলো প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ অথবা খুব কাছাকাছি অবস্থান করে। সে কারণে প্রতিষ্ঠানের বিপণনকারী এই উপাদানগুলোকে কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

২. সামষ্টিক পরিবেশ (Macro-environment): সামষ্টিক পরিবেশ হলো কোন প্রতিষ্ঠানের বিপণন কার্যক্রমের উপর অনিয়ন্ত্রণযোগ্য যেসব শক্তি, উপাদান বা পক্ষসমূহ যা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। সামষ্টিক পরিবেশের উপাদানসমূহ বাহ্যিক ও গতিশীল। তাই প্রতিষ্ঠানের বিপণনকারী এই উপাদানগুলোকে এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

ব্যষ্টিক পরিবেশ: উপাদানসমূহ ও বিপণনে এর প্রভাব

উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে আপনি

- বিপণনে ব্যষ্টিক পরিবেশ কী তা বুঝতে পারবেন;
- ব্যষ্টিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানসমূহকে ব্যাখ্যা করতে পারবেন ও এর গুরুত্ব জানতে পারবেন; এবং
- এই সকল উপাদানসমূহ বিপণনের কার্যক্রমে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ব্যষ্টিক পরিবেশের সংজ্ঞা

ব্যষ্টিক শব্দটি এসেছে ইংরেজি শব্দ 'Micro' থেকে যার উৎপত্তি গ্রীক শব্দ 'Mikros' হতে। এর অর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র। বিপণন পরিবেশের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র যে উপাদানগুলো কোম্পানির বিপণন কার্যক্রমকে সরাসরি প্রভাবিত করে, এমন পক্ষগুলোর সমষ্টিকে ব্যষ্টিক পরিবেশ বলে।

ফিলিপ কটলার ও গ্যারি আর্মস্ট্রং এর মতে, ব্যষ্টিক পরিবেশ সেই সকল শক্তির সমন্বয়ে গঠিত যেগুলো কোম্পানির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং যা কোম্পানির ক্রেতাকে সেবা প্রদানে প্রভাব সৃষ্টি করে। এ সকল শক্তির মধ্যে রয়েছে কোম্পানি, সরবরাহকারী, মধ্যস্থ ব্যবসায়ী, ক্রেতার বাজার, প্রতিযোগী এবং জনগোষ্ঠী।

ব্যষ্টিক পরিবেশের উপাদানসমূহ

ইতিপূর্বে আপনি জেনেছেন যে, ব্যষ্টিক পরিবেশের উপাদানগুলো কোম্পানির বিপণন কার্যক্রমের উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। সরবরাহকারী, কোম্পানি, প্রতিযোগী, মধ্যস্থ ব্যবসায়ী, ক্রেতাসাধারণ ও জনগোষ্ঠী - এ উপাদানগুলোর সমন্বয়ে ব্যষ্টিক পরিবেশ গঠিত যা বিপণন কার্যক্রমের উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। নিম্নে একটি কোম্পানির ব্যষ্টিক পরিবেশের উপাদানসমূহের উপর আলোচনা করা হলো:

১. কোম্পানি: একটি কোম্পানি কতিপয় সদস্যের সমন্বয়ে আইনগত উপায়ে সৃষ্ট। কোম্পানির ভিতরের সকল উপাদানবিপণন কার্যাবলি সম্পাদনে প্রভাব বিস্তার করে।
২. সরবরাহকারী: সরবরাহকারী হচ্ছে সকল ব্যক্তি বা কোম্পানি, যারা কোম্পানির পণ্য উৎপাদনে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান দেয়। একটি কোম্পানি যদি গাড়ি উৎপাদন করে, তবে সরবরাহকারী গাড়ি উৎপাদনের সকল প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি যোগান দিয়ে থাকে।
৩. মধ্যস্থকারী: যে সকল ব্যক্তি বা কোম্পানি উৎপাদনকারীর উৎপাদিত পণ্যচূড়ান্ত ভোক্তাদের নিকট বিক্রয় করে এবং বণ্টন ও প্রসারমূলক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করে তাদের বিপণন মধ্যস্থকারী বা মধ্যস্থ ব্যবসায়ী বলে।
৪. গ্রাহক: যারা বিপণনকারীর পণ্য ও সেবাসামগ্রী ক্রয় করে, তাদেরকে ক্রেতা বা গ্রাহক বলা হয়। কোম্পানির লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ক্রেতাদের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। তাই বিপণনকারীকে গ্রাহকদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়।
৫. প্রতিযোগী: প্রায় প্রত্যেকটি কোম্পানিকে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ করে সমজাতীয় কোম্পানিগুলোকে এই প্রতিযোগিতা ব্যাপকভাবে মোকাবেলা করতে হয়। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে প্রতিটি কোম্পানি চেষ্টা করছে সর্বোচ্চ বাজার শেয়ার দখল করতে। তাই তারা প্রতিনিয়ত ভোক্তাদের জন্য বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে ব্যস্ত।
৬. জনগোষ্ঠী: জনগোষ্ঠী হলো এমন একটি দল বা গোষ্ঠী যারা কোম্পানির উদ্দেশ্য অর্জনের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তাই বিপণন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য বিপণনকারীকে বাজারের অধিকাংশ জনগণের কথা বিবেচনা করতে হয়।

পণ্য বিপণনে ব্যষ্টিক পরিবেশের প্রভাব

কোম্পানির পণ্য বা বিপণনে ব্যষ্টিক পরিবেশ প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো -

১. কোম্পানি: কোম্পানির কার্যবলির উপর বিপণন কার্যক্রম অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই কোম্পানির প্রত্যেকটি বিভাগকে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় রেখে কার্য পরিচালনা করতে হয়। কোম্পানির উচ্চ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিভাগ থাকে, যেমন উৎপাদন, বিপণন, হিসাব ও অর্থ, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ ইত্যাদি।
২. সরবরাহকারী: সরবরাহকারীর দক্ষতার উপর কোম্পানির উৎপাদন ব্যবস্থা নির্ভরশীল। কাঁচামালের সরবরাহের ঘাটতি অথবা অতিরিক্ত সরবরাহ অথবা ত্রুটিপূর্ণ সরবরাহের কারণে উৎপাদিত পণ্যের মান খারাপ হলে পণ্যবিক্রয় করা যায় না। ফলে কোম্পানির সুনাম দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই বিপণনকারীকে সরবরাহকারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হয়। সেগুলো হলো- সঠিক মানের পণ্য সরবরাহকারীর সামর্থ আছে কিনা; সঠিক মূল্যে সরবরাহের নিশ্চয়তা; সঠিক সময়ের মধ্যে মাল সরবরাহের নিশ্চয়তা; নিয়মিত পণ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা; বাকীতে পণ্য সরবরাহের সামর্থ; সরবরাহকারীর পণ্য সরবরাহের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা এবং সরবরাহকারীর উপর নিয়ন্ত্রণ।
৩. মধ্যস্থকারী: বিপণন কার্যক্রমে বিভিন্ন ধরনের মধ্যস্থকারী নিয়োজিত থাকে। এরা ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তার জন্য ক্রেতাদের সাথে জড়িত থাকে। মধ্যস্থ ব্যবসায়ী উৎপাদকের কাছ থেকে সরাসরি পণ্য ক্রয় করে চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে সরবরাহ করে। কিছু মধ্যস্থ ব্যবসায়ী পণ্য সংরক্ষণ করে এবং উৎপাদনের স্থান থেকে গন্তব্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে।
৪. ক্রেতা বা গ্রাহক: কোম্পানি বিভিন্ন ধরনের ক্রেতা বা গ্রাহক দ্বারা প্রভাবিত হয় যার প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনা করে প্রত্যেকটি বাজারের জন্য আলাদা আলাদা বিপণন কৌশল গ্রহণ করতে হয়।
৫. প্রতিযোগী: প্রতিটি কোম্পানিকে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয়। যে বাজারে একই ধরনের উৎপাদকের সংখ্যা বেশি সেখানে প্রতিযোগিতা তীব্র হয়। বিপণনকারীকে বাজারে টিকে থাকার জন্য সর্বদা তার প্রতিযোগীদের দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা খুঁজে বের করতে হয় এবং প্রয়োজনীয় বিপণন কৌশল প্রণয়ন করতে হয়।

৬. জনগোষ্ঠী: বিপণনকারীকে জনগোষ্ঠীর সাথে কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে কোম্পানির সুনাম ধরে রাখতে হয়। বিভিন্ন ধরনের জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে ক) অর্থসংস্থানকারী জনগোষ্ঠী যেমন ব্যাংক, বিনিয়োগ সংস্থা, শেয়ার বাজার ইত্যাদি; খ) মিডিয়া জনগোষ্ঠী যেমন পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, ম্যাগাজিন ইত্যাদি; গ) সরকারি জনগোষ্ঠী যেমন পণ্যের নিরাপত্তা, বিজ্ঞাপনের সত্যতা, পরিবেশ দূষণ, পণ্যের মান ইত্যাদি যাচাইকারীসরকারি সংস্থাসমূহ; ঘ) নাগরিক জনগোষ্ঠী যেমন ভোক্তা সংগঠন, পরিবেশবাদী জোট, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ইত্যাদি; ঙ) স্থানীয় জনগোষ্ঠী যেমন প্রতিবেশী, কমিউনিটি ক্লাব, সমিতি ইত্যাদি; চ) সাধারণ জনগোষ্ঠী এবং ছ) কোম্পানির অভ্যন্তরীণ জনগোষ্ঠী যেমন শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক, পরিচালকমন্ডলী ইত্যাদি।

সামষ্টিক পরিবেশ: উপাদানসমূহ ও বিপণনে এর প্রভাব

উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে আপনি

- বিপণনের সামষ্টিক পরিবেশ কী তা বুঝতে পারবেন;
- সামষ্টিক পরিবেশের উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ও এর গুরুত্ব জানতে পারবেন; এবং
- সামষ্টিক পরিবেশের উপাদানসমূহ কিভাবে বিপণন কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

সামষ্টিক পরিবেশের সংজ্ঞা

সামষ্টিক শব্দটি ইংরেজি **Macro** শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ, যা গ্রীক শব্দ **Makros** হতে এসেছে। এর অর্থ হলো বড়। যে সকল অনিয়ন্ত্রণযোগ্য শক্তি বিপণন কার্যক্রমে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে তাদের সম্মিলিত প্রভাবকে সামষ্টিক পরিবেশ বলে। সামষ্টিক পরিবেশের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী শক্তিগুলো হলো জনসংখ্যাগত, অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক, প্রযুক্তিগত, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক। এ সমস্ত উপাদান ব্যাহ্যিক ও অনিয়ন্ত্রণযোগ্য শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। এ সকল উপাদান কোম্পানির পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগের সাথে সাথে ঝুঁকিরও সৃষ্টি করে।

ফিলিপ কটলার ও গ্যারি আর্মস্ট্রং এর মতে, ব্যষ্টিক পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তারকারী বৃহত্তর সামাজিক শক্তিসমূহ যথা জনসংখ্যাগত, অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক, প্রযুক্তিগত, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক শক্তিগুলো নিয়ে সামষ্টিক পরিবেশ গঠিত।

বিপণন কার্যাবলী (Marketing Functions)

বিপণন কার্যাবলীর ধারণা

সাধারণ লোকজন বিপণন কার্য বলতে শুধুমাত্র ক্রয় ও বিক্রয়কেই বুঝে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিপণন কার্যের পরিধি অনেক বিস্তৃত। বিপণন কার্যাবলীকে এমন কতগুলো কাজ বা সেবার সমষ্টি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যা উৎপাদকের নিকট থেকে ভোক্তা বা ব্যবহারকারীর নিকট পণ্য বা সেবার প্রবাহ পরিচালিত করার প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে পণ্য ও সেবার আদান-প্রদানে যেসব কার্যাবলি জড়িত থাকে সেগুলো বিপণন কার্যের আওতায় পড়ে। একটি বিপণন কার্য উৎপাদক নিজে কিংবা মধ্যস্থ ব্যবসায়ী (পাইকার, খুচরা ব্যবসায়ী, আড়তদার) বা ভোক্তারা সম্পাদন করতে পারে।

বিপণন কার্যাবলি উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যবর্তী পর্যায়ে পণ্য বা সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য সম্পাদিত হয়ে থাকে। বিপণন কার্যাবলির সাথে পণ্যের স্বত্ব পরিবর্তন, পণ্যের হস্তান্তর, পণ্যের সংরক্ষণ, পণ্যের প্রসারসহ ইত্যাদি জড়িত। বিপণন পরিবেশের পরিবর্তনের কারণে বিপণন কার্যাবলি নিয়মিত বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কারণ এর মাধ্যমে বিপণন-দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। সাধারণত বিপণনক্রয়, বিক্রয়, পরিবহন, গুদামজাতকরণ, প্রমিতকরণ ও পর্যায়িতকরণ, অর্থসংস্থান, মোড়কীকরণ, ঝুঁকি-বহন, বাজার তথ্য সংগ্রহ, মূল্য নির্ধারণ, পণ্যের প্রসার ইত্যাদি কাজ সম্পাদিত হয়।

বিপণন কার্যাবলির বিবরণ

সাধারণ ভাবে বিপণন কার্যাবলি বলতে উৎপাদকের নিকট থেকে দ্রব্য সামগ্রী ভোক্তার নিকট পৌঁছে দেয়াকে বোঝায়। বিপণন কার্যাবলির প্রধান লক্ষ্য হলো ব্যবহার-উপযোগী পণ্য ব্যবহারকারীর নিকট পৌঁছে দেয়া। কিন্তু পণ্য পৌঁছে দেবার আগে এবং পরেও বিপণনের কিছু কাজ রয়েছে।

১। উৎপাদন পূর্ব কার্যাবলি: পণ্য বণ্টন কাজ আরম্ভ করার পূর্বে বিপণন পদ্ধতিতে কিছু কাজ করতে হয়। এই কাজগুলোকে উৎপাদন-পূর্ব বিপণন কার্যাবলি বলা হয়। এই কার্যাবলির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ হলো:

ক) বিপণন পরিবেশ বিশ্লেষণ: বিপণনের কিছু নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং কিছু অনিয়ন্ত্রণযোগ্য উপাদান রয়েছে। বিপণন তার ব্যস্তিক এবং সামষ্টিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এদের প্রাথমিকভাবে পর্যালোচনা করা বিপণনের একটি অন্যতম প্রধান কাজ।

খ) ভোক্তা বিশ্লেষণ: ভোক্তাদের নানাবিধ বিষয় যেমন ভোক্তার বৈশিষ্ট্য, বাজার বিভক্তিকরণ, টার্গেট ক্রেতা, বাজার বিশ্লেষণ, বাজার অবস্থান ইত্যাদি বিষয় ভোক্তা বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত। পণ্য বিপণনের পূর্বে এ সকল বিশ্লেষণ প্রয়োজন। অন্যথায় বাজারে সফলতা লাভ করা যায় না।

গ) পণ্য পরিকল্পনা: পণ্যের উপর সমগ্র বিপণনের সার্থকতা নির্ভর করে। কি পণ্য, কাদের জন্য, কি পরিমাণ ইত্যাদি পণ্য পরিকল্পনার মূল বিষয়। তাই এগুলির যথাযথ বিশ্লেষণ প্রয়োজন এবং সেভাবে পণ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

ঘ) বিপণন পরিকল্পনা: বিপণন-লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিপণন-নির্বাহীকে বিপণন প্রোগ্রামসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে হয়। পণ্য, মূল্য বণ্টন এবং প্রসারের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। বিজ্ঞাপনের সাথে বণ্টনের অথবা পণ্যের মূল্যের সাথে পণ্যের গুনগত মানের সমন্বয় করতে হবে। এগুলো সঠিকভাবে করতে না পারলে বিপণন-লক্ষ্য অর্জন অনেকটা দুরূহ হয়ে পড়বে।

২। উৎপাদন-পরবর্তী কার্যাবলি: পণ্য উৎপাদনের পর বিপণনের গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ আরম্ভ হয়। এই কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পাদন করতেনা পারলে কোন প্রতিষ্ঠান বাজারে তার অবস্থান দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে পারবে না। এই স্তরের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো হলো:

ক) ক্রয়: ক্রয় বিপণনের অন্যতম প্রধান কাজ। প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে ক্রয় কাজ সম্পাদিত হয়। তাই ক্রয়ের পূর্বে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপককে পণ্যের চাহিদা এবং সঠিক সরবরাহের উৎস নির্বাচন করতে হয়। ক্রয় কার্যে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো- ক্রেতার কি চায়, কত পরিমাণ চায় এবং কোন্ সময়ের মধ্যে চায়?

খ) বিক্রয়: বিপণনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো বিক্রয়। বিক্রয়ের পরিমানের উপর প্রতিষ্ঠানের মুনাফা নির্ভর করে। ফলে বিক্রয়ের মাধ্যমে পণ্য স্বত্ব হস্তান্তর করলেই চলে না সেই সাথে পণ্য পরিকল্পনার উন্নয়ন, চাহিদা সৃষ্টি, ক্রেতা সৃষ্টি, বিক্রয়ের শর্তাবলি নির্ধারণ ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজন হয়।

গ) পরিবহন: বণ্টন সংক্রান্ত কার্যাবলির মধ্যে পরিবহন অন্যতম। পরিবহন পণ্যের স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করে। আসলে পরিবহন পণ্যের উৎপাদন স্থান এবং ভোগের স্থানের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করে। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে উৎপাদনে বিশেষায়ন, শ্রমবিভাজন ও বৃহদায়তন উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

ঘ) গুদামজাতকরণ: গুদামজাতকরণের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্যের সময়গত উপযোগ সৃষ্টি করা হয়। চাহিদা ও যোগানের সাথে এবং এক মৌসুমের পণ্য অন্য মৌসুমে ভোগ করার ক্ষেত্রে গুদামজাতকরণ সহায়তা করে থাকে। উৎপাদন এবং ভোগের মধ্যবর্তী সময়ে পণ্য সংরক্ষণে গুদামজাতকরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ঙ) মোড়কিকরণ: পণ্যসামগ্রী সহজে বহনযোগ্য এবং আকর্ষণীয় করার জন্য মোড়কিকরণ প্রয়োজন হয়। এর পরে পণ্যের গুনগত মান বজায় রাখা যায় এবং ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। পণ্যের মান নির্ধারণ এবং শ্রেণীকরণের সাথে মোড়কীকরণ জড়িত। পণ্য হস্তান্তরের সময় মোড়কিকরণ বিশেষ ভূমিকা রাখে।

চ) মান নির্ধারণ/প্রমিতকরণ: পণ্যদ্রব্যের মৌলিক গুণাবলীর ভিত্তিতে পণ্য বিন্যস্ত করার প্রক্রিয়াকে মান নির্ধারণ বলে। আলুর চিপস্ তৈরী করার জন্য তিন ধরনের আলুর মান নির্ধারণ করা যায়। যেমন ছোট আলু, বড় আলু এবং মধ্যম আলু। ছোট, বড় এবং মধ্যম হলো তিনটি মান।

ছ) শ্রেণীবদ্ধকরণ/পর্যায়িতকরণ: পণ্যের মান অনুযায়ী পুনরায় বিভাজন করে পণ্যকে সাজানোকে শ্রেণীবদ্ধকরণ অথবা পর্যায়িতকরণ বলে। বিভিন্ন ভিত্তিতে পণ্যের মান নির্ধারণ করা যায়, যেমন রং, গন্ধ, ঘনত্ব, গঠন, স্বাদ ইত্যাদি। শ্রেণীবদ্ধকরণ অথবা পর্যায়িতকরণের সময় এগুলোকে ভিত্তি করেই কাজ করতে হয়।

জ) বণ্টন প্রণালি নির্বাচন: উৎপাদনকারীর নিকট থেকে পণ্য কিভাবে ভোক্তাদের হাতে পৌঁছাবে তা নিয়ে বিপণন নির্বাহীকে চিন্তাভাবনা করতে হয়। এখানে প্রণালি নির্বাচন, মধ্যস্থ ব্যবসায়ী, সরবরাহকারী ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বণ্টনকারীদের সহযোগিতার উপর বিপণনের সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল।

ঝ) অর্থসংস্থান: বিপণন কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য অর্থ সংস্থান প্রয়োজন। উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তার নিকট পণ্য পৌঁছানোর জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। যেমন মজুরী, বেতন, ভাড়া, বীমা এবং কর প্রদান ইত্যাদি কার্যাবলি অর্থসংস্থান ব্যতীত সম্পাদন সম্ভব নয়। তাই অর্থসংস্থানও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

ঞ) ব্র্যান্ডিং: পণ্যের নামকরণ করা, নামকে জনপ্রিয় করা ও নামের প্রসার ঘটানোকে ব্র্যান্ডিং বলে। পণ্যের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ব্র্যান্ডিং। যদি ব্র্যান্ডিংকে জনপ্রিয় করে তোলা যায়, তবে একটি প্রতিষ্ঠান অতি সহজেই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে।

ট) মূল্য নির্ধারণ: বিপণনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মূল্য নির্ধারণ। ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতা এবং প্রতিষ্ঠানের কাল্পনিক মুনাফা অর্জনকে একই সাথে সমন্বয় করা বিপণন নির্বাহীর জন্য খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিযোগীদের মাঝে অবস্থান করে মূল্য নির্ধারণ এবং প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে হয়।

ঠ) বিপণন প্রসার: পণ্যের সংবাদ ভোক্তাদের নিকট যথাসময়ে পৌঁছাতে হবে। এই জন্য বিপণন ব্যবস্থাপনায় নানাবিধ কৌশল রয়েছে। বিজ্ঞাপন, বিক্রয়িকতা, বিক্রয় প্রসার, পাবলিসিটি, সরাসরি বিপণন অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পণ্য সংক্রান্ত তথ্য ভোক্তাদের নিকট পৌঁছানো যায়। সঠিক বিপণন প্রসার একটি প্রতিষ্ঠানকে সফলতা এনে দিতে পারে।

ড) ঝুঁকি গ্রহণ: বাজারজাতকরণে বিভিন্ন ধরনের অনিশ্চয়তা রয়েছে এবং সেগুলো থেকে ঝুঁকির সৃষ্টি হয়ে থাকে। সময়গত বিষয়, স্থানগত বিষয়, মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি, আইনগত বিষয় ইত্যাদি ঝুঁকির সৃষ্টি করতে পারে। বিপণন এই সকল ঝুঁকি মোকাবেলা করে থাকে। পণ্য উৎপাদন থেকে ভোক্তা সন্তুষ্টি পর্যন্ত যতপ্রকার ঝুঁকি রয়েছে, বিপণন সেসব ঝুঁকি মোকাবেলা করতে প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করে।

ঢ) বাজার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ: পণ্যের বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার তথ্য সংগ্রহ করাও বিপণনের কাজ। ব্যবসায়ের পলিসি প্রণয়ন ও পরিচালনার জন্য বাজার সংক্রান্ত তথ্যের প্রয়োজন। বাজারে কি ঘটছে, চাহিদা ও সরবরাহের পরিস্থিতি কিরূপ, মূল্যের উত্থান-পতন, প্রতিযোগিতার ধরন, ফ্যাশন ও স্টাইলের বর্তমান অবস্থা, ভোক্তাদের রুচি ও পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি বিষয়ক খবর সংগ্রহ করে ব্যবসায়ীরা নিজেদের ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের রূপরেখা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে।

ত) বিক্রয়োত্তর কার্যাবলি: পণ্য বিক্রয় করলেই বিপণনের কাজ সমাপ্ত হয় না। পণ্য বিক্রয়ের পরও বিপণনের অনেক কাজ থাকে। বিক্রয় পরবর্তী কার্যাবলিসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

ক) বিক্রয়োত্তর সেবা: পণ্যের ধরণ অনুযায়ী বিক্রয়োত্তর সেবা দেওয়া প্রয়োজন। পণ্যের জন্য যে গ্যারান্টি ও ওয়ারেন্টি রয়েছে তা সময়মত প্রতিপালন করা, পণ্য পৌঁছে দেয়া অথবা যথাযথ মেরামত করা ইত্যাদি কাজগুলো সময়মত করা বিপণনের কাজের আওতাভুক্ত।

খ) ভোক্তার সন্তুষ্টি পরিমাপ: পণ্য সম্পর্কে ভোক্তাদের মতামত কী সেটা জানা প্রয়োজন। কারণ ভোক্তাদের ধরে রাখার জন্য তাদের চাহিদা, তাদের অভিযোগ এবং পণ্য সম্পর্কে তাদের মতামতকে মূল্যায়ন করতে হবে এবং সেই ভাবে বিপণন প্রোগ্রামসমূহ পরিবর্তন অথবা সমন্বয় করতে হবে।

গ) নতুন পণ্য উন্নয়ন: পণ্য উৎপাদনের পর বাজার প্রতিযোগিতার কথা চিন্তা করতে হয়। নতুন পণ্য অফারের মাধ্যমে প্রতিযোগীরা বাজার দখল করতে পারে। তাই পণ্যের নতুন ব্যবহার, পণ্যের উন্নয়ন এবং পণ্য ব্যবহারে ক্রেতাদের উদ্ভুদ্ধ করা বিপণনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

ঘ) বিপণন নিয়ন্ত্রণ: পরিকল্পনা অনুযায়ী বিপণনের সকল বিষয় সম্পাদিত হচ্ছে কিনা সেটা পর্যবেক্ষণ করা দরকার। অতিরিক্ত উৎপাদন এবং বিক্রয় যেমন ঠিক নয়, তেমনি কম উৎপাদন এবং বিক্রয়ও যথার্থ নয়। প্রয়োজন হলো কাম্য উৎপাদন এবং বিক্রয়। আর সেই কারণে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিপণনের প্রোগ্রামসমূহ কাম্য অবস্থায় রাখা যায়।

ক্রয় ও বিক্রয় (Buying and Selling)

ক্রয়ের সংজ্ঞা

সাধারণ অর্থে, একটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ‘ক্রয়’ হলো ভোক্তার চাহিদা পূরণ করার জন্য সরবরাহকারীর নিকট থেকে প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ। বিপণনের ক্ষেত্রে ক্রয়কার্য কয়েকটি অবশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। সেগুলো হলো(ক) পণ্যের প্রয়োজন নির্ধারণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (খ) সঠিক সরবরাহের উৎস নির্বাচন; (গ) পণ্যের উপযুক্ততা যাচাইকরণ (ঘ) পণ্যের মূল্য, ডেলিভারী ইত্যাদি সংক্রান্ত শর্ত নিরূপণ এবং (ঙ) স্বত্ব হস্তান্তর। পণ্য ক্রয় করার পূর্বে ক্রেতাকে পণ্যের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করতে হয়। তাকে তার প্রয়োজনীয় পণ্যের প্রকার, পরিমাণ ও গুণাগুণ নির্ণয় করে তা সংগ্রহের পন্থা নির্বাচন করতে হয়। ক্রেতাকে যখন নিজের উদ্যোগে সরবরাহের উৎস খুঁজে বের করতে হয় তখন বিরাজমান পরিস্থিতিতে বলা হয় বিক্রেতার বাজার। অপরদিকে, বিক্রেতা পণ্যের উৎস সম্পর্কে ক্রেতাদের জানানোর জন্য সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করলে তখন তা ক্রেতারবাজার নামে অভিহিত হয়। পণ্যের উৎস নির্বাচনের পর ক্রেতাকে তার প্রয়োজনের সাথে সংগতি রেখে পণ্যের উপযোগিতা যাচাই করে দেখতে হয়। ক্রয় কার্যের সর্বশেষ ধাপ হলো পণ্যের মূল্য ও বিক্রয় শর্তাদি নিরূপন।

বিক্রয়ের সংজ্ঞা

বিক্রয়বিপণনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য। বিক্রয় কার্য শুধু পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তরের সাথেই জড়িত নয়; চাহিদা সৃষ্টি, ক্রেতা অনুসন্ধান, ক্রেতার প্রয়োজনের সাথে বিক্রেতার পণ্যের সামঞ্জস্য বিধান এবং বিক্রয় সংক্রান্ত শর্তাদি নিরূপণ এর অন্তর্ভুক্ত। বিক্রেতা ক্রেতার অবচেতন মনে পণ্যের সুপ্ত প্রয়োজনীয়তা উদ্দীপ্ত করে তোলে ও সক্রিয় চাহিদার সৃষ্টি করে। চাহিদা সৃষ্টির জন্য সে বিভিন্ন প্রসার মাধ্যম ব্যবহার করে (যেমন বিজ্ঞাপন বিক্রয় প্রসার, ব্যক্তিক বিক্রয় ও জনসংযোগ)। চূড়ান্ত বিক্রয়কার্য সম্পাদনের জন্য চাহিদা সৃষ্টিই যথেষ্ট নয়, পণ্য ক্রয়ের জন্য কান্ডিত ক্রেতাও খুঁজে বের করতে হয়। ক্রেতা অনুসন্ধানের জন্য বিক্রেতা বিক্রয়কর্মী নিয়োগ করে, সম্ভাব্য ক্রেতার নিকট পণ্য তালিকা প্রেরণ করে, টেলিফোনে যোগাযোগ করে, পাইকারী বা খুচরা দোকানে পণ্য সরবরাহ করে, পরিবেশক নিয়োগকরে এবং আকর্ষণীয় পণ্য সজ্জার ব্যবস্থা করে। ক্রেতা অনুসন্ধান করার পর বিক্রেতা ক্রেতার প্রয়োজনের সাথে নিজের পণ্য খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য বাজার গবেষণা, বিক্রয় পর্যবেক্ষণ এবং বিক্রয়কর্মী ও অন্যান্যদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ক্রেতার পছন্দ-অপছন্দ নির্ণয় করে। ক্রেতাদের সর্বাধিক সন্তুষ্টি বিধান করে অব্যাহত সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য তাদের চাহিদা ও পছন্দ-অপছন্দের সাথে পণ্যের ডিজাইন, আকার, রং, মডেল ও প্যাকিং-এর সামঞ্জস্যবিধান অপরিহার্য। বিক্রেতা বিক্রয়ের শর্তাদিও নিরূপন করে। মূল্য পরিশোধের সময়, পরিশোধের নিয়ম, বাট্টা বা কমিশনের হার, পণ্য ডেলিভারীর তারিখ, প্রদেয় মূল্য ইত্যাদি সম্পর্কিত শর্তাবলি ঠিকঠাক হওয়ার পর বিক্রেতার নিকট থেকে ক্রেতার নিকট পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়।

পরিবহনের ধারণা (Concept of Transportation)

যেখানে পণ্য উৎপাদিত হয় সেখান থেকে যে স্থানে পণ্য ভোগ হয় সে স্থানে পণ্য স্থানান্তর করে পরিবহন স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করে। পরিবহন বিপণনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা বাজারের পরিধি স্থানীয় এলাকা থেকে দূর অঞ্চলে সম্প্রসারিত করে, জাতীয় বাজারের সমপ্রসারণ ঘটিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবশের সুযোগ করে দেয়, ভোক্তাদের পণ্য ভোগে বৈচিত্র্য আনয়ন করে, বিপণন ব্যয় হ্রাস করে এবং পণ্যের হস্তান্তর দ্রুত করে। উন্নত পরিবহন প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য পণ্য উৎপাদনে বিশেষায়িত হওয়ার পথ প্রশস্ত করে যা আন্তঃআঞ্চলিক উন্নয়নে ভারসাম্য সৃষ্টির সহায়ক। উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে দূরত্ব যত বেশি হবে পরিবহনের গুরুত্বও তত বৃদ্ধি পাবে। উৎপাদন কেন্দ্রে পণ্য প্রেরণের জন্য বিভিন্ন প্রকার পরিবহন ব্যবহৃত হয়, যথা (ক) স্থল পরিবহন (রেল ও সড়ক পথ), (খ) জল পরিবহন (নৌপথ ও সামুদ্রিক পথ) এবং (গ) বিমান পরিবহন। বিমান পরিবহন খুবই ব্যয়সাধ্য বলে পণ্য পরিবহনে স্থল এবং জল পথই সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়।

গুদামজাতকরণের ধারণা (Concept of Warehousing)

সভ্যতার বিকাশ ঘটানোর সাথে সাথে পণ্য উৎপাদনে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটল। আর এ সাথে প্রয়োজন দেখা দিল পণ্যদ্রব্য সংরক্ষণের। প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদিত পণ্য ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটানো ও নষ্ট হবার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য গুদামজাতকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। গুদামজাতকরণ (বা পণ্য সংরক্ষণ) বিপণনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পণ্য উৎপাদনের পর ব্যবহার হওয়া পর্যন্ত মজুদ করে গুদামজাতকরণ সময়গত উপযোগ সৃষ্টি করে।

বিপণনের প্রায় প্রত্যেক পর্যায়েই পণ্য সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। পণ্যের উৎপাদন ও চূড়ান্ত বিক্রয়ের মধ্যবর্তী সময়ে সঠিক অবস্থায় পণ্য নিরাপদে রাখাকেই সংরক্ষণ বলা যায়। সংরক্ষণ কার্য বন্টন প্রণালির প্রায় সর্বস্তরেই সম্পাদিত হয়ে থাকে। উৎপাদক যেমন তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত নিজের কাছে রেখে দেয়, ঠিক অনুরূপভাবে পরিবহন এজেন্সী, পণ্যাগার কর্তৃপক্ষ এবং পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ীদের মতো অন্যান্য মধ্যস্থব্যবসায়ীগণও পণ্য সংরক্ষণ করে থাকে।

যেসব পণ্যের চাহিদা সারা বছরব্যাপী লেগে থাকে অথচ উৎপাদিত হয় একটি বিশেষ মৌসুমে, সেগুলোকে বছরব্যাপী চাহিদা মেটানোর জন্য সংরক্ষণ করে রাখতে হয়। কৃষিপণ্যের বিপণনে তাই গুদামজাতকরণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কৃষিপণ্যের উৎপাদনেই মৌসুমি প্রভাব সর্বাধিক অনুভূত হয়। অবশ্য কতিপয় পণ্য আছে যেগুলোর উৎপাদন মৌসুমিভিত্তিক না হলেও এদের পরিবহন ব্যবস্থা মৌসুমিভিত্তিক হওয়ায় সেগুলো সংরক্ষণ করে রাখতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, আকরিক লৌহ, কয়লা ও কাঠ সাধারণত নদীপথে পরিবাহিত হয়। খরার সময় নদীর পানি শুকিয়ে গেলে বা কমে গেলে নৌ-চলাচল সম্ভব হয় না। এসব পণ্যের পরিবহনে পানির প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করতে হয়। তাই যতদিন খরার প্রাদুর্ভাব থাকে, ততদিন এগুলো মজুদ করে রাখার প্রয়োজন হয়। বরফ, ঠান্ডা পানীয়, উলের মোজা ইত্যাদি অনিয়মিত চাহিদাবিশিষ্ট পণ্যের উৎপাদন নিয়মিত রাখার জন্যও গুদামজাতকরণের দরকার। ডিম, গোল আলু, মাছ, মাংস, দুধ, সজী ইত্যাদি পচনশীল পণ্যের অবক্ষয় রোধ করার জন্য সংরক্ষণ সুবিধার প্রয়োজন। পণ্য ডেলিভারীর অনিশ্চয়তা পরিহার করে উৎপাদন বা চাহিদা অব্যাহত রাখার জন্য অনেক পণ্য গুদামজাত করে রাখতে হয়। সাধারণত পণ্যের সংরক্ষণ কার্য উৎপাদক, পাইকার, খুচরা ব্যবসায়ী, পণ্যগার সংস্থা ইত্যাদি কর্তৃক সম্পাদিত হয়।

প্রমিতকরণের সংজ্ঞা (Concept of Standardization)

ইংরেজি ‘Standardization’ শব্দটির আভিধানিক অর্থ প্রমিতকরণ বা মান নির্ধারণ। মান বা (standard) শব্দটি থেকে মান নির্ধারণ কথাটির উৎপত্তি। ‘মান’ হলো যেকোন কিছু গুণাগুণের (Quality) একটি পরিমাপ। এর মধ্যে নিহিত থাকে সমরূপতার (Uniformity) ধারণা। বিপণন শাস্ত্রে মান বলতে কোন দ্রব্যের বাহ্যিক বা নৈসর্গিক মানকে (Physical) বুঝায়। যেকোন পণ্যদ্রব্যের ওজন, আকার, মজবুতি, রং বা বর্ণ, স্থায়িত্ব, অবয়ব বা অন্যান্য বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য মান-এর অন্তর্ভুক্ত। প্রমিতকরণ স্ট্যান্ডার্ড বা মানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। প্রমিতকরণ হচ্ছে কতিপয় নির্ণায়ক (Criteria) নির্ধারণ করা, যার সাথে পণ্যদ্রব্যের হুবহু মিল থাকবে। আর বাহ্যিক মানসমূহই হলো নির্ণায়ক। যখন কোন একটি পণ্য প্রমিতকরণ করা হয়, তখন এ দ্বারা বুঝানো হয় যে নির্দিষ্ট মানের সাথে পণ্যের সাদৃশ্য রয়েছে। আরও সোজা কথায় বলা যায়, পণ্যের সুনির্দিষ্ট মান স্থির করাই হচ্ছে মান নির্ধারণ বা প্রমিতকরণ। পণ্যদ্রব্যের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মান নির্ধারণ করা হয়। সুনির্দিষ্ট মান স্থির করার পর পণ্যদ্রব্য পরীক্ষিত করা হয়।

বিপণন কার্যে দক্ষতা আনয়ন ও বিক্রয় কার্যে গতিশীলতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পণ্যসামগ্রীর কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে পণ্যের মান নির্ধারণ করা হয়। মান নির্ধারণকে প্রমিতকরণও বলা হয়। প্রতিষ্ঠিত মান অনুসারে পণ্যসামগ্রীকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করার নাম পরীক্ষিতকরণ। ক্রেতা ও ভোক্তার নিকট প্রমিতকরণ ও পরীক্ষিতকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পণ্য সুনির্দিষ্ট মান অনুযায়ী পরীক্ষিত হলে ক্রেতার একই মানের পণ্য বিনা পরিদর্শনে বারবার ক্রয় করতে পারে। এতে তাদের অর্থ, সময় ও শক্তির অপচয় রোধ হয়। প্রমিতকরণ অর্থসংস্থানও সহজতর করে, কারণ ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহ পরীক্ষিত পণ্যের বিপরীতে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে থাকে। পরীক্ষিত পণ্যের গুণাগুণ জানা থাকে বলে ঝুঁকি হ্রাস পায়।

পরীক্ষিতকরণের সংজ্ঞা (Concept of Grading)

প্রমিতকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কতিপয় মান স্থির করা হয়। প্রতিষ্ঠিত মানসমূহকে ‘গ্রেড’ বলা হয়। এসব মান বা গ্রেডের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার কৃষিপণ্য ও শিল্পজাত পণ্যকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। একইরূপ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পণ্যদ্রব্যের শ্রেণী বিভাজন প্রক্রিয়াকে বলা হয় পরীক্ষিতকরণ। পূর্ব-নির্ধারিত মান পরীক্ষিতকরণের মূল ভিত্তি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পরীক্ষিতকরণ ও প্রমিতকরণ একটি অপরটির সাথে জড়িত- একটির ছাড়া অপরটি অচল। প্রমিতকরণ ব্যতীত পরীক্ষিতকরণ অর্থহীন, তেমনি পরীক্ষিতকরণ ব্যতীত প্রমিতকরণ বা মান নির্ধারণ সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। একইরূপ গুণাগুণ সম্পন্ন পণ্যের কোন মানের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে তা নির্ণয় করার একটি পন্থা হলো পণ্যের পরীক্ষিতকরণ। উদাহরণস্বরূপ, আলু ব্যবসায়ী আলুকে চাষের উৎপত্তি স্থান বা আকার অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারে।

মোড়কিকরণের সংজ্ঞা (Definition of Packaging)

সাধারণ অর্থে, মোড়কিকরণ হলো পণ্যকে বিপণনযোগ্য করার জন্য প্যাকিং বা মোড়ক-বঁধাই করার কাজ। শিল্পজাত পণ্যের ক্ষেত্রে মোড়ক-বঁধাই অধিক প্রয়োজনীয়। কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে পাস্তুরিত দুধ, মাছ-মাংস ইত্যাদি প্যাকিং করে প্রক্রিয়াজাতের পর) বিক্রয় করা হয়। কেবলমাত্র বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষার জন্য পণ্য প্যাকিং করা হয় না, পণ্যকে ভোক্তা বা ব্যবহারকারীর নিকট আকর্ষণীয় করে তোলাও মোড়কিকরণের অন্যতম উদ্দেশ্য। সুতরাং, মোড়কিকরণ হলো পণ্যের নির্দিষ্টমান সংরক্ষণ, পরিবহন ও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পণ্যের মোড়ক নির্ধারণ, নক্সাকরণ, উন্নয়ন ও পণ্যের গায়ে লাগানোর সাথে জড়িত সকল কাজের সমষ্টি।

পণ্য বিপণনে মোড়কিকরণের গুরুত্ব

- মোড়কিকরণের মাধ্যমে পণ্যের মান ও গুণগত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়।
- পণ্যের মোড়কিকরণ করা থাকলে প্রতিকূল আবহাওয়া, চুরি, অবহেলাজনিত নষ্ট ইত্যাদি সমস্যা থেকে পণ্যকে রক্ষা করা যায়।
- পণ্যের আকর্ষণীয় নকশা, রং, ছবি ইত্যাদির মাধ্যমে ক্রেতা ও ভোক্তাকে আকর্ষণ করা যায় ও সহজে সনাক্ত করা যায়।
- মোড়কে পণ্যের সকল প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া থাকে; যেমন পণ্যের ওজন, উপকরণ, ব্যবহার বিধি, উৎপাদনকাল ইত্যাদি। এরফলে ক্রেতা ও ভোক্তা পণ্য সম্পর্কে সহজে জানতে পারে।
- পণ্য মোড়কিকরণের ফলে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে পণ্য পরিবহন করা সহজ হয়।

বিজ্ঞাপনের সংজ্ঞা (Definition of Marketing)

বিজ্ঞাপন পণ্য ও সেবার বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য মূলত ব্যবহৃত হয়। পণ্য ও সেবা সম্পর্কিত তথ্য জনগণের নিকট পৌঁছানো, প্রতিষ্ঠানকে জনগণের নিকট পরিচিত করিয়ে দেয়া এবং এসবের মাধ্যমে গ্রাহক সৃষ্টি করা হ'লো বিজ্ঞাপনের আসল কাজ। পণ্য উৎপাদন করলেই উৎপাদনকারীর কাজ শেষ হয়ে যায় না। উৎপাদিত পণ্য জনগণের নিকট বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে পণ্য সম্পর্কিত খবরা-খবর তাদের নিকট পৌঁছানো প্রয়োজন। জনগণ যখন পণ্য সম্পর্কে জানতে পারবে তখনই তাদের মধ্যে পণ্য ক্রয়-ইচ্ছা জাগবে। ক্রয়-ইচ্ছা জাগলে জনসাধারণের মধ্যে সম্ভাব্য-ক্রেতার সৃষ্টি হয়। জনগণকে সম্ভাব্য ক্রেতায় এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদেরকে প্রকৃত ক্রেতায় রূপান্তরিত করার জন্য তথ্যপূর্ণ আকর্ষণীয় ভাষা সম্বলিত বিজ্ঞাপন ব্যবহার করা হয়। যুগ যুগ ধরে এভাবেই বিজ্ঞাপন নতুন পণ্যের বাজার সৃষ্টি করে আসছে এবং বিদ্যমান পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত করে শিল্প-জগতের প্রাণচাঞ্চল্য বজায় রাখছে।

সাধারণভাবে বলা যায়, পণ্যের প্রতি জনগণকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষ পণ্যের গুণাগুণ, উপযোগিতা, কার্যকারিতা, ব্যবহার-বিধি বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য জনসাধারণের সামনে বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে তুলে ধরলে তা বিজ্ঞাপন নামে পরিচিত হয়। বিজ্ঞাপন বিপণন প্রসারের ক্ষেত্রে এমন একটি কৌশল যার সাহায্যে উৎপাদিত পণ্য সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার মাধ্যমে তাদেরকে উক্ত পণ্য ক্রয়ে প্ররোচিত করা হয়। সোজা কথায়, বিজ্ঞাপন হলো যথাসম্ভব ন্যূনতম ব্যয়ে ও স্বল্পতম সময়ে অজানা সংখ্যক লোককে কোন পণ্য বা সেবা সম্পর্কে কিছু জানানো। বিজ্ঞাপন চাহিদা সৃষ্টির প্রধান পদ্ধতি। এর সাহায্যে জনগণকে পণ্য ও সেবা সম্পর্কে অবহিত করা হয়, তাদের মধ্যে ক্রয়ের ইচ্ছা গিয়ে তোলা হয় এবং পরোক্ষভাবে তাদের সামনে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি তুলে ধরা হয়।

পণ্য বিপণনে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব

- বিজ্ঞাপন নতুন নতুন ক্রেতার সৃষ্টি করে।
- বিজ্ঞাপন পণ্য ও সেবার চাহিদা সৃষ্টিতে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে।
- আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পণ্য ও সেবার চাহিদা সৃষ্টি করা যায়।
- বিজ্ঞাপন নতুন উৎপাদিত পণ্য বাজারে ছাড়ার সংবাদ পরিবেশন করে। ফলে ভোক্তারা নতুন পণ্য কিনতে আগ্রহী হয়।
- বিজ্ঞাপন বিভিন্ন প্রকার পণ্যের পাইকারি বা খুচরা মূল্য প্রচার করে যাতে ক্রেতার কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে পণ্য ক্রয় করতে পার।
- বিজ্ঞাপন ক্রেতাকে পণ্য ক্রয়ে প্ররোচিত করে; ফলে বিক্রয় বৃদ্ধি পায়।
- বিজ্ঞাপনের অন্যতম কাজ হলো বিবিধ প্রকার কলা-কৌশলের মাধ্যমে জনগণকে পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট করে বিক্রির পরিমাণ বৃদ্ধি করা।
- বিজ্ঞাপন প্রতিযোগিতা মোকাবেলায় প্রত্যক্ষ সাহায্যতা করে।

অনুশীলনী:

লিয়াকত সাহেব একজন আম ব্যবসায়ী। তিনি মহাজনদের মাধ্যমে গ্রাম ও হাট-বাজার থেকে আম সংগ্রহ করে কোনো প্রকার গ্রেডিং না করেই জুস ফ্যাক্টরিতে সরবরাহ করেন। এতে করে তিনি আয়ের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন।

ক. পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের কাজকে কী বলে?

খ. গুদামজাতকরণের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করুন।

গ. লিয়াকত সাহেবের আম সংগ্রহ বিপণনের কোন কাজের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. লিয়াকত সাহেবের আমের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে কী করণীয় বলে আপনি মনে করেন।

বাজার সম্পর্কিত ধারণা (Concept of Market)

‘বাজার’ শব্দটির অনেক অর্থ রয়েছে। অনেক সময় বাজার বলতে এমন একটি নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝানো হয় যেখানে পণ্যসামগ্রী বেচা-কেনা হয়। কোনো কোনো সময় একটি নির্দিষ্ট পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহের সম্পর্ককে বাজার হিসেবে অভিহিত করা হয়। কোন কিছু বিক্রয় করার কাজকেও ‘বাজার’ নামে চিহ্নিত করতে দেখা যায়। অর্থনীতিবিদদের মতে বাজার হলো ক্রেতা ও বিক্রেতার সমষ্টি। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পারস্পরিক দর কষাকষি ও সমঝোতার মাধ্যমে পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় এবং সেই মূল্যে লেনদেন সম্পন্ন হয়। আর বিপণনের পরিভাষায়, বাজার বলতে জনগণের একটি সমষ্টিকে বোঝায় যাদের ব্যক্তি হিসেবে কিংবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পণ্যসামগ্রীর প্রয়োজন থাকে এবং সেই সামগ্রী ক্রয়ের সামর্থ্য, ইচ্ছা ও কর্তৃত্ব থাকে।

ফিলিপ কটলার ও গ্যারী আর্মস্ট্রং এর মতে, বাজার হলো কোন একটি পণ্য বা সেবার প্রকৃত ও সম্ভাব্য ক্রেতাদের সমষ্টি।

অধ্যাপক স্কিনার এর মতে, বাজার হচ্ছে একদল জনগণ যাদের নির্দিষ্ট পণ্যের প্রয়োজন ও অভাব রয়েছে এবং পণ্যটি ক্রয়ের ক্ষমতা, ইচ্ছা ও কর্তৃত্ব রয়েছে।

জনগণের সমষ্টিকে বাজার নামে অভিহিত করতে হলে সেই জনসমষ্টিকে অবশ্যই নিম্নের চারটি শর্ত পূরণ করতে হবে:

১. জনসমষ্টির মধ্যে অবশ্যই পণ্যের চাহিদা থাকতে হবে। চাহিদা না থাকলে অর্থাৎ জনসমষ্টির পণ্যের প্রয়োজন না হলে তাদেরকে ‘বাজার’-এর পর্যায়ভুক্ত করা যাবে না।

২. জনসমষ্টির পণ্য ক্রয় করার অবশ্যই সামর্থ্য থাকতে হবে।

৩. জনসমষ্টির শুধুমাত্র আর্থিক সংগতি থাকলেই চলবে না, পণ্য ক্রয়ের ইচ্ছা থাকলেই জনসমষ্টিকে ‘বাজার’-এর পর্যায়ভুক্ত করা যাবে।

৪. নির্দিষ্ট পণ্য ক্রয়ের জন্য সমষ্টিবদ্ধ লোকদের কর্তৃত্ব থাকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি প্রতিষ্ঠানের ক্যাশিয়ারের নিকট টাকা আছে, তার একটি বিশেষ পণ্য কেনার প্রয়োজন এবং ইচ্ছাও রয়েছে কিন্তু যেহেতু জেনারেল ম্যানেজারের হাতেই শুধু পণ্য কেনার কর্তৃত্ব নিহিত, সেহেতু ক্যাশিয়ার ‘বাজার’ সৃষ্টির উপাদান হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

ভোক্তাবাজার-এর সংজ্ঞা (Customer Market)

যেসব ক্রেতা শুধুই ভোগ করার উদ্দেশ্যে পণ্য ক্রয় করে তাদের সমন্বয়ে ভোক্তা বাজারের সৃষ্টি হয়। ভোক্তা বাজারের গ্রাহকগণ কখনই ক্রীত পণ্য পুনরায় বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করার জন্য পণ্য ক্রয় করে না বরং পণ্যের উপযোগ ভোগ করা কিংবা পণ্য থেকে উপকার পাওয়ার উদ্দেশ্যেই তারা পণ্য ক্রয় করে।

সমাজের প্রত্যেকেই বহু ধরনের ভোক্তাবাজারের সাথে সংযুক্ত। নিজের ব্যবহারের জন্য বা পরিবারের সদস্যদের ব্যবহারের জন্য পণ্য ক্রয় করা হলে ক্রেতা সেই পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ভোক্তা বাজারের গ্রাহক হিসেবে চিহ্নিত হয়। সমাজে বসবাসরত ব্যক্তিদের ক্রয়ক্ষমতা এবং জনসংখ্যা যত বাড়তে থাকে, ভোক্তা বাজারসমূহের সংখ্যা এবং আয়তনও ততই সম্প্রসারিত হতে থাকে। বাংলাদেশের ভোক্তাবাজার প্রায় ১৮ কোটি লোক নিয়ে গঠিত। ভারতের ভোক্তাবাজারে রয়েছে প্রায় ১৩০ কোটি লোক। তেমনি আমেরিকার ভোক্তা বাজারে মোট ভোক্তার সংখ্যা প্রায় ৩২৫ মিলিয়ন। শুধু দেশের ভিতরে নয়, সারা বিশ্বেই ভোক্তাদের বয়স, আয়, শিক্ষা ও পছন্দের মধ্যে প্রচুর ভিন্নতা রয়েছে। তারা বিভিন্ন রকমের বৈচিত্র্যপূর্ণ পণ্য ও সেবা ক্রয় করে। তাই ভোক্তা বাজারে ভোক্তাদের ক্রয়-আচরণে অভূতপূর্ব বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

ফিলিপ কটলার ও গ্যারী আর্মস্ট্রং এর মতে, ভোক্তাবাজার হলো সেইসব ব্যক্তি এবং বাসগৃহে বসবাসকারীদের নিয়ে গঠিত যারা পণ্য বা সেবা ক্রয় করে ব্যক্তিগত ভোগের জন্য।

অধ্যাপক স্কিনার এর মতে, ভোক্তা বাজারে ক্রেতাদল বা গৃহে বসবাসকারী ব্যক্তির জড়িত যারা ক্রয়কৃত পণ্য ভোগ করা বা এর সুবিধা নেয়ার জন্য পরিকল্পনা করে এবং যারা মুনাফার উদ্দেশ্যে পণ্য ক্রয় করে না।

শিল্প বাজার-এর সংজ্ঞা (Industrial Market)

প্রকৃতি প্রদত্ত সকল সম্পদকে মানুষের ভোগ বা ব্যবহারোপযোগী করার জন্য প্রক্রিয়াকরণ করতে হয়। প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে গড়ে উঠেছে নানা ধরনের শিল্প কারখানা। শিল্প-কারখানা তাদের কার্যক্রম চালু রাখার জন্য কাঁচামাল, যন্ত্রপাতিসহ যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে। শিল্প-কারখানার ক্রয়ের কারণে বাজারে বিভিন্ন পণ্যের বিরাট চাহিদা সৃষ্টি হয়। শিল্প-কারখানার চাহিদা বা ক্রয়ের উপর ভিত্তি করেই শিল্প-বাজার গড়ে উঠেছে। কাজেই শিল্পবাজার হচ্ছে, পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ বা নতুন পণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে শিল্প-কারখানার যাবতীয় ক্রয়।

শিল্পবাজার বলতে এমন কতিপয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সমষ্টিকে বোঝায় যারা উৎপাদনে ব্যবহারের জন্য পণ্য ক্রয় করে। সহজ অর্থে, যারা একটি নতুন দ্রব্য তৈরি করে বিক্রয় করার জন্য অন্যের নিকট থেকে বিশেষ ধরনের কাঁচামাল বা অন্যরূপ সামগ্রী ক্রয় করে, তাদেরকে নিয়েই শিল্পবাজারের সৃষ্টি হয়। শিল্পবাজারে শুধুমাত্র শিল্পপণ্য (Industrail Goods) ক্রয়বিক্রয় হয়। শিল্পবাজারকে তাই উৎপাদকের বাজারও (Producers Market) বলা যায়।

ফিলিপ কটলার ও গ্যারী আর্মস্ট্রং এর মতে, অন্য পণ্য বা সেবা উৎপাদন করে বিক্রয়, ভাড়া প্রদান বা অন্যদের নিকটসরবরাহ করার লক্ষ্যে পণ্য ও সেবা ক্রয়কারী সংগঠনগুলো নিয়ে ব্যবসায় বাজার গঠিত।

অধ্যাপক স্কিনার এর মতে, পুনঃবিক্রয়, অন্য পণ্য উৎপাদনে সরাসরি ব্যবহার বা নিত্যদিনের জন্য কাজে ব্যবহারের জন্য পণ্য ক্রয়ের সাথে জড়িত ব্যক্তি বা দল ব্যবসায় বাজারের অন্তর্ভুক্ত।

উপরের সংজ্ঞা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যেসব পণ্য অন্যের নিকট বিক্রি করা বা ভাড়া দেয়া বা সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে বা নতুন পণ্য তৈরি করার জন্য ক্রয় করা হয়, সেসব পণ্যের প্রস্তুতকারকরাই শিল্পবাজারের সৃষ্টিকারক। এরা ব্যক্তি বিশেষও হতে পারে কিংবা কোন সংস্থাও হতে পারে। যেমন কৃষি, বন ও মৎস্য শিল্প, খনিজ শিল্প, নির্মাণ শিল্প, পরিবহন ও যোগাযোগ, পাবলিক ইউটিলিটি, ব্যাংকিং, ফাইন্যান্স, বীমা ও সেবা শিল্প ইত্যাদি।

বাজার বিভক্তিকরণের সংজ্ঞা (Market Segmentation)

পণ্যের বাজারে শুধুমাত্র একই ধরনের ভোক্তা থাকে না, এখানে বিভিন্ন শ্রেণির ভোক্তার সমাহার ঘটে। ভোক্তার শ্রেণিগত পার্থক্য পণ্যের ব্যবহারের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণস্বরূপ, অধিক আয়বিশিষ্ট ভোক্তারা যেসব পণ্য অধিক পরিমাণে ক্রয় করতে আগ্রহী হয়, স্বল্প আয়বিশিষ্ট ভোক্তারা সেসব পণ্য ক্রয়ে আগ্রহী নাও হতে পারে। অনুরূপভাবে, তরুণ বয়সের ভোক্তাদের নিকট যে জিনিস অধিকতর পছন্দনীয় হবে, বার্ধক্যের কোঠায় উপনীত ভোক্তাদের নিকট সে জিনিস পছন্দ না-ও হতে পারে। তাই স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বাজারে বিচিত্র রকমের ভোক্তা থাকতে পারে এবং তাদের পছন্দ-অপছন্দ, রুচি, ফ্যাশন প্রবণতা ইত্যাদিও বিভিন্ন রকম হতে পারে। ভোক্তাদের মধ্যে এরূপ বিভিন্নতা দেখা যায় বলে বর্তমান যুগে গোটা বাজারকে কয়েকটি উপবাজারে বিভক্ত করে ভোক্তাদের শ্রেণিবৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পণ্য বাজারজাতকরণের প্রচেষ্টা চালানো হয়। সাধারণত ভোক্তাদেরকে তাদের বয়স, কিংবা আয় অথবা অন্য যেকোন সমজাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেকটি ভাগ এক একটি উপ-বাজার বা বাজার-অংশ নামে পরিচিত।

সম্পূর্ণ বাজারকে এভাবে উপ-বাজার বা উপবিভাগে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে বাজার বিভক্তিকরণ বা বাজার বিভাজন বলে। অর্থাৎ গ্রাহকদের বিভিন্ন প্রয়োজন, বৈশিষ্ট্য এবং আচরণের উপর ভিত্তি করে তাদেরকে শ্রেণিবিন্যাস করার প্রক্রিয়া বাজার বিভক্তিকরণ নামে পরিচিত।

আমরা আমাদের চারদিকেই বাজার বিভাজনের নমুনা অহরহ দেখতে পাই। প্যাকেট করা খাদ্যসামগ্রী, প্রসাধনী দ্রব্য, সাবান, ঠান্ডা পানীয় ইত্যাদি পণ্যের উৎপাদকগণ সর্বদাই বাজার বিভক্তিকরণ কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। কোকাকোলা কোম্পানি এককালে বাজার একীকরণ (Market Aggregation)-এর জোর প্রবক্তা ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বাজার পরিস্থিতির সাথে তাল মিলাতে গিয়ে কোকাকোলা কোম্পানি বোতলের আকারে পরিবর্তন ঘটিয়ে বাজার বিভাজনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

বাজার বিভক্তিকরণের ফলে যে ছোট ছোট অংশে মোট বাজার বিভক্ত হয়, তাদের একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রতিটি উপবাজারে সমজাতীয় বা একই জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিরাজ করে। পরিশেষে বলা যায়, বৈসাদৃশ্যপূর্ণ সামগ্রিক বাজারকে ভোক্তা সমাজের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এবং বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে কতগুলো উপভাগ বা উপ-বাজারে ভাগ করাকেই বাজার বিভক্তিকরণ বলা হয়।

বিভিন্ন উপায়ে একটি প্রতিষ্ঠান বাজার বিভাজন করতে পারে। বাজার বিভাজন বা বিভক্তিকরণের পদ্ধতি পণ্যভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হতে পারে। সাধারণত ভোক্তাবাজার (Customer Market) ও শিল্পবাজার (Industrial Market)-এর জন্য বিভক্তিকরণের ভিত্তি আলাদা রকমের হয়ে থাকে।

১. ভৌগোলিক বিভক্তিকরণ (Geographic Segmentation): এই ধরনের বিভক্তিকরণে বাজারকে বিভিন্ন অঞ্চল (যেমন উত্তরাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল ইত্যাদি), জেলা (যথা ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী ইত্যাদি), শহরের আয়তন প্রভৃতির ভিত্তিতে বিভক্ত করা হয়। এভাবে বাজার বিভক্তিকরণের সময় মনে করা হয় যে, বাজারের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে বাজারের সম্ভাব্যতা (চড়াবহঃরধষষঃ) ও তৎসম্পর্কিত ব্যয় নির্ধারিত হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে সেসব বাজারগুলোই নির্বাচন করা হয় যেগুলোকে ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য সর্বাধিক মুনাফাজনক ধরা হয়। ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিত্তিতে বিভক্ত করার পর কোন প্রতিষ্ঠান এক বা একাধিক বাজারে পণ্য বিপণনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তবে বিপণনকারী প্রত্যেক এলাকার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গ্রাহকদের চাহিদা নির্ধারণ করে।

২. জনসংখ্যাভিত্তিক বিভক্তিকরণ (Demographic Segmentation): এরূপ বিভক্তিকরণের সময় বিভিন্ন প্রকার জনসংখ্যাভিত্তিক উপাদান, যথা বয়স, লিঙ্গ (এবং বর্ণ), পরিবারের আয়তন, আয়, পেশা, পারিবারিক জীবনচক্র, জাতীয়তা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে সমগ্র বাজারকে কয়েকটি অংশে ভাগ করা হয়। সামাজিক শ্রেণীর ভিত্তিতেও বাজার বিভক্তিকরণ হয়। কারণ উচ্চ বিত্তের লোকজন যে সামগ্রী অধিক পরিমাণে ক্রয় করবে, নিম্নবিত্তের লোকদের সে সামগ্রী ক্রয় করার সম্ভাবনা কম। গ্রাহকদের বিভিন্ন গ্রুপকে বিভাজন করার ক্ষেত্রে জনসংখ্যাভিত্তিক উপাদানগুলো খুবই জনপ্রিয়। এর মূল কারণ, জনসংখ্যাভিত্তিক উপাদানের সাথে গ্রাহকদের প্রয়োজন, চাহিদা ও পণ্য-ব্যবহারের হার ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এ ছাড়াও, এ উপাদানগুলো অন্যান্য উপাদানের তুলনায় পরিমাপ করা সহজতর।

৩. মনস্তাত্ত্বিক বিভক্তিকরণ (Psychographic Segmentation): ভোক্তাদের জীবন সম্পর্কিত স্টাইল ও ব্যক্তিত্বের পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে বাজার বিভাজন করা হলে তাকে মনস্তাত্ত্বিক বিভক্তিকরণ বলা হয়। একই জনসংখ্যাভিত্তিক দলভুক্ত লোকদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের মনস্তাত্ত্বিক উপাদান বিরাজ করতে পারে। জীবনবোধ মানুষের ভোগ স্পৃহার উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন কর্মঠ সংসারজীবীর জীবনবোধ ও একজন যাযাবর বা হোটেল-বিলাসীর জীবনবোধ এক নয়। তাই একজন বিক্রেতা ভোক্তাদের জীবনবোধের প্রতি দৃষ্টি রেখে তার জন্য পণ্যের বাজার বিভাজন করতে পারে।

৪. আচরণভিত্তিক বিভক্তিকরণ (Behavioral Segmentation): ক্রেতাদের পণ্য সম্পর্কিত জ্ঞান, মনোভাব ও পণ্যের ব্যবহারের ভিত্তিতে বাজার বিভক্তিকরণ করা হলে তা আচরণভিত্তিক বিভাজন নামে পরিচিত। অনেক বিপণনকারী মনে করেন যে, আচরণমূলক উপাদানসমূহ বাজারের বিভিন্ন অংশ সনাক্ত করার জন্য উৎকৃষ্ট উৎস।

শিল্পবাজার বিভক্তিকরণের ভিত্তিসমূহ

শিল্পবাজার শিল্পপণ্য ব্যবহারকারীদের (Industrial Users) সমন্বয়ে গঠিত। এ ধরনের ব্যবহারকারীদেরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে; তারাও নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা, প্রোগ্রাম, পরিকল্পনা ইত্যাদি অনুসারে ক্রয়কার্য সম্পাদন করে থাকে। তাই শিল্পবাজারকেও কার্যকরভাবে বিভাজন করা যায়। ভোক্তাবাজার ও শিল্পবাজার বিভক্তিকরণের সময় প্রায় ক্ষেত্রে একই ধরনের উপাদান ব্যবহার করা হলেও শিল্পবাজার বিভক্তিকালে কিছু অতিরিক্ত উপাদান বিবেচনা করা হয়। নিম্নলিখিত উপাদানসমূহের উপর ভিত্তি করে শিল্পবাজার বিভক্তিকরণ করা হয়:

উইন্ড ও কারডজো শিল্পবাজার বিভক্তিকরণের জন্য দ্বি-ধাপ পদ্ধতির সুপারিশ করেছেন। প্রথম ধাপে কতিপয় বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে সমষ্টিগত বিভাগসমূহ (Macro Segments) সনাক্ত করতে হবে। বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো:

ক. চূড়ান্ত ব্যবহারের বাজার (End Use market);

খ. পণ্যের ব্যবহার (Product Application);

গ. গ্রাহকের ক্রয়ের পরিমাণ (Purchase Volume);

ঘ. ভৌগোলিক অবস্থান (Geographical Location);

ঙ. পণ্য ব্যবহারের হার (Usage rate) ও

চ. সাংগঠনিক কাঠামো (Organization Structure)

দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে নির্বাচিত সমষ্টিগত বিভাগকে কতিপয় ব্যষ্টিক বিভাগে বিভক্ত করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে বিবেচ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

ক. ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য;

খ. পণ্যের অনুভূত গুরুত্ব (Perceived Product Importance);

গ. সরবরাহকারীর প্রতি মনোভাব (Attitude Towards Suppliers);

ঘ. ভৌগোলিক অবস্থান (Geographical Location);

ঙ. ক্রয়-সিদ্ধান্ত নির্ণায়ক (Buying decision criteria) ইত্যাদি।

কার্যকরভাবে বাজার বিভক্তিকরণের বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিচে কার্যকর বাজার বিভক্তিকরণের শর্তগুলো আলোচনা করা হলো:

১. উপাদানের পরিমাপযোগ্যতা (Measurability of Elements): বাজার বিভক্তিকরণের জন্য বাজারের প্রকৃতিভেদে বিবিধ প্রকার উপাদান ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। যেমন ভৌগোলিক বিভক্তিকরণের ক্ষেত্রে ভিত্তি হিসেবে প্রশাসনিক এলাকা ব্যবহার করা যেতে পারে। যথা জেলাভিত্তিক বা বিভাগভিত্তিক বাজার বিভাজন। আবার জনসংখ্যাভিত্তিক বিভক্তিকরণের ক্ষেত্রে বয়স, আয়, পেশা ইত্যাদি উপাদানকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। উপাদান যা-ই ব্যবহার করা হোক না কেন, তা অবশ্যই পরিমাপযোগ্য হওয়া আবশ্যিক। উদাহরণস্বরূপ, জেলা, বয়স, আয় ইত্যাদি পরিমাপযোগ্য উপাদান। বাজার বিভাজনে ব্যবহৃত উপাদানসমূহ পরিমাপযোগ্য না হলে বিভক্তিকরণের আসল উদ্দেশ্য সফল না-ও হতে পারে।

২. প্রবেশযোগ্যতা (Accessibility): কোম্পানীর বন্টন প্রণালি, বিজ্ঞাপন মাধ্যম, বিক্রয় প্রয়াস ইত্যাদি কম খরচে, স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে এবং কম অপচয়ে প্রতিটি উপ-বাজার প্রবেশযোগ্য হতে হবে। নাহলে বিভক্তিকরণ নিতান্তই অর্থহীন ও ব্যর্থ প্রয়াসে পরিণত হয়।

৩. কার্যোপযোগিতা (Actionability): প্রতিটি উপ-বাজারকে আকর্ষণীয় করার এবং সেবা প্রদানের জন্য কার্যকর প্রোগ্রাম তৈরীর সামর্থ্য বিবেচনা করতে হবে। যেমন, একটি ছোট যাত্রী পরিবহন কোম্পানী ১০টি পরিবহন রুট চিহ্নিত করল। কিন্তু এর কর্মচারী সংখ্যা ও কোচ সংখ্যা এতগুলো রুটের জন্য পৃথক পৃথক বিপণন কৌশল প্রণয়নে অপরিপূর্ণ হতে পারে।

৪. উপ-বাজারের বিশালতা: বিভক্তিকরণের মাধ্যমে যেসব উপবাজার সৃষ্টি করা হয় সেগুলো যুক্তিসঙ্গতভাবে বৃহৎ হওয়া প্রয়োজন। ক্ষুদ্রাকারের উপ-বাজারে পণ্য বাজারজাত করা হলে বিপণনকারী লাভজনক উপায়ে ব্যবসায় করতে পারবে না। তবে খেয়াল রাখা দরকার যে, বাজারের বিশালতা পণ্যের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। শিল্পপণ্যের উপ-বাজার মুষ্টিমেয় কয়েকজন গ্রাহকের দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু ভোগ্যপণ্যের উপ-বাজারে গ্রাহকের সংখ্যা যথেষ্ট না হলে তাকে বিশাল বলা যাবে না।

৫. পার্থক্যকরণযোগ্যতা: প্রত্যেক বাজার-বিভাগ অন্যান্য বাজার-বিভাগ থেকে ভিন্ন রকমের হতে হবে। নতুবা বিভাজন ফলপ্রসূ হবে না। যেমন: একটি প্রসাধনীর ব্যাপারে বিবাহিত ও অবিবাহিত মহিলারা যদি একইরূপ সাড়া দেয়, তাহলে এদেরকে আলাদা দুটি বিভাগে বিভক্ত করা হবে অর্থহীন।

বিপণন মিশ্রণের সংজ্ঞা (Definition of Marketing Mix)

‘বিপণন মিশ্রণ’ শব্দটি কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের বিপণন কার্যক্রমের বিভিন্ন উপাদান বা চলকসমূহের উপর গুরুত্ব প্রদান করার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রতিষ্ঠান যেসব বিপণন চলক (Marketing variables) -পণ্য (product), মূল্য (price), প্রসার (promotion) ও বন্টন (place) - ব্যবহার করে, সেগুলোকে বিপণন মিশ্রণ নামে অভিহিত করা হয়। এই

উপাদানগুলোকে 4P (ফোর পি) বলা হয়। পণ্য ও সেবার বিপণন কার্যাবলি বহুমুখী কিন্তু পরস্পর নির্ভরশীল। এসব কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে পণ্যের মান, বৈশিষ্ট্য, বিজ্ঞাপন, বিক্রয়, বিক্রয় প্রসার, গ্রাহক-সেবা, গণসংযোগ, তালিকামূল্য, পরিবহন, মজুদকরণ ইত্যাদি। এ কাজগুলো কোনটাই বিচ্ছিন্নভাবে চলতে পারে না। বিপণনের ক্ষেত্রে একটি উপাদানকে বা চলককে অবহেলা করা হলে অন্য উপাদানও দুর্বল হয়ে যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে এসব উপাদান/চলক প্রতিষ্ঠানের বিপণন মিশ্রণ নামে পরিচিত।

ফিলিপ কটলার ও গ্যারী আর্মস্ট্রং এর মতে, বিপণন মিশ্রণ হলো নিয়ন্ত্রণযোগ্য কৌশলগত বিপণন হাতিয়ার- পণ্য, মূল্য, বণ্টন ও প্রসার-এর সেট যা কোন প্রতিষ্ঠান অভীষ্ট বাজারে প্রত্যাশিত সাড়া পাবার জন্য সংমিশ্রণ করে।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, বিপণন মিশ্রণ হলো প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য উপাদান বা চলকের সমষ্টি। এগুলো হলো: পণ্য, মূল্য, বণ্টন এবং প্রসার। এগুলো ইংরেজিতে চার ‘পি’ নামে পরিচিত।

বিপণন মিশ্রণের উপাদান

প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভোক্তারাই রাজা। ভোক্তার এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের কারণে বিপণন কার্যক্রমের সব কিছু ভোক্তাকে ঘিরে আবর্তিত হয়। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ভোক্তার রুচি-অরুচি, চাহিদা, মন-মানসিকতা, সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে বিপণন কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং বিপণন মিশ্রণের রূপরেখা তৈরি করে। বিপণন মিশ্রণের যতগুলো উপাদান রয়েছে সবগুলোই ভোক্তার প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্ধারণ করা হয়। তাই প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের নিকট ক্রেতা বা ভোক্তার চাহিদা পূরণ করে তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিপণনের মৌলিক চলকগুলোর মিশ্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১. পণ্য: পণ্য হলো কোন দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান সত্ত্বা যা মানুষের অভাব বা প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। বাজারজাতকারী বাজার গবেষণার মাধ্যমে ক্রেতা বা ভোক্তার প্রয়োজনের নিরীখে পণ্য প্রস্তুত করে এবং বাজারে সরবরাহ করে। নিচে পণ্য মিশ্রণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো উল্লেখ করা হলো:

ক. বৈচিত্র্য: বৈচিত্র্য বলতে কোন পণ্য বা সেবাকে বিভিন্ন ধরনের ক্রেতা বা ভোক্তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করাকে বোঝায়।

খ. মান: কোন পণ্যের মান বলতে পণ্যের স্থায়িত্ব, নির্ভরযোগ্যতা, যথার্থতা, কার্যকারিতা, মেরামতযোগ্যতা ইত্যাদির সমষ্টিকে বোঝানো হয়।

গ. নকশা: পণ্যের যথোপযুক্ত নকশা করার মাধ্যমে পণ্যকে আকর্ষণীয় ও ব্যবহার উপযোগী করে তোলা যায়।

ঘ. বৈশিষ্ট্য: প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্যকে আলাদা করার জন্য বিপণনকারী নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত করে পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর চেষ্টা করে।

ঙ. ব্র্যান্ড নাম: কোন পণ্য বা সেবাকে চিহ্নিতকরণের সুবিধার জন্য বিপণনকারী আকর্ষণীয় ও অর্থপূর্ণ নাম, প্রতীক, রং, চিহ্ন ইত্যাদি আকারে ব্র্যান্ড নাম ব্যবহার করে।

চ. মোড়কিকরণ: মোড়কিকরণের মাধ্যমে বিপণনকারী পণ্যের মান অক্ষত রাখার প্রয়াস চালায়। এছাড়াও পণ্য সংরক্ষণ, স্থানান্তর, পরিবহন, বিক্রয় প্রসার ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করার জন্যও মোড়ক ব্যবহার করা হয়।

২. মূল্য: সঠিক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে বিপণনের সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। কোন পণ্য ক্রয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ক্রেতা বা ভোক্তা বিপণনকারীকে প্রদান করে, তাকে মূল্য বলে। মূল্য ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতাকে প্রদত্ত আর্থিক বিনিময়। উৎপাদক, ক্রেতা বা ভোক্তা সকলের কাছে মূল্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কারণ মূল্য হলো বিপণন মিশ্রণের একমাত্র উপাদান যার মাধ্যমে কোম্পানি আয় করতে পারে। আবার ক্রেতার প্রত্যাশা, সামর্থ্য ও পণ্যের উপযোগের সাথে মূল্যের সামঞ্জস্য থাকলেই ক্রেতা পণ্য ক্রয় করতে আগ্রহী হয়। মূল্য নির্ধারণের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলো হলো তালিকা-মূল্য (list price), বাট্টা (discount), ছাড় (allowance), পরিশোধের সময় (payment period) এবং বাকিতে বিক্রির শর্ত (credit terms)।

৩. প্রসার: ক্রেতা বা ভোক্তার সাথে বিপণনকারীর যোগাযোগের মাধ্যম হলো প্রসার। প্রসারের বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে বিপণনকারী ক্রেতা বা ভোক্তার কাছে পণ্য সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে, পণ্য ক্রয়ে উৎসাহ প্রদান করে এবং পণ্য ক্রয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। পণ্যের চাহিদা তৈরি করতে, চাহিদা ধরে রাখতে, এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য বিভিন্ন প্রসারমূলক কার্যক্রমের সাথে বিপণনকারী সংযুক্ত থাকে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞাপন (advertising), বিক্রয় প্রসার (sales promotion), গণসংযোগ (public relations) এবং ব্যক্তিক বিক্রয় (personal selling)।

৪. বন্টন বা স্থান: পণ্য বন্টনের মাধ্যমে বিপণনকারী সঠিক ক্রেতা বা ভোক্তার কাছে যথাসময়ে সঠিক মূল্যের বিনিময়ে পণ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে। প্রতিযোগিতার বাজারে বিপণনকারী কত তাড়াতাড়ি গ্রাহকের নিকট পণ্য পৌঁছাতে পারে, তার উপর বিপণনকারীর সাফল্য নির্ভর করে। পণ্যের বন্টন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো পরিবহন ও ডেলিভারী, পণ্য বন্টন প্রণালি, আওতাভুক্ত এলাকা, পণ্যের সমাবেশ (assortments), অবস্থান, মজুত মাল ও বন্টন-সহায়ক সেবা (logistics)।

পণ্যের ধারণা

মানুষের প্রয়োজন, অভাব অথবা সন্তুষ্টি বিধানে সক্ষম এমন বস্তুই পণ্য হিসেবে বিবেচিত। পণ্যের মধ্যে থাকে মানুষের চাহিদা পরিপূরণের ক্ষমতা। একটি পণ্য ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের অনুভূত অতৃপ্তি/প্রয়োজনমেটানো সম্ভব হয়। কলম, কাগজ, কাঁচি, টুথপেস্ট, টেলিভিশন সেট, ফার্নিচার ইত্যাদি হলো দৃশ্যমান পণ্যের উদাহরণ। সাধারণভাবে পণ্য হলো দৃশ্যমান বস্তু যা ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, দেখা যায়। আর সেবার মাধ্যমে আমরা যা পাই তা হলো অদৃশ্যমান পণ্য। অন্য কথায়, মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারে এবং যার মধ্যে কিছু উপযোগ আছে এমন দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান সকল জিনিসই পণ্য। সেবা হলো অদৃশ্যমান কোন কিছু যা ধরা-ছোঁয়া যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায়। ডাক্তারের পরামর্শ, উকিলের ওকালতি, শিক্ষকের পাঠদান, পণ্য মেরামত, পণ্য বিক্রির পর মেরামত করে দেয়া, বিক্রির পর পণ্য গ্রাহকের বাড়ি পৌঁছিয়ে দেয়া ইত্যাদি হচ্ছে সেবার উদাহরণ।

ব্যাপক অর্থে, পণ্য বলতে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান যেকোন জিনিসকেই বুঝায় যার অভাব পূরণের ক্ষমতা আছে। এ অর্থে সেবাও একটি পণ্য কিন্তু তাকে অদৃশ্যমান পণ্য বলে। আধুনিক বিপণনের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তি, স্থান, সংগঠন এবং মতাদর্শও পণ্য হিসেবে অভিহিত হয়। কোন স্থানকে যখন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় (যেমন কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, শিশু পার্ক) তখন সে স্থান ‘পণ্য’ হিসেবে বিবেচিত হয়। ঢাকার শেরাটন হোটেল বা রাজশাহীর পর্যটন মোটেল সংগঠন হিসেবে একটি পণ্য। কোন সংগঠনের প্রতি গ্রাহকদের মনোভাব বা আচরণ ইতিবাচক করার জন্য কিংবা ইতিবাচক মনোভাব অব্যাহত রাখার জন্য যে সকল কার্যাবলি পরিচালিত হয় সেগুলোকে সাংগঠনিক বিপণন বলে।

অর্থাৎ পণ্য হলো এম কোন বিষয় যা বাজারে ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সংগ্রহ বা ভোগের জন্য উপস্থাপন করা হয়; যার মধ্যে রয়েছে বাস্তবিক কোন বস্তু, সেবা, ব্যক্তিগত ভাব বা অবস্থা, স্থান, প্রতিষ্ঠান ও ধারণা।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যের সংজ্ঞা হিসেবে বলা যেতে পারে যে, বিপণনের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রাহকের প্রয়োজন মেটানোর গুণসম্পন্ন দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সকল বস্তু বা সেবা হলো পণ্য।

সেবার ধারণা

সহজ কথায়, সেবা হচ্ছে এক ধরনের অদৃশ্যমান বিষয় যা ক্রয় করে ক্রেতা কিছু সুবিধা বা তৃপ্তি পায়। সেবাকে বস্তুগত কোন বিষয় বা আইটেম হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না। কারণ সেবা ধরা বা ছোঁয়া যায় না। সেবা ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে কোন বস্তুগত দ্রব্য বা মালিকানা হস্তান্তরিত হয় না। যেমন, নার্সের সেবা বা ডাক্তারের পরামর্শ এক ধরনের সেবা যার জন্য অর্থ ব্যয় করতে হয় কিন্তু এতে বস্তুগত কোন জিনিসের হাত বদল হয় না।

পণ্যের শ্রেণিবিভাগ

মানুষের প্রয়োজন মেটাতে ও প্রতিযোগিতা মূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই প্রতিনিয়ত গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন পণ্য বাজারে নিয়ে আসছে। দৈনন্দিন জীবনে বহু পণ্য ক্রয় করতে হয়। আবার ক্রয় করার তেমন কোন প্রয়োজন নেই অথচ বাজারে আছে এমন পণ্যের সংখ্যাও সহজে গুনে শেষ করা যাবে না। তাছাড়া বর্তমানে যে সকল পণ্য বাজারে আছে তার রং, আকার, মূল্য বা মোড়ক পরিবর্তন করেও প্রতিনিয়ত বাজারে নতুন নতুন পণ্য আসছে। আসলে ব্যাপক প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এটাই স্বাভাবিক। কারণ নতুন নতুন পণ্য ছাড়া ক্রেতাকে আকৃষ্ট করা বা ধরে রাখা কঠিন। এ পর্যায়ে পণ্যসামগ্রীকে খুব সহজে শ্রেণিভুক্ত করা সত্যিকার অর্থে অনেকটাই কঠিন। তা সত্ত্বেও বিপণনকারী বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন ভাবে পণ্যসামগ্রীকে শ্রেণিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। মূলত পণ্যের প্রকৃতি ও ক্রেতা একটি পণ্যকে কিভাবে দেখে এই বিবেচনায় সকল ধরনের পণ্যকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

১. ভোগ্যপণ্য: যে সব পণ্য পুনঃবিক্রয় বা কোন রকম প্রক্রিয়াজাতকরণ ছাড়াই সরাসরি ভোগ বা ব্যবহার করা যায় সেগুলোকে ভোগ্য পণ্য বলা হয়। ভোক্তা বা ব্যবহারকারী এই পণ্য ক্রয় করে সরাসরি ভোগ করে থাকে। যেমন- চাল, ডাল, টুথপেস্ট, সাবান, টেলিভিশন ইত্যাদি।

২. শিল্পপণ্য: যেসব পণ্য সরাসরি ভোগ না করে পুনঃবিক্রয় বা পুনঃপ্রক্রিয়াজাতের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয় বা যে সকল পণ্য প্রধানত ভোগ্যপণ্য তৈরীর কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে শিল্পপণ্য বলে। শিল্পপণ্য সাধারণত ভোগের উপযোগী থাকে না। ভোক্তা বা ব্যবহারকারীরা শিল্পপণ্য ক্রয় করে না বরং শিল্প উদ্যোক্তারা এই পণ্য ক্রয় করে থাকে। যেমনকাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, স্থাপনা, আধাপ্রস্তুত পণ্য ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

মূল্য সম্পর্কিত ধারণা

অর্থনৈতিক তত্ত্ব অনুযায়ী মূল্য, মূল্যমান ও উপযোগিতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত পদবাচ্য। উপযোগিতা হলো কোন জিনিসের এমন একটি গুণ যা মানুষের চাহিদা পরিপূরণ করতে সক্ষম। মূল্যমান হলো কোন একটি দ্রব্য কর্তৃক অন্যান্য দ্রব্যের সাথে বিনিময় হওয়ার যোগ্যতার সংখ্যাগত পরিমাপ। আমরা বলতে পারি যে, একটি কাঁঠালের মূল্যমান বিশটি আমের সমান। কিন্তু আমরা ‘দ্রব্য বিনিময়ের’ যুগ পেরিয়ে বহুদূর অগ্রসর হয়ে এসেছি। আমরা এখন অর্থকে মূল্যমানের সাধারণ নির্ণায়ক বা ডিনোমিনেটর হিসেবে ধরে থাকি। কোন জিনিসের আর্থিক মূল্যমানকেই আমরা বলি মূল্য। টাকা-পয়সা, ডলার বা পাউন্ড-স্টার্লিং যেকোন মুদ্রায় মূল্য প্রকাশ করা যায়। যে দেশে মুদ্রার যে নাম প্রচলিত, সে নামেই পণ্যের মূল্য প্রকাশ করা হয়।

সাধারণত কোন পণ্য বা সেবার দামকে আমরা ঐ পণ্যের বা সেবার মূল্য বলে থাকি। অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা যখন দর কষাকষির মাধ্যমে কোন পণ্য বা সেবার একটি দাম বা মূল্যমান স্থির করে তাকে মূল্য বলে। একজন ভোক্তা একটা পণ্য ভোগের মাধ্যমে বা কোন সেবা গ্রহণের মাধ্যমে যে সুবিধা পেল এবং তার বিনিময়ে যে পরিমাণ অর্থ দাতাকে প্রদান করে তাকে মূল্য বলে। বিপণনে মূল্য বলতে এমন একটি বিন্দু বা পয়েন্টকে বুঝানো হয় যেখানে বিক্রেতা যে পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে পণ্য বা সেবা বিক্রি করতে ইচ্ছুক, ক্রেতাও ঠিক একই পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে রাজি থাকে।

অর্থাৎ মূল্য হচ্ছে একটা পণ্য বা সেবার জন্য ধার্যকৃত অর্থের পরিমাণ। সুতরাং, সহজ ভাষায় পণ্য বা সেবার জন্য যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়, তাকেই মূল্য বলে।

পণ্যের মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতিসমূহ

দীর্ঘদিন ধরে নানা প্রতিষ্ঠান নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাদের পণ্যের ভিত্তিমূল্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এই পদ্ধতিগুলো বিশ্লেষণ করলে সেগুলোকে তিনটা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি হলো:

১. ব্যয়ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি বা এ্যাপ্রোচ (cost based pricing)

২. ক্রেতাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি বা এ্যাপ্রোচ (value based approach)

৩. প্রতিযোগিতাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি বা এ্যাপ্রোচ (competition based approach)

এই তিনটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সাধারণ কতকগুলো পদ্ধতি আছে। যেমন, ব্যয়-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতিগুলো পড়ে তা হলো যুক্তব্যয় মূল্য, সমষ্টিদ বিশ্লেষণ ভিত্তিক মূল্য এবং লক্ষ্যস্থিত মুনাফা মূল্য। আর ক্রেতা ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পড়ে উপলব্ধিকৃত মূল্যমান মূল্য। এছাড়া, প্রতিযোগিতাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পড়ে চলমান হার মূল্য ও সীলকৃত মূল্য। একটা চিত্রের সাহায্যে পণ্যের মূল্য নির্ধারণের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির একটা সমন্বিতরূপ দেখানো হলো। এ থেকে আপনি এক নজরে পদ্ধতিগুলো দেখতে পাবেন। এবার তাহলে একে একে পদ্ধতিগুলো আলোচনা করা যাক:

১. ব্যয়ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি: এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে পণ্যের মূল্য নির্ধারণে পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করার জন্য যে ব্যয় করা হয়েছে তার ভিত্তিতে পণ্যের মূল্য স্থির করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনটা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হলো-

(ক) খরচ যোগ করে মূল্য নির্ধারণ: এ পদ্ধতি অনুসারে মোট উৎপাদন ব্যয়ের সাথে কাক্সিক্ষিত মুনাফা যুক্ত করে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, এক কোটা ক্রিম উৎপাদন করতে যদি ১০ টাকা খরচ হয় এবং উৎপাদক যদি উৎপাদন ব্যয়ের উপর ২০% মুনাফা প্রত্যাশা করেন, তবে এক কোটা ক্রিমের বিক্রয় মূল্য হবে ১২ টাকা (১০+২)। এ পদ্ধতি খুবই সরল এবং সহজে

প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু এর একটি মারাত্মক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ পদ্ধতি ব্যবহার করার সময় বিভিন্ন প্রকার ব্যয় যথা, প্রান্তিক ব্যয়, গড় মোট ব্যয়, গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়, গড় স্থায়ী ব্যয় ইত্যাদি বিবেচনা করা হয় না। অথচ উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে সাথে এসব ব্যয়ও প্রভাবিত হয়। এ পদ্ধতির সমর্থকরা মনে করেন যে, উৎপাদিত সামগ্রী সবই বিক্রি হয়ে যাবে। যদি উৎপাদনের পরিমাণ কম হয়, তবে সব ব্যয় কভার করে মুনাফা দেখানোর জন্য প্রত্যেকটা ইউনিট বেশি দামে বিক্রি করতে হবে। কিন্তু ব্যবসায়ের মন্দার দরুন উৎপাদন হ্রাস পেলে ইউনিট মূল্য বাড়ানো উচিত হবে না। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, এ পদ্ধতিতে বাজারে চাহিদার প্রতি মনোযোগ দেয়া হয় না। এ কারণে উৎপাদকদের জন্য এ পদ্ধতির উপযোগিতা বিশেষভাবে সীমিত।

(খ) সমষ্কেদ বিশ্লেষণ (ইংবধশবাবহ অহধমুংরং): মূল্য নির্ধারণের ভিত্তি হিসেবে আরেকটি উপায় সমষ্কেদ বিশ্লেষণ। সমষ্কেদ বিশ্লেষণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হলো সমষ্কেদ বিন্দু নিরূপন করা। সমষ্কেদ এমন একটি বিন্দু যেখানে কতিপয় পণ্যের বিক্রয়লব্ধ আয় মোট ব্যয়ের সমান হয় (একটি আনুমানিক বিক্রয়-মূল্যের ভিত্তিতে)। ফলে ভিন্ন ভিন্ন বিক্রয়-মূল্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সমষ্কেদ বিন্দুর উদ্ভব হয়। সমষ্কেদ বিন্দুর উপরে পণ্য বিক্রয় হলে মুনাফা হয়; আর সমষ্কেদ বিন্দুর নিচে বিক্রয় হলে লোকসানের শিকার হতে হয়।

এ চিত্রে দেখা যাচ্ছে, কোম্পানি যখন পণ্যের ৪ টি একক বিক্রি করছে তখনই সমষ্কেদ বিন্দুতে পৌঁছে গেছে। কোম্পানি যত পরিমাণই উৎপাদন ও বিক্রি করুক না কেন, স্থায়ী ব্যয় ২০০ টাকাতেই স্থির থাকছে। একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় হলো ২৫ (১০০ টাকা স্ট ৪)। কোম্পানি যদি ৪ একক পণ্য বিক্রি করে তাহলে মোট ব্যয় হবে ৩০০ টাকা (৪ এককের পরিবর্তনশীল ব্যয় + স্থায়ী ব্যয়)। একক প্রতি বিক্রয় মূল্য ৭৫ টাকা হলে ৪ এককের বিক্রয়লব্ধ আয় হবে ৩০০ টাকা। ফলে মোট ব্যয় ও মোট আয় সমান।

একই মূল্যে ৪ এককের বেশি বিক্রি করলে কোম্পানি মুনাফা অর্জন করতে পারবে। মূল্য নির্ধারণের হাতিয়ার হিসেবে সমষ্কেদ বিশ্লেষণের প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো, বিভিন্ন বাজার-চাহিদা বিবেচনায় এর ব্যর্থতা। পণ্যের মূল্য ভিন্ন ভিন্ন হলে পণ্যের চাহিদা বাজারে কিরূপ হবে তা বিবেচনা করা হয় না বলে সমষ্কেদ বিশ্লেষণ প্রকৃত মূল্য নিরূপণে সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে না। এর মাধ্যমে শুধু বলা যায় যে, যদি (একমাত্র যদি) বিশেষ মূল্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য বিক্রি করা যায় তবেই বিক্রেতা সমষ্কেদ বিন্দুতে পৌঁছতে পারবে। সমষ্কেদ চিত্র থেকে আমরা বলতে পারি না, বিক্রেতা বাস্তবে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য বিক্রি করতে পারবে কিনা। বাজারে ধরাবাঁধা মূল্যে যে পরিমাণ পণ্য বিক্রি হবে তা সমষ্কেদ বিন্দুর অনেক নিচেও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আগের উদাহরণে দেখা যাচ্ছে, একক প্রতি ৭৫ টাকা বিক্রয়-মূল্যে সমষ্কেদ বিন্দু হলো ৪ একক। কিন্তু বাজারে যদি ২টি বা ৩টি একক বিক্রি হয় তাহলে কোম্পানির পক্ষে ব্রেক ইভেন করা সম্ভব হবে না- তাকে লোকসান দিতে হবে।

২. ব্যবসায়িক মর্যাদাভিত্তিক মূল্য পদ্ধতি: পণ্যের ক্রেতার ব্যবসায়িক মর্যাদার ভিত্তিতে ভিত্তিমূল্যের তারতম্য ঘটতে পারে। একজন ক্রেতা পাইকারও হতে পারেন, আবার খুচরা বিক্রেতা বা শিল্পী ও প্রাতিষ্ঠানিক গ্রাহকও হতে পারেন। উৎপাদক পাইকার এবং খুচরা বিক্রেতা উভয়ের নিকট পণ্য বিক্রয় করার নীতি অনুসরণ করলে তিনি খুচরা বিক্রেতার তুলনায় পাইকারের জন্য কম মূল্য নির্ধারণ করবেন। এভাবে মূল্য পার্থক্য সৃষ্টি করে তিনি বন্টন প্রণালিতে পাইকারের স্বার্থ রক্ষা করেন।

৩. ভ্যালুভিত্তিক মূল্য-নির্ধারণ: এরূপ পদ্ধতিতে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয় গ্রাহক কর্তৃক পণ্যের মূল্য-সম্পর্কিত ধারণার ভিত্তিতে, উৎপাদকের ব্যয়ের ভিত্তিতে নয়। গ্রাহকরা একটি পণ্যের উপযোগিতাকে কতটুকু মূল্যবান মনে করে, তার উপর ভিত্তি করে উৎপাদক পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে। এক্ষেত্রে গ্রাহকদের/ভোক্তাদের প্রয়োজন ও ভ্যালু-সম্পর্কিত ধারণা বিশ্লেষণ করার পর ভোক্তাদের ধারণাকৃত মূল্য হিসাব করা খুবই কঠিন কাজ। তবে গবেষণার মাধ্যমে তাদের ধারণা সম্পর্কে অনুমান করা সম্ভব। তবে এরূপ পদ্ধতির ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ উৎপাদক যদি ভোক্তাদের অনুমানের তুলনায় অধিক মূল্য ধার্য করে, তাহলে বাজার হারাতে পারে। আবার যদি মূল্য কম নির্ধারণ করা হয়, তাহলে মুনাফার পরিমাণ কমে যাবে। তাছাড়া, সমষ্কেদ বিশ্লেষণে আরও কিছু অনুমিতি গ্রহণ করা হয় যা ব্যবসাজগতে অসম্ভব। এতে অনুমান করা হয় যে, ব্যয়সমূহ স্থির। তাই যে কোম্পানিতে গড় একক-ব্যয় ঘন ঘন উঠানামা করে সেখানে সমষ্কেদ বিশ্লেষণের মূল্য তেমন থাকে না। অনুরূপভাবে, বাজারে চাহিদা হিসেব করার সময় সমষ্কেদ বিশ্লেষণে চাহিদা পরিস্থিতিকে খুব সহজভাবে গ্রহণ করা হয় যা বাস্তবে জটিলও হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য কারণে সমষ্কেদ বিন্দুর পরিমাণ পণ্য কোম্পানি বিক্রি করতে সক্ষম নাও হতে পারে।

৪. প্রতিযোগিতাভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ (ঈড়সঢ়বঃঃরাব চংরপরহম): কোন কোন উৎপাদক প্রতিযোগিতামূলক বাজার মূল্যের ভিত্তিতে নিজের পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। এক্ষেত্রে পণ্যের ব্যয় বা ক্রেতাদের ইচ্ছা সরাসরি বিবেচনা না করে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার শর্তের দিকে নজর দেওয়া হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দু'ধরনের পণ্যের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতি দু'টো হলো-

(ক) চলমান হার পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে অন্য প্রতিযোগীরা যে দামে পণ্য বিক্রয় করছে সে দামকে ভিত্তি ধরে নিজ পণ্যের মূল্য স্থির করা হয়। এক্ষেত্রে কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগী দামের সমান, উপরে বা নিচে নিজ পণ্যের দাম স্থির করতে পারে। ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো বড় কোম্পানিগুলোকে বেশি অনুসরণ করে। এই ধরনের বড় কোম্পানিগুলোকে নেতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এরা যখন মূল্য পরিবর্তন করে, তখন ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোও তাদের পণ্যের মূল্য পরিবর্তন করে। চলমান হার মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি এই কারণে ভালো যে, এর ফলে মূল্য-যুদ্ধ বন্ধ হয় ও সম্মিলিত প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয়। কেননা সবাই একই মূল্য অনুসরণ করে। ফলে একটা যুক্তিযুক্ত মূল্য সবাই লাভ করতে পারে। একই শিল্পের অন্তর্গত সকল প্রতিযোগীর মধ্যে এই ধরনের পণ্য-মূল্য নির্ধারণ করতে দেখা যায়।

(খ) সীলকৃত দর পদ্ধতি: এই ধরনের মূল্য পদ্ধতি সাধারণত প্রতিযোগিতামূলকভাবে যখন মূল্য প্রদান করতে হয় তখন ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রতিযোগী কী মূল্য দিতে পারে, তার অনুমানের ভিত্তিতে পণ্যের মূল্য স্থির করা হয়। এক্ষেত্রে নিজ পণ্যের ব্যয় বা চাহিদা কোনটাই বিবেচনায় আনা হয় না। এখানে কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান কন্ট্রাস্ট বা চুক্তিটা পেতে চায়। এক্ষেত্রে তাকে অন্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে কম দামই দিতে হবে। সাধারণত কোন কাজ পাওয়ার জন্য টেন্ডার বা দরপত্র জমা দেয়ার সময় এই পদ্ধতিতে পণ্যের মূল্য স্থির করা হয়।

বিপণন প্রসার-এর ধারণা

বিপণন প্রক্রিয়ার প্রসার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পণ্য উৎপাদন পরিকল্পনা, পণ্যের মূল্য নির্ধারণ এবং বণ্টন এইসববিপণন কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু একটি কোম্পানী তার এ সকল কার্যাবলীর মাধ্যমে নিশ্চিত হতে পারে না যে তার উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বাজারে গৃহীত হবে এবং তার বিপণন উদ্দেশ্য সফল হবে। তাই কোম্পানীকে বিক্রয়ের নিশ্চয়তার জন্য প্রসার নীতি অনুসরণ করতে হয়। যার মাধ্যমে সে পণ্যসামগ্রী সম্পর্কে ক্রেতাদেরকে পরিচিত করতে পারে এবং ক্রেতাদের সাথে একটি কার্যকরী যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। প্রতিযোগিতার বাজারে বিপণনকারী প্রসার কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজের পণ্য বা সেবা সম্পর্কে বর্তমান ও ভবিষ্যত ক্রেতার মনে একটি সুনির্দিষ্ট স্থান তৈরি করতে পারে।

সহজভাবে, পণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্য প্রকৃত ভোক্তা ও পুনঃবিক্রেতাদের (পাইকার, খুচরা ব্যবসায়ী ও অন্যান্য মধ্যস্থ ব্যবসায়ী) অবহিত করে পণ্যটি ক্রয়ে ক্রেতাদের আগ্রহী করে তুলবার জন্য যে উপায় বা কৌশল ব্যবহার করা হয়, তাকে বিপণন প্রসার বলা হয়।

অর্থাৎ প্রসার হলো কতগুলো কাজের সমষ্টি যার মাধ্যমে পণ্যের সুবিধা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয় এবং অতীষ্ট ক্রেতাকে পণ্যটি ক্রয় করার জন্য প্ররোচিত করা হয়।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বিপণন প্রসার সম্পর্কে নিম্নের ধারণাগুলো পাওয়া যায়:

১. বিপণন প্রসার একমুখী বা উভয়মুখী তথ্য আদান-প্রদানের প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে;
২. বিপণন প্রসার বর্তমান ক্রেতা ও সম্ভাব্য ক্রেতার সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়;
৩. অতীষ্ট বা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের বাজারের ক্রেতাদের পণ্য, সেবা বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অবহিত করা হয়;
৪. পণ্য বা সেবা ক্রয় করার জন্য ক্রেতাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়; এবং
৫. বিপণন প্রসার প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিক্রয় প্রসার হচ্ছে ব্যক্তিক বিক্রয়, বিজ্ঞাপন ও প্রচার ছাড়া বিপণনের সেসকল প্রসারমূলক কার্যাবলি যাসম্মেয়াদে পণ্য বেশি বিক্রয়ের জন্য অনিয়মিতভাবে ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য প্রসার কার্যক্রমের পরিপূরক/সহায়ক হিসেবে বিক্রয় প্রসার কাজ করে এবং ক্রেতা ও ডিলারদের পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে সাময়িকভাবে উদ্বুদ্ধ করে। সাবানের মূল্য ২ টাকা ছাড় দেওয়া হলে অথবা ১০টি নুডুলস কিনলে একটি টিফিন বক্স ফ্রি দেয়া হলে এগুলোকে বিক্রয় প্রসারের উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা যাবে।

ফিলিপ কটলার ও গ্যারী আর্মস্ট্রং এর মতে, বিক্রয় প্রসার হচ্ছে পণ্য বা সেবা ক্রয় বা বিক্রয়ে উৎসাহিত করার স্বল্পকালীন উদ্দীপনা।

বিপণন প্রসারের কার্যক্রম হিসেবে বিক্রয় প্রসারের মধ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহলক্ষ্য করা যায়:

- বিপণন প্রসারের জন্য সাময়িকভাবে বিক্রয় প্রসার ব্যবহৃত হয়;

- পণ্য বা সেবার বিক্রয় দ্রুত বৃদ্ধির জন্য বিক্রয় প্রসার ব্যবহার করা হয়;
- নতুন পণ্য প্রবর্তন করা হলে বা চাহিদা কমে গেলে পণ্যের বিক্রয় বাড়ানোর জন্য বিক্রয় প্রসারের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়।

পরিশেষে বলা যায়, বিক্রয় প্রসার হলো বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য স্বল্পকালীন উদ্দীপনামূলক কার্যক্রমের সমষ্টি।

বিক্রয় প্রসার-এর কৌশল (Techniques for Sales Promotion)

বিক্রয় প্রসার কর্মসূচির মুখ্য উদ্দেশ্যেই হলো পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি করা। তাই উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে বিক্রয় প্রসারের কৌশল বা পন্থাগুলোকে দু'ভাবে বিভক্ত করা হয়; যথা- (১) ভোক্তাকেন্দ্রিক বিক্রয় প্রসার ও (২) ব্যবসায়িক বিক্রয় প্রসার। নিম্নে উক্ত প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

(১) ভোক্তাকেন্দ্রিক বিক্রয় প্রসার: উৎপাদক বা মধ্যস্থ ব্যবসায়ী কর্তৃক চূড়ান্ত ভোক্তাদেরকে নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবা ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য গৃহীত বিক্রয় প্রসার পন্থাকে ভোক্তাকেন্দ্রিক বিক্রয় প্রসার বলে। সাধারণত কোনো নতুন পণ্য উপস্থাপন অথবা ক্রমহ্রাসমান চাহিদাসম্পন্ন পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি অথবা প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করার জন্য এরূপ প্রসারমূলক পন্থা গৃহীত হয়ে থাকে।

নিম্নে ভোক্তাকেন্দ্রিক বিক্রয় প্রসারের পন্থাগুলো আলোচনা করা হলো:

ক) নতুন পণ্য উপস্থাপন: কোনো নতুন পণ্য বাজারে উপস্থাপন এবং পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করতে পারে:

১. সৌজন্যপণ্য বিতরণ (Giving Complimentary Product): যদি কোনো প্রতিষ্ঠান নতুন ব্র্যান্ডের পণ্য বাজারে উপস্থাপন করতে চায়, তাহলে উক্ত প্রতিষ্ঠান নতুন ব্র্যান্ডের পণ্যের সাথে সম্পর্কিত কোনো পছন্দসই পণ্য বিনামূল্যে ক্রেতাদেরকে প্রদান করতে পারে। এতে নতুন পণ্য সম্পর্কে ক্রেতাদের মনে আগ্রহের সৃষ্টি হয়। যেমন, নতুন টুথব্রাশ-এর বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য টুথপেস্টের সাথে বিনামূল্যে টুথব্রাশ প্রদানের ব্যবস্থা করা যায়।

২. নমুনাপণ্য বিতরণ: ভোক্তাদেরকে নির্দিষ্ট পণ্য সীমিতভাবে বিনামূল্যে প্রদানের ব্যবস্থাকে নমুনাপণ্য বিতরণ পদ্ধতি বলে। যদি উৎপাদক নিশ্চিত থাকে যে, ক্রেতারা পণ্য গ্রহণ করবে এবং পছন্দ করলে পুনরায় ব্যবহার করবে, তাহলেই নমুনা বিতরণ পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়।

৩. অর্থ ফেরত: ভোক্তা এবং খুচরা ব্যবসায়ী উভয় ক্ষেত্রেই ভোক্তারা মোড়কে উল্লিখিত মূল্যে পণ্য ক্রয় করে এবং ক্রয়ের নিশ্চয়তাস্বরূপ পণ্যের লেবেল বা মোড়ক উৎপাদকের নিকট ফেরত দেয়। উৎপাদক মোড়কের উল্লিখিত মূল্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ভোক্তাদেরকে ফেরত প্রদান করে।

৪. মেয়াদি গ্যারান্টি প্রদান: নতুন পণ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে মেয়াদি গ্যারান্টি অত্যন্ত ফলদায়ক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে উৎপাদক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পণ্যের স্থায়িত্ব বা কর্মক্ষমতা বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করে। এর মধ্যে পণ্যের কোনো ত্রুটি দেখা গেলে বা পণ্য বিনষ্ট হলে উৎপাদক পণ্যটি ফেরত নিয়ে আরেকটি নতুন পণ্য ক্রেতাকে প্রদান করে অথবা মেরামত করে দেয়। এ ধরনের গ্যারান্টি ক্রেতাদের মনে পণ্য সম্বন্ধে আস্থার সৃষ্টি করে এবং তারা পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ হয়। ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য বিপণনের ক্ষেত্রে এরূপ পদ্ধতির ব্যবহার লক্ষণীয়।

খ) প্রতিযোগিতা মোকাবিলা: বাজারে প্রতিযোগিতায় সাফল্যের সাথে টিকে থাকার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণত নিম্নোক্ত বিক্রয় প্রসার পন্থাগুলো ব্যবহার করে:

১. মূল্যহ্রাস কুপন: প্রচলিত মূল্য অপেক্ষা কিছুটা মূল্য ছাড় দিয়ে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কুপন প্রদান প্রচলিত পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এক্ষেত্রে পণ্যের উৎপাদক সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে কুপন প্রদান করে এবং ক্রেতারা কুপন জমা দিয়ে কুপনে উল্লিখিত কম মূল্যে পণ্য সংগ্রহ করে।

২. মূল্যহ্রাস মোড়কিকরণ: এ পদ্ধতি মূল্যহ্রাস কুপন পদ্ধতির অনুরূপ। তবে এক্ষেত্রে কুপনের পরিবর্তে পণ্যের মোড়কে মূল্য ছাড়-এর পরিমাণ উল্লেখ থাকে। ক্রেতারা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পণ্যের নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে পণ্য ক্রয় করতে

পারে। আমাদের দেশে বিশেষ করে সাবান, ওয়াশিং পাউডার, টুথপেস্ট ইত্যাদির ক্ষেত্রে এরূপ পদ্ধতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

৩. বিক্রয়োত্তর সেবা: সেবামূলক পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ও প্রতিযোগিতা মোকাবেলায় ভোক্তাকে পণ্য বা সেবা ক্রয়ের পর বিনামূল্যে বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। এক্ষেত্রে মেয়াদি গ্যারান্টির ন্যায় কোনো মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে না। যেকোনো সময়ে ক্রেতারা এরূপ সেবাগ্রহণ করতে পারে। টিভি, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি পণ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয়োত্তর সেবা অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়।

৪. প্রদর্শনী এবং মেলা: পণ্যের বাজার বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সময়ে দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রদর্শনী ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এসব প্রদর্শনী ও মেলার স্পন্সর হয়েও প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি তুলে ধরা যায়। এ ছাড়া প্রদর্শনী ও মেলাতে স্টল খুলে পণ্যের প্রতি ভোক্তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হয়।

গ) ভোক্তাদের মনে অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি: পণ্যের প্রতি ক্রেতাদের অনুকূল মনোভাব সৃষ্টির জন্য প্রতিষ্ঠান অনেক সময় বিভিন্ন বিক্রয় প্রসার কর্মসূচি গ্রহণ করে। এগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. উপহার প্রদান: ক্রেতাদের মনে পণ্য সংক্রান্ত বিষয়ে অনুকূল মনোভাব সৃষ্টির জন্য ক্রেতাদেরকে বিভিন্ন জিনিস উপহার হিসেবে প্রদান করা যায়। উপহার-সামগ্রীর গায়ে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা মুদ্রিত থাকে। যেমন ক্যালেন্ডার, কলম, চাবির রিং ইত্যাদি।

২. শুভেচ্ছা জ্ঞাপন: বিভিন্ন ধর্মীয় সামাজিক অনুষ্ঠানে এবং নববর্ষের আগমন উপলক্ষে বর্তমান এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন বিক্রয় প্রসারের একটি অন্যতম কৌশল। সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান গুলো গণমাধ্যমগুলোর সাহায্যে অথবা গ্রাহকদেরকে ব্যক্তিগত চিঠি প্রদানের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে থাকে। আমাদের দেশে বড় স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসায়ীদের এরূপ বিক্রয় প্রসার কার্যক্রম গ্রহণ করতে দেখা যায়।

(২) ব্যবসায়িক বিক্রয় প্রসার: মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদেরকে প্রতিষ্ঠানের পণ্য বিক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য গৃহীত বিক্রয় প্রসার পন্থাকে ব্যবসায়িক বিক্রয় প্রসার বলে। এক্ষেত্রে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ক) বিক্রয় প্রসার কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উৎসাহ দান: মধ্যস্থ ব্যবসায়ীরা যাতে নিজেই উদ্যোগ নিয়ে নির্দিষ্ট পণ্যের বিক্রয় প্রসারে ভূমিকা রাখে এজন্য নিম্নোক্ত বিক্রয় প্রসার কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে:

১. বিশেষ পুরস্কার: যে সকল মধ্যস্থ ব্যবসায়ী প্রথম বারের মতো অথবা একত্রে অধিক পরিমাণে পণ্যের অর্ডার প্রদান করবে তাদের জন্য বিশেষ আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

২. ব্যবসায়িক ছাড়: মধ্যস্থ ব্যবসায়ীরা যাতে নির্দিষ্ট উৎপাদনকারীর পণ্য বিশেষভাবে প্রদর্শন করে এবং পণ্য বিক্রয়ের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করে, সেজন্য তাদেরকে বিশেষ ব্যবসায়িক ছাড় প্রদান করা হয়। যেমন, মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের জন্য ৫% কমিশন বৃদ্ধি।

৩. সহযোগিতামূলক বিজ্ঞাপন: পণ্য বিক্রয়ে উৎসাহিত করার জন্য বিজ্ঞাপন ব্যয়ের নির্দিষ্ট অংশ উৎপাদনকারী বহন করে। এরূপ সহযোগিতা প্রদানের ফলে খুচরা ব্যবসায়ীরা অধিক পণ্য বিক্রয়ের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে থাকে।

খ) অধিক পণ্য ক্রয়-বিক্রয়: মধ্যস্থ ব্যবসায়ীরা যাতে অধিক পরিমাণে পণ্য ক্রয় করে এবং সেগুলো বিক্রয়ের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে, সেজন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করা হয়ে থাকে:

১. বিনামূল্যে পণ্য প্রদান: মধ্যস্থ ব্যবসায়ীরা যাতে অধিক পরিমাণে পণ্য ক্রয় করে সে জন্য অতিরিক্ত পণ্য ক্রয়ের ওপর কিছু পণ্য তাদেরকে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। এরূপ কার্যক্রম উৎপাদকদের পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির সহায়ক হয়।

২. প্রতিযোগিতা: মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের মধ্যে বা কোম্পানির নিজস্ব বিক্রয়কর্মীদের মধ্যে পণ্য-বিক্রয় প্রতিযোগিতার আয়োজন বিক্রয় প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের বিশেষ পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা হলে প্রতিষ্ঠানের পণ্য বিক্রয়ের প্রতি ব্যবসায়ীদের অধিক আগ্রহের সৃষ্টি করে।

গ) মধ্যস্থব্যবসায়ীদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহযোগিতা: উৎপাদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ভালোভাবে অবহিত না থাকায় খুচরা ব্যবসায়ীরা পণ্য সামগ্রী সুষ্ঠুভাবে বিক্রয় করতে পারে না। এক্ষেত্রে উৎপাদকগণ নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে সুফল পেতে পারে:

১. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: মধ্যস্থব্যবসায়ীরা যাতে বিক্রয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারে সেজন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। এরূপ প্রশিক্ষণ বিক্রয়কর্মীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির সাথে বিক্রয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি করে। আমাদের দেশে ওষুধ কোম্পানিসমূহ গ্রামের ডাক্তারদের প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম নিয়ে বিক্রয় বৃদ্ধির চেষ্টা চালায়।

২. পণ্য তথ্য: পণ্যের সংবাদ, পণ্য সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য, পণ্যের ছবি, পোস্টার ইত্যাদি খুচরা ব্যবসায়ীদেরকে সরবরাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এরূপ কার্যক্রম খুচরা ব্যবসায়ীদের বিক্রয় প্রসারে ভূমিকা রাখতে উৎসাহিত করে।

উপসংহারে বলা যায়, ভোক্তা বা ক্রেতাদের কোনো পণ্য ক্রয়ে উৎসাহদানের জন্য বিজ্ঞাপন ও ব্যক্তিক বিক্রয়ের বাইরে বৈষয়িক বিভিন্ন সহযোগিতা বা সাময়িক কোনো কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে বিক্রয় প্রসার ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে কোন্ পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে তা বিশেষভাবে পণ্যের প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে।

বিজ্ঞাপন-এর ধারণা

সাধারণভাবে বলা যায়, পণ্যের প্রতি জনগণকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষ নৈব্যক্তিক উপায়ে পণ্যের গুণাগুণ, উপযোগিতা, কার্যকারিতা, ব্যবহার-বিধি বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য জনসাধারণের সামনে বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে তুলে ধরলে তা বিজ্ঞাপন নামে পরিচিত হয়। বিজ্ঞাপন বিপণন প্রসারের ক্ষেত্রে এমন একটি কৌশল যার সাহায্যে উৎপাদিত পণ্য সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার মাধ্যমে তাদেরকে উক্ত পণ্য ক্রয়ে প্ররোচিত করা হয়। নৈব্যক্তিক বিক্রয়িতা বা বিজ্ঞাপনে বাজারে ভোক্তাদের পণ্য সংক্রান্ত পছন্দ প্রভাবান্বিত করার উদ্দেশ্যে মুদ্রিত শব্দমালা বা প্রতীকের সাহায্যে অগণিত গ্রাহকের নিকট বিক্রয় সংবাদ পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। বিজ্ঞাপন আসলেই পণ্য ও সেবা বিক্রয়ের জন্য সম্ভাব্য ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে মুদ্রিত বা ছাপানো আবেদন।

বিপুল সংখ্যক সম্ভাব্য ক্রেতার সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিজ্ঞাপন কৌশল গ্রহণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে ক্রেতার সাথে সরাসরি যোগাযোগ না করে বিশেষ বিশেষ মাধ্যমে তাদের নিকট বার্তা প্রেরণ করা হয়। ক্রেতাদের প্রভাবিত করার জন্য মুদ্রিত আকারে, ছবি বা গানে বা অন্য কোন উপায়ে পরোক্ষভাবে পণ্য ও সেবার সংবাদ অর্থের বিনিময়ে যখন পৌঁছানো হয়, তখন তা বিজ্ঞাপন নামে অভিহিত হয়। এই বিজ্ঞাপন ব্যবহৃত হয়ে আসছে খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার সাল থেকে। রোম ও গ্রীক ব্যবসায়ীরাও পণ্যের কাটতি বাড়ানোর জন্য বিজ্ঞাপন ব্যবহার করত। বর্তমানে বিজ্ঞাপনের বৈচিত্র্য যেমন বেড়েছে, মাধ্যমও নানা রকম হয়েছে।

ফিলিপ কটলার ও গ্যারী আর্মস্ট্রং এর মতে, বিজ্ঞাপন হলো কোন নির্দিষ্ট উদ্যোক্তা কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে কোন ধারণা, পণ্য বা সেবার অব্যক্তিক উপস্থাপনা ও প্রসার।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বিজ্ঞাপন সম্পর্কে নিম্নের ধারণাগুলো পাওয়া যায়:

- বিজ্ঞাপন একটা অর্থপ্রদত্ত প্রসার মাধ্যম যা সম্প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপনদাতাকে অর্থ প্রদান করতে হয়;
- এটা পণ্য ও সেবার নৈব্যক্তিক উপস্থাপনা। কোন ব্যক্তি এখানে উপস্থিত থেকে পণ্য বা সেবার সংবাদ ক্রেতাকে জানায় না;
- বিজ্ঞাপনের উদ্যোক্তা থাকে। অর্থাৎ কেউ না কেউ বিজ্ঞাপন প্রদান করেন;
- একমুখী যোগাযোগ মাধ্যমে পণ্যের সংবাদ ক্রেতাদের জানানো হয়;
- পণ্য, সেবা ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে;
- বিজ্ঞাপন চাহিদা সৃষ্টির প্রধান পদ্ধতি।

সোজা ভাষায় বলা যায় যে, বিজ্ঞাপন হলো যথাসম্ভব ন্যূনতম ব্যয়ে ও স্বল্পতম সময়ে অজানা সংখ্যক লোককে কোন জিনিস (পণ্য বা সেবা) সম্পর্কে জানানো। এর সাহায্যে জনগণকে পণ্য ও সেবা সম্পর্কে অবহিত করা হয়, তাদের মধ্যে ক্রয়ের ইচ্ছা জাগিয়ে তোলা হয় এবং পরোক্ষভাবে তাদের সামনে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি তুলে ধরা হয়।

বিজ্ঞাপন মাধ্যম-এর ধারণা (Concept of Advertising Media)

পণ্য-সংবাদ যথাযথভাবে সম্ভাব্য গ্রাহকদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়ে তাদেরকে পণ্যের প্রতি প্রলুব্ধ করার জন্য বিজ্ঞাপনদাতারা বিভিন্ন মাধ্যম বা মিডিয়ার সাহায্য গ্রহণ করে। একজন উৎপাদক বা ব্যবসায়ীর পক্ষে বিশাল জনগোষ্ঠীর ঘরে ঘরে গিয়ে পণ্যের প্রচার করা সম্ভব নয়। তাই তারা বিজ্ঞাপন মাধ্যম ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। বিজ্ঞাপন মাধ্যমগুলো অর্থের বিনিময়ে বিজ্ঞাপনদাতার বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা করে। বিজ্ঞাপনদাতাকে নিজ খরচে বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি (টেলিভিশন-চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে স্টোরিবোর্ড) তৈরি করে মাধ্যম-কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করতে হয়। কর্তৃপক্ষ তখন বিজ্ঞাপনদাতার সাথে আবদ্ধ চুক্তি মোতাবেক যথাসময়ে যথাস্থানে বিজ্ঞাপন পরিবেশন/উপস্থাপন করে।

বিজ্ঞাপনের মাধ্যম বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। বিজ্ঞাপনদাতা কোন প্রকারের মাধ্যম ব্যবহার করবেন তা বাজেট ও সম্ভাব্য গ্রাহকের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করবেন। তবে বিজ্ঞাপনদাতাকে একটি বিষয় সব সময় স্মরণ রাখতে হয় যে, সঠিক মাধ্যমে সঠিক উপায়ে সঠিক ব্যক্তিবর্গের নিকট সঠিক বিজ্ঞাপন উপস্থাপন করতে না পারলে বিজ্ঞাপন প্রচারের আসল উদ্দেশ্য অর্জন করতে ব্যর্থ হবে। বর্তমান বা সম্ভাব্য গ্রাহকের নিকট পণ্য ও সেবার বিক্রয় সংক্রান্ত সংবাদ পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য গৃহীত পন্থা বা কৌশলকে বিজ্ঞাপন মাধ্যম নামে অভিহিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, সংবাদপত্র বা খবরের কাগজ, সাময়িকী, প্রচারপত্র, রেডিও এবং টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের উল্লেখযোগ্য মাধ্যম।

বিজ্ঞাপন মাধ্যম-এর প্রকারভেদ

বিজ্ঞাপন মাধ্যম বলতে এমন কোনো উপায় বা অবলম্বনকে বুঝায় যার মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুকে জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়। প্রত্যাশিত ক্রেতাসাধারণের নিকট বিক্রয় সংক্রান্ত সংবাদ পৌঁছানোর প্রক্রিয়াকেই বিজ্ঞাপন মাধ্যম বলা হয়। নিম্নে বিজ্ঞাপনে বহুল ব্যবহৃত মাধ্যমসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. সংবাদপত্র: সকল ধরনের পণ্য ও সেবা প্রচারে সংবাদপত্র একটি স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ অথচ দূর-দূরান্তের জনগণের নিকট বার্তা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে সক্ষম একটি সহজ মাধ্যম। এরূপ মাধ্যমের সুবিধা হলোকম খরচে, সহজেই এর বিষয়বস্তু পরিবর্তন করা যায় এবং প্রয়োজনানুযায়ী একবার বা একাধিকবার প্রচার করা যায়। তবে এর অসুবিধা হলো, শুধুমাত্র শিক্ষিত মানুষ এবং যাদের কাছে পত্রিকা পৌঁছে তারাই এই ধরনের বার্তা সম্পর্কে জানতে পারে। এ ছাড়া এই মাধ্যমের আবেদন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী।

২. সাময়িকী: সাপ্তাহিক, মাসিক, পাক্ষিক, বাৎসরিক সাময়িকীতে উন্নতমানের কাগজে মুদ্রণ ও রংবেরঙের চিত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। এর স্থায়িত্ব সংবাদপত্র অপেক্ষা বেশি। এই ধরনের সাময়িকী বেশি সময় ধরে পাঠক পাঠ করে। বিশেষ ধরনের পণ্য বিশেষ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এটিও সংবাদপত্রের ন্যায় একটি স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ মাধ্যম।

৩. প্রচারপত্র: পণ্যসামগ্রীর বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ, উপযোগিতা, বিক্রয় প্রসার ইত্যাদি সম্বলিত প্রচারপত্র ছাপিয়ে জনবহুল স্থানে লোক মারফত বিলি করা বা ডাকযোগে মানুষের নিকট প্রেরণ এ ধরনের বিজ্ঞাপনের বৈশিষ্ট্য। এর সুবিধা হলো, এরূপ মুদ্রিত প্রচারপত্র পড়ে জনসাধারণ সহজেই পণ্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে। তবে এর অসুবিধা হলো অনেকেই এই প্রচারপত্র না পড়ে ফেলে দেয় এবং বিলি করাও অনেক কষ্টকর। আবার বিজ্ঞাপিত পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে প্রায় লোকই সন্দেহ পোষণ করে।

৪. প্রাচীরপত্র: বড় বড় হরফে পোস্টার লিখে বা ছাপিয়ে লোক চলাচলের স্থানে, বাসস্ট্যান্ডে রাস্তার মোড়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ফলে সহজেই বিজ্ঞাপন বার্তা জনগণের নজরে আসে।

৫. বিজ্ঞাপনী ফলক: রাস্তার মোড়ে, গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কাঠ বা হার্ডবোর্ডের বিজ্ঞাপনী ফলক তৈরি করে তার ওপর পণ্য বা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেয়াটা প্রাচীনকাল হতেই একটা জনপ্রিয় বিজ্ঞাপনী মাধ্যম। এটি অনেকটা স্থায়ী প্রকৃতির, যে কারণে অনেকদিন তা বিজ্ঞাপন সুবিধা প্রদান করে। বড় বড় বিল্ডিংয়ের গায়ে বা ছাদে ও স্টেডিয়ামগুলোতে এরূপ ফলক তৈরি করে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়।

৬. রেডিও: বিজ্ঞাপনের জন্য বর্তমানে উন্নত ও অনুন্নত প্রায় সকল দেশেই রেডিও একটি জনপ্রিয় মাধ্যম যা ব্যবহার করে পণ্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বার্তা অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়। এর মাধ্যমে শহর ও গ্রামের সকল অঞ্চলের শিক্ষিত-অশিক্ষিত বিপুল জনগোষ্ঠীর নিকট পণ্য বার্তা পৌঁছে দেয়া যায়।

৭. টেলিভিশন: সমগ্র বিশ্বজুড়ে দ্রুত পণ্য ও সেবা প্রচারে টেলিভিশন একটি অত্যন্ত সুপরিচিত ও কার্যকরী মাধ্যম। এর মাধ্যমে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সামনে পণ্য বা সেবার আবেদন সহজে ও চমৎকারভাবে তুলে ধরা যায়। এ মাধ্যমের বড় অসুবিধা হলো এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

৮. সরাসরি ডাক মারফত বিজ্ঞাপন: চিঠিপত্র, কার্ড, পঞ্জিকা, পুস্তিকা, মূল্য তালিকা, প্রচার পত্র ইত্যাদি এই ধরনের বিজ্ঞাপনের অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি সাধারণত সপিং পণ্যের উৎপাদক ও ডিলারদের নিকট পণ্যের বিক্রয় সংবাদ প্রেরণের জন্য এ পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে জনসাধারণের নিকট তথ্য প্রেরণের জন্য ও সম্ভাব্য গ্রাহকদের তিকানা জানা না থাকলে এ পদ্ধতি কার্যকর হয়না। তাছাড়া, এতে মুদ্রণ খরচ ও ডাক খরচ মিলিয়ে বিজ্ঞাপন ব্যয় অনেক বেড়ে যায়।

৯. উন্মুক্ত স্থানে বিজ্ঞাপন: শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যেখানে সর্বদা বহু লোকের সমাবেশ হয় অথবা প্রাত্যহিক কাজে যাতায়াতের পথে খোলা জায়গায় বৈদ্যুতিক সাইন, পোস্টার বা রঞ্জিত সাইনবোর্ডে পণ্যসামগ্রীর বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। লোকজন পথ চলার সময় সেগুলো দেখে, পড়ে এবং আকৃষ্ট হয়। ফলে এ ধরনের বিজ্ঞাপন তাদের মনে স্থায়ী দাগ কাটতে সক্ষম হয় এবং তারা বিজ্ঞাপিত পণ্য ক্রয় করতে আগ্রহী হয়।

১০. ডিজিটাল বিজ্ঞাপন: বিপণনকারী মোবাইল/সেলুলার নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে ও ক্রয়ে উৎসাহ প্রদান করে। বর্তমান সময়ে ক্রেতা ও ভোক্তা জগতে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস ও ইন্টারনেট ব্যবহার জনপ্রিয় হবার কারণে ডিজিটাল বিজ্ঞাপন বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু যারা ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে না বা ব্যবহারের সুযোগ নেই, তারা বিপণনকারীর বিজ্ঞাপন সম্পর্কে অবগত থাকে না।

১১. পরিবহন বিজ্ঞাপন: বিভিন্ন প্রকার গাড়ি বিশেষ করে ট্রাক বা বাস, ট্যাক্সি, রিকশার গায়ে পণ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে পণ্য বিজ্ঞাপিত করা হয়।

১২. নমুনা: প্রদর্শনীতে শিল্পজাত, কৃষিজাত ও অন্যান্য দ্রব্যের স্টল খুলে কার্যকরীভাবে জনসাধারণের নিকট পণ্যের সংবাদ পৌঁছিয়ে দেয়া যায়। অসংখ্য লোক প্রদর্শনীতে এসে ঘুরে ফিরে বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করে এবং বিভিন্ন পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেবাপণ্য এবং ওষুধাদির ক্ষেত্রে নমুনা বিজ্ঞাপনের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়।

১৩. সিনেমা স্লাইডস: সিনেমার পর্দায় রং-বেরঙের ছবির সাথে পণ্যের গুণাগুণ তুলে ধরে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। মাধ্যম হিসেবে এটি অনেকটা টেলিভিশনের মতো। তবে শুধুমাত্র সিনেমা হলের সীমিত দর্শকই এ সম্পর্কে জানতে পারে।

১৪. নিয়ন আলো: ব্যস্ততম রাস্তার পাশে বা মোড়গুলোতে নিয়ন আলোর সাহায্যে আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন প্রদান করা হয়। এতে নানান ধরনের আলোর ব্যবহার করে বিজ্ঞাপনকে সহজেই জনসাধারণের দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলা যায়। এরূপ বিজ্ঞাপনের সুবিধা হলো তা দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞাপনের সুবিধা প্রদান করে। তবে অসুবিধা হলো এর প্রাথমিক ব্যয় অনেক বেশি এবং দিনের বেলায় এর কার্যকারিতা কম।

১৫. অন্যান্য মাধ্যম: উপরিউক্ত মাধ্যমসূহ ছাড়াও আরও কয়েক প্রকার বিজ্ঞাপন মাধ্যমের প্রচলন রয়েছে। এগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও অনেকে ব্যবহার করে থাকেন। এগুলোর মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোকজ্জা, ক্যালেন্ডার, ডায়েরী, নববর্ষের শুভেচ্ছা কার্ড, ঈদকার্ড বা পূজা কার্ড, ডাইরেক্টরী, টাইম টেবল, বার্ষিক ক্রোড়পত্র প্রকাশ, নাম মুদ্রিত হাত-ব্যাগ, দামী কলমদানী ও এসড্রে ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য।

প্রত্যক্ষ বিপণন সম্পর্কিত ধারণা (Concept of Direct Marketing)

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মোবাইল ফোন, ই-মেইল, ও অনলাইনে সম্ভাব্য ক্রেতার সাথে যোগাযোগ করে প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। এমনকি সে সময় ক্রেতা কোন পণ্যকে আকর্ষণীয় মনে করলে এবং সেটিক্রয়ের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে, বিপণনকারী ক্রেতার কাছে পণ্য সরবরাহ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রত্যক্ষ বিপণনের মাধ্যমে ক্রেতার অর্থনৈতিক ব্যবহার্য বিভিন্ন পণ্য, যেমন পোশাক, খাবার, গৃহস্থালী পণ্য ইত্যাদি ক্রয় করতে পারে। ক্রেতাখুব সহজেই বিপণনকারীর নিজস্ব ফেসবুক পেইজ বা ওয়েবসাইট থেকে অথবা টেলিফোনের মাধ্যমে পণ্যের তালিকা দেখে পছন্দনীয় পণ্যের অর্ডার দিতে পারে। অন্যদিকে বিপণনকারী পণ্যের অর্ডার পাবার পর সে পণ্য ক্যাশ অন ডেলিভারি, মোবাইল মানি ট্রান্সফার সার্ভিস বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা সাপেক্ষে ক্রেতার নিকট সরবরাহ করতে পারে।

প্রত্যক্ষ বিপণন হলো আধুনিক যুগে এমন এক ধরনের বিপণন ব্যবস্থা যার মাধ্যমে লক্ষ্যস্থিত ভোক্তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা যায় এবং দীর্ঘস্থায়ী ক্রেতা-সম্পর্ক সৃষ্টি করা হয়। প্রত্যক্ষ বিপণনের মাধ্যমে কোন রকম মধ্যস্থ ব্যবসায়ী ছাড়াই ক্রেতাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে পণ্য ক্রয়ের আদেশ গ্রহণ করে এবং সেই অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করে।

ফিলিপ কটলার ও গ্যারী আর্মস্ট্রং এর মতে, প্রত্যক্ষ বিপণন হলো তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া পাওয়ার জন্য ও দীর্ঘমেয়াদে ক্রেতা-সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য সর্বকভাবে অষ্টাষ্ট ভোক্তা ও ক্রেতা সমাজের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যম।

অনলাইন বিপণন সম্পর্কিত ধারণা (Concept of Online Marketing)

প্রযুক্তির আধুনিকায়নের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে এখন অনলাইন বিজনেস ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হচ্ছে। অনলাইন বিজনেস বলতে কম্পিউটার, মোবাইল বা অন্য যেকোন ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসের সাথে ইন্টারনেট টেকনোলজি ব্যবহার করে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়াশীল উপায়ে যোগাযোগ করে বিপণন কার্যক্রম সম্পন্ন করাকে বোঝায়।

ফিলিপ কটলার ও গ্যারী আর্মস্ট্রং এর মতে, অনলাইন বিপণন হলো পরস্পর ক্রিয়াশীল অনলাইন কম্পিউটার পদ্ধতি, যা বৈদ্যুতিক উপায়ে ভোক্তার সাথে বিক্রেতার যোগাযোগ ঘটায়।

উপরের আলোচনা ও সংজ্ঞা থেকে প্রত্যক্ষ বিপণনের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা যায়-

- এরূপ বিপণন ব্যবস্থা পরস্পর ক্রিয়াশীল ও যোগাযোগের সহজ মাধ্যম;
- ইন্টারনেট ও অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক্স যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়;
- এর মাধ্যমে অনলাইন বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্ভব হয়;
- ভোক্তারা পণ্য ক্রয় বা ভোগ করার পর ফোরাম, নিউজগ্রুপ এবং ওয়েব কমিউনিটিতে অংশগ্রহণ করতে পারে;
- অনলাইন বিপণন বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় মাধ্যম। এরফলে বিশ্বের যেকোন প্রান্তের ক্রেতা-বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ করা যায় ও পণ্য বা সেবা সম্পর্কে তথ্য জানা যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, অনলাইন বিপণন হলো একটি আধুনিক বিপণন কার্যক্রম যার মাধ্যমে বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝে পরস্পর ক্রিয়াশীল অনলাইন কম্পিউটার ও মোবাইল টেকনোলজি ব্যবহার করে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

গ্রিন মার্কেটিং-এর ধারণা (Concept of Green Marketing)

গ্রিন মার্কেটিং-এর ধারণাটি ১৯৮০ থেকে জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। এই বিপণন ধারণাতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বিপণন কার্যক্রমের সাথে সাথে পরিবেশের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। এখানে পরিবেশ বলতে প্রাকৃতিক পরিবেশ, যেমন নদ-নদী, জলবায়ু, বন, গাছ-পালা, জীবজন্তু ইত্যাদিকে বোঝানো হচ্ছে। একই সাথে মানুষসৃষ্ট সামাজিক পরিবেশ, যেমন রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সমষ্টিকে তুলে ধরা হয়েছে। গ্রিন মার্কেটিং-এ প্রাকৃতিক ও সামাজিক উভয় ধরনের পরিবেশের প্রতি সচেতন থেকে বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যে বিপণন মতবাদে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেই বিপণনকে গ্রিন মার্কেটিং বলে।

গ্রিন মার্কেটিংএ বিপণনকারী বিপণন কার্যক্রমের সকল কাজের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ ও রক্ষার জন্য কাজ করে। যেমনপণ্য প্রস্তুত করার সময় পরিবেশবান্ধব পণ্য উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহার, পণ্য পরিবহন, মোড়কিকরণ, সংরক্ষণ এবং প্রচারণার সময় পরিবেশের যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা হয়। বিপণন কার্যক্রমে পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে বিপণনকারীকে বিনিয়োগ বেশি করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে পণ্য বা সেবার মূল্যও সে কারণে বেড়ে যায়।

অধিবেশন -৫.২: টেকসই ও উদ্ভাবনী ব্যবসা

দিন-৫, অধিবেশন ৫.১

: সময়: ৯.৩০-১০.০০

ব্যাপ্তি: ৬০ মিনিট

সেশন শিরোনাম

: পরিচিতি পর্ব

প্রতিটি প্রানীর নিজ নিজ বাসস্থানে টিকে থাকার মাঝে নানা সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায় পরিবেশ দূষণ। পরিবেশ দূষণের জন্য আমাদের কাজের ধরণ দায়ী। যেমন-

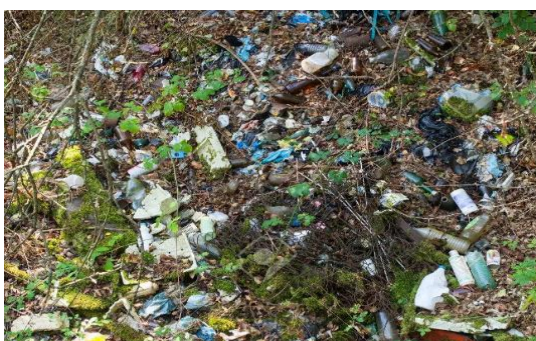
ক) মাটি দূষণ: উদ্যোগ থেকে ময়লা আবর্জনা, পলিথিন, নানা রকমের প্যাকেট, ঠোংগা, চায়ের থলি, কাপড়ের টুকরা, পানির বোতল ইত্যাদি সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা না করে নিকটস্থ জমিতে ফেলে দিলে সংশ্লিষ্ট জমি/মাটি দূষিত হয়ে পড়ে। সেখানে গাছপালা জন্মে না। ধীরে ধীরে অনুর্বর হয়ে পড়ে। এছাড়া কৃষি উদ্যোগে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মাটির উপকারী কীটপতঙ্গ ও অণুজীব মারা গেলে মাটির গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া উদ্যোগ থেকে সৃষ্ট নানা রকমের বর্জ্য পদার্থ সরাসরি মাটিতে ফেলে দিলে বা পুঁতে ফেললেও মাটি দূষিত হয়। উদাহরণ-রাসায়নিক আবর্জনার মাধ্যমে মাটি দূষিত হয়ে জাপানে ‘ইটাই ইটাই’ নামে এক ধরণের অদ্ভুত রোগে আক্রান্ত হয়। ভারী ধাতু ক্যাডমিয়াম মূলত দূষিত মাটি থেকে উৎপাদিত খাদ্য শস্য গ্রহণের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এই রোগে অত্যধিক ব্যাথা ও শরীরের হাড় দুর্বল হয়ে পঞ্জুত বরন করে



নির্মাণ সামগ্রী জমিতে ফেলার দ্বারা মাটি দূষণ



ফসল পোড়ানোর মাধ্যমে মাটি দূষণ



অপচনশীল প্লাস্টিক জমিতে ফেলার দ্বারা মাটি দূষণ



রাসায়নিক পদার্থ জমিতে ফেলার দ্বারা মাটি দূষণ

প্রতিকার

- অকৃষি উদ্যোগ-এর জন্য অনাবাদি জমি নির্বাচন করা জরুরী।
- আবাদি জমিতে উদ্যোগের প্রতিষ্ঠান তৈরি হলেও উদ্যোগ-হতে জমির উর্বরতা নষ্ট হয় এমন কাজ করা যাবে না। যেমন-
 - অপচনশীল পলিথিন, প্লাস্টিক আবর্জনা কৃষি জমিতে না ফেলা।
 - কৃষি জমির ফসল পুড়িয়ে ফেলা।
 - নির্ধারিত স্থানে ময়লা ফেলা ও উদ্যোগে ময়লার পাত্র রাখা।
 - নির্মাণ উপকরণ ফসলের জমিতে না ফেলা
 - রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার না করে জৈব-পদ্ধতিতে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করা।
 - গবাদী পশুর মল-মূত্র সরাসরি জমিতে নিক্ষেপ না করে তা দিয়ে কম্পোস্ট প্রস্তুত করা।

খ) **জলাশয় দূষণ:** উদ্যোগ থেকে আসা আবর্জনা জলাশয়ে ফেলে দিলে জলাশয়ের পরিবেশ দূষিত হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উদ্যোগে ব্যবহৃত টয়লেট থেকেও পাইপ দিয়ে আবর্জনা জলাশয়ে ফেলে জলাশয়ের পরিবেশ দূষণ করা হয়। পানি দূষিত হলে তা ব্যবহার করে নানা রকমের রোগবালাই হয় যেমন- ডাইরিয়া, টাইফয়েড ইত্যাদি। জলাশয়ের মাছও আক্রান্ত হয়। বিষাক্ত মাছ খেয়েও নানা রকম রোগ হয়। বিশেষ করে শিশুরা আক্রান্ত হয় বেশি। তাদের মস্তিস্কের গঠনে বাধাগ্রস্ত হয়। উদাহরণ- জাপানের কারখানা থেকে ফেলে দেওয়া মিথাইল মারকারী (এক ধরনের রাসায়নিক) মিনামাতা সাগরে পতিত হলে সেখানে উৎপাদিত মাছ খেয়ে লোকজন মৃগী রোগীর মত আচরণ করতে থাকে। এই রোগকে ‘মিনামাতা’ নাম করা হয়েছিল। এতে প্রায় ৯০০ জনের মৃত্যু সহ ৩০০০ জন স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়ে যায়।



জলাশয় দূষণ

প্রতিকার

- এজন্য ভালো ডেইনেজ ব্যবস্থার প্রয়োজন।
- উদ্যোগ হতে দূষিত পানি সরাসরি ডেইনে না দিয়ে তা সোকওয়েলে পরিশুদ্ধ করে অপসারণ করতে হবে।
- উদ্যোগ-এর কারণে জলাশয় দূষিত হয় এমন এমন কিছুই করা যাবে না। যেমন জলাশয়ে তরল আবর্জনা সরাসরি না ফেলে সোক-ওয়েলের মাধ্যমে কিছুটা ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করা।



গ) **বায়ু দূষণ:** উদ্যোগ হতে কাজের ধরণ অনুযায়ী কাটা, ঘসা-মাজা, পরিবহন, জ্বালানী ও আবর্জনা দহন ইত্যাদি কাজে মূলত গ্যাস ও ধূলিকণা বাতাসে ছড়িয়ে পড়লে সেখানে বায়ু দূষিত হয়। বায়ু দূষণের ফলে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মীদের হৃদরোগ সহ ফুসফুসে নানা রকমের অসুখ হয়। এর ফলে অন্তঃসত্তা মায়েরদের সন্তানের বৃদ্ধি কমে যায়। বায়ু দূষণের ফলে যে যে রোগ হয় নিউমোনিয়া তার মধ্যে অন্যতম। সারা বিশ্বে যত মানুষ কোভিডে মারা গিয়েছে তার তুলনায় অনেক বেশি মারা যায় বায়ু দূষণের জন্য।

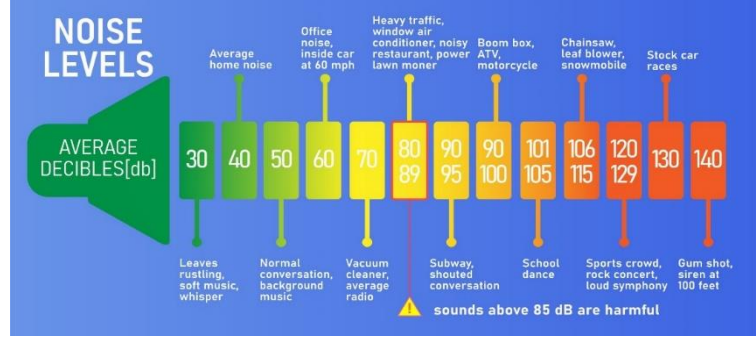
প্রতিকার

- দহন, কর্তন বা পেষণ থেকে থেকে বায়ু-দূষণের সম্ভাবনা থাকে। তাই ঢাকনায়ুক্ত কাটিং মিলিং ও মোল্ডিং মেশিন ব্যবহার করা এবং চিমনিযুক্ত চুলা ব্যবহার করা জরুরী।
- উদ্যোগে বায়ু দূষণ হ্রাসের জন্য কোনোও পদ্ধতি যেমন-পানির স্প্রে, ভেজা পর্দা, এক্সোস্ট ফ্যান/পাইপ বা অন্য কোনোও ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।
- পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষ রোপণ করলেও বায়ু দূষণ হ্রাস পায়।
- ধূলায়ুক্ত পরিবেশে মাস্ক ব্যবহার করা প্রয়োজন।

ঘ) **শব্দ দূষণ:** অগ্রহনযোগ্য ও উচ্চশব্দকেই নানা কারণে অতিরিক্ত শব্দের মধ্য দিয়ে উদ্যোগে কাজ করতে হয়। কখনও উচ্চ শব্দের জন্য দায়ী থাকে উন্মুক্ত মেশিন, যন্ত্রাংশের ঘর্ষণজনিত শব্দ, অতিরিক্ত কলাহল ইত্যাদি। শব্দ দূষণের জন্য মানুষের কাজের মনোযোগ নষ্ট হয়ে যায়, মাথা ব্যথা, হৃদরোগ সহ দীর্ঘ মেয়াদে বধিরতা সৃষ্টি হতে পারে।

প্রতিকার

- উদ্যোগ-হতে অসহনীয় শব্দ উৎপন্ন হলে তা ৮০ ডেসিবলের নিচে রাখার ব্যবস্থা করা জরুরী।
- সকল উদ্যোগে শব্দের মাত্রা পরিমাপের সুযোগ থাকেনা, সেক্ষেত্রে পরিদর্শনের সময় কানে হাত দিতে বাধ্য হতে হয় কিনা বিষয়টি খেয়াল করা। এমন কর্ম পরিবেশে দীর্ঘদিন কাজ করলে শ্রমিকের শ্রবণ শক্তি হ্রাস পায়। সেজন্য শব্দের মাত্রা কমিয়ে আনতে যন্ত্রাংশের ঘর্ষণজনিত শব্দ হ্রাসের ব্যবস্থা করা, ঢাকনা ব্যবহার করা।
- ব্যক্তি পর্যায়ে সুরক্ষার অংশ হিসেবে শ্রমিকদের কানে এয়ার প্লাক বা হেডফোন ব্যবহার করা যেতে পারে।
- এছাড়া প্রতিবেশে শব্দের ক্ষতিকর প্রভাব কমাতে উদ্যোগে নানা রকম শব্দ-প্রতিবন্ধক ব্যবহার করা যেতে পারে।



কর্ম পরিবেশ ভালো রাখতে করণীয়

- কর্মীদের পরিচ্ছন্নতা: উদ্যোগের পরিবেশ ভালো রাখতে কর্মীদের শিক্ষা দিতে হবে। ভালো অভ্যাস গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা যেমন- দাঁত মাজা, নখ কাটা, পরিচ্ছন্ন নোংরা স্থানে এবং নোংরা জিনিস দিয়ে না খেলা, খেলার পর ভালো করে হাত-মুখ ধোয়া, খাবার আগে হাত-মুখ ধোয়া ইত্যাদি কাজে দৃষ্টি রাখবেন ও অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করবেন। চকোলেট, চুইংগাম, বিস্কুট, ফাস্টফুড ইত্যাদির মোড়ক, কলার খোসা, বাদামের খোসা প্রভৃতি মা-বাবা শিশুদের দিয়ে বাড়ির ময়লা রাখার পাত্র ফেলতে অভ্যস্ত করাবেন। তারা যেন খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ না করে টয়লেট বা পাখানার ব্যবহার করে সে ব্যাপারে অভ্যাস গড়ে তুলবেন।
- বাড়িতে বা বিদ্যালয়ে কোনো পরিবেশেই আমরা যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকবো। নোংরা আবর্জনা পানিতে বা রাস্তায় বা খেলার মাঠে ফেলব না। পুকুর, খাল ও নদীর পানিতে ময়লা আবর্জনা ফেলব না। রাস্তাঘাটে চলার সময় যেখানে-সেখানে কফ, থুথু বা নোংরা জিনিস ফেলব না। রাস্তায় বা খেলার মাঠে কোনো নোংরা জিনিস ফেলব না। রাস্তায় বা খেলার মাঠে কোনো নোংরা জিনিস বা ময়লা পড়ে থাকলে তা আমরা নিজেরাই কারো স্বাস্থ্যের ক্ষতি করবে না এমন নিরাপদ স্থানে ফেলে আসব।
- শিক্ষার্থীদেরকে বিদ্যালয় গৃহ, শ্রেণিকক্ষ, লাইব্রেরি, বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে শিক্ষা দেব। বিদ্যালয় চলাকালে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক আসার আগের সময়টাতে শিক্ষার্থীদের অথবা হেঁচো না করার অভ্যাস গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষকবৃন্দকে নিতে হবে।
- বাড়িতে উচ্চ শব্দে রেডিও বাজিয়ে, টেলিভিশন দেখে, বিদ্যালয়ে বা আশপাশে জোরে মাইক বাজিয়ে শিক্ষক কখনোই শব্দ দূষণ করবেন না।
- বাড়িতে, এলাকায় ও বিদ্যালয়ের চারপাশে শিক্ষক বেশি করে গাছ লাগাবেন, সেগুলোর যত্ন নেবেন। বৃক্ষরোপণ অভিযানে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবেন। রোপণ করা চারপাশের যথাযথ পরিচর্যা ও সংরক্ষণে তাদের দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করবেন।
- এলাকার রাস্তাঘাট, হাটবাজার, বিদ্যালয়, মন্ডব, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা, হাসপাতাল, ব্রিজ, সঁকো, পাহাড়, জলাভূমি প্রভৃতি আমাদের সামাজিক ও জাতীয় সম্পদ। শিক্ষার্থীদের কাজের মাধ্যমে এগুলোর স্বাভাবিক পরিবেশ যাতে ব্যাহত না হয় শিক্ষক সে ব্যাপারে তাদের সচেতন করবেন। স্থানীয়, প্রাতিষ্ঠানিক বা সাংগঠনিক উদ্যোগে এগুলোর যথাযথ সংরক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযানে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবেন।



নিরাপদ যন্ত্র থেকে শব্দ দূষণ



আবর্জনা পোড়ান থেকে বায়ু দূষণ



মানব শরীরের নানাবিধ রোগ



পরিবেশ দূষণের জন্য জীবকূলের অবক্ষয়

অধিবেশন -৫.৩:ব্যবসা সম্প্রসারণ

দিন-৫, অধিবেশন ৫.৩

: সময়: ৯.৩০-১০.০০

ব্যাপ্তি: ৬০ মিনিট

সেশন শিরোনাম	: পরিচিতি পর্ব
সেশন লক্ষ্য	: এই অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও অর্থায়ন সম্পর্কে অবগত হবেন।
উদ্দেশ্য	: এ সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ব্যবসা সম্প্রসারণের কৌশল সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
উপকরণ	: ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, অডিও/ভিডিও মিউজিক, পোস্টার পেপার/বোর্ড, মার্কার
পদ্ধতি	: ভিপিআর, পোস্টার পেপার প্রদর্শন, গল্প বলা, প্রশ্নোত্তর, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা
পঠন উপকরণ	: হ্যান্ডআউট
পূর্ব প্রস্তুতি	: সহায়ক পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও বোর্ড প্রস্তুত করে রাখবেন।
মূল্যায়ন পদ্ধতি	: প্রশ্নোত্তর

প্রক্রিয়া

ফ্যাসিলিটের অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানতে চাইবেন ব্যবসা বলতে আমরা কি বুঝি। অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে বিভিন্ন ধরনের উত্তর আসবে। ফ্যাসিলিটের বলবেন আমরা তো সকলেই ব্যবসা করি। এরপর ফ্যাসিলিটের আবার প্রশ্ন করবেন আমরা তো সবাই ব্যবসা করি তাহলে আমাদের ব্যবসা কীভাবে ধরে রাখতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে আসা উত্তরগুলো শুনবেন এবং সকলের সাথে ব্যবসায় ধারাবাহিকতা রাখার জন্য ফ্যাসিলিটের কিছু কথা বলবেন।

ব্যবসায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখার কৌশলসমূহ নিয়ে ফ্যাসিলিটের অংশগ্রহণকারীদের ২জন করে জোড়া করে নিজ নিজ জায়গায় বসে আলোচনা করতে বলবেন। এরপর ফ্যাসিলিটের সকল জোড়ার নিকট জানতে চাইবেন ব্যবসায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখার কৌশলসমূহ। ফ্যাসিলিটের সকল জোড়ার নিকট শুনবেন এবং সকলের সাথে আলোচনা করবেন।

অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে ভাগ করুন। পূর্ব নির্ধারিত বিষয়গুলি দিয়ে লটারির মাধ্যমে প্রতিটি দলকে একটি বিষয় দিবেন এবং রোল প্লে করার প্রস্তুতি নিতে ১০ মিনিট সময় দেবেন। প্রস্তুতি শেষে প্রতিটি দলকে ২ মিনিট করে উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন।

অংশগ্রহণকারীদের ৪ টি দলে ভাগ করুন। ব্যবসা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ৪টি বিষয়ের ওপর ২ মিনিট করে ৪টি নাটক উপস্থাপন করা হবে। বিষয়গুলি ফ্যাসিলিটের অংশগ্রহণকারীদের ভালভাবে বুঝিয়ে দিবেন, অন্যথায় সেশনের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

নাটক ১:	দলীয় মোটিভেশন (কর্মী ব্যবস্থাপনা, দল ব্যবস্থাপনা, ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ) (পজিটিভ নাটক)
নাটক ২:	মালপত্র (Raw materials) সরবরাহ ব্যবস্থাপনা ও সরবরাহকারীদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন (নেগেটিভ নাটক)
নাটক ৩:	তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার (নেগেটিভ নাটক)
নাটক ৪:	পণ্য বাজারজাতকরণে প্রচার (পজিটিভ নাটক)

নাটক ১: দলীয় মোটিভেশন (কর্মী ব্যবস্থাপনা, দল ব্যবস্থাপনা, ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ) (পজিটিভ নাটক)

অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ৫ জন লোক নিয়ে প্রশিক্ষণ রুমের মাঝখানে গোলাকার হয়ে বসে একটি মিটিং করবেন। ৫ জনের মধ্যে থেকে ১ জন প্রতিষ্ঠানের মালিকের ভূমিকা পালন করবেন। আর বাকি ৪ জন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর ভূমিকা পালন করবেন। প্রতিষ্ঠানের মালিক সকলের উদ্দেশ্যে বলবেন- এ প্রতিষ্ঠান তোমাদের, প্রতিষ্ঠানের ভালো-মন্দ তোমরা দেখবা। তোমরাই এই প্রতিষ্ঠানের মালিক। যার যার দায়িত্ব পালন করবা। প্রতিষ্ঠানের সুনাম অর্জন করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠান থেকে তোমরা যেন এক সময়ে অনেক টাকা বেতন নিতে পারো।

নাটক ২: মালপত্র (Raw materials) সরবরাহ ব্যবস্থাপনা ও সরবরাহকারীদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন (নেগেটিভ নাটক)

অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ৩ জন লোক নিয়ে নিবেন। একজন দোকানদার অন্য ২ জন কাস্টমার। কাস্টমার দোকানে মালপত্র কিনতে আসলে দোকানদারের সাথে মালের দাম নিয়ে কথা কাটাকাটি করবে এবং দোকানদার কাস্টমারের সাথে খারাপ আচরণ করবেন। এভাবে খারাপ আচরণের মাধ্যমে নেগেটিভ চিত্র ফুটিয়ে তুলতে হবে।

নাটক ৩: তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার (নেগেটিভ নাটক)

অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ২ জন লোক প্রশিক্ষণ রুমের মাঝখানে বসবেন। ১ জন প্রতিষ্ঠানের মালিক অন্যজন ম্যানেজার। মালিক ম্যানেজারকে প্রতিষ্ঠানের মালমাল ক্রয়ের জন্য একটি তালিকা করার জন্য বলবেন। ম্যানেজার সাহেব খাতা কলম নিয়ে লিখতে থাকবে এবং মাঝে মাঝে হাতের কর গুনতে থাকবে। এভাবে অনেক সময় নিয়ে হিসাব করবে। মালিক বলবে এতো সময় নিয়ে হিসাব করলে ব্যবসা চলবে। মালিক খুব তাড়াহুড়া করতে থাকবে বাহিরে যাওয়ার জন্য।

নাটক ৪: পণ্য বাজারজাতকরণে প্রচার (পজেটিভ নাটক)

অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ২ জন লোক নিয়ে হকারি করতে হবে। একজন বিক্রি করবে তিব্বত পাউডার (দাঁতের মাজন) অন্যজন বিক্রয় করবে হাকিম চাচার নিমের মাজন।

হকারের লেকচার

ফ্যাসিলিটের অংশগ্রহণকারীদের নিজের কৌতুকটি বলে নাটক থেকে শিখনে ফিরিয়ে আনা হবে;

দাঁত আমাদের মূল্যবান সম্পদ। দাঁত ভালো যার সব ভালো তার। দাঁত না থাকলে দেখতে খারাপ লাগে, গুস্তরবাড়ি বেড়াতে গেলে দেশী মুরগি খেতে দিলে, দাঁত না থাকলে সমস্যা। পান খেয়ে যারা দাঁতগুলি তরমুজের বীচিরমত কালো করে ফেলছেন, তাদের জন্য এই মাজন কাজ করবে। এক ঘষাতেই দাঁত ঝকঝকে, তকতকে, ফকফকে।

৪টি নাটক উপস্থাপন শেষে সকলের জন্য জোরে হাততালি দিবে। ১ম দলকে সামনে আনা হবে এবং ১ম দলের নাটকের বিষয়ে অংশগ্রহণকারীগণ কি বুঝেছেন তা সকলের নিকট শেয়ার করতে হবে। এভাবে ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ দলের নাটক উপস্থাপনের বিষয়ে সকলের সাথে শেয়ার করতে হবে। ফ্যাসিলিটের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেশন শেষ করবেন।

মতামতের সম্ভাব্য প্রশ্নগুলো;

- নাটক-এ কোন কোন বিষয়গুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যবসায়ের জন্য এসব বিষয়গুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ?

এরপর ফ্যাসিলিটের সঞ্চয় ও বিমা নিয়ে আলোচনা করবেন। প্রথমে তিনি সঞ্চয় শব্দটি বোর্ডে লিখবেন এবং সঞ্চয় নিয়ে সকলের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। একইভাবে বিমা শব্দটি বোর্ডে লিখবেন এবং বিমা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

উপরোক্ত ১০টি কৌশল অবলম্বন করে ব্যবসা পরিচালনা করলে ব্যবসা অব্যাহত রাখা সহজ হবে এ বিষয়ে সকলের সম্মতি নিয়ে সেশনটি সমাপ্ত করা।

ফ্যাসিলিটের জন্য তথ্য

ব্যবসার ধারাবাহিকতা পরিকল্পনা কি?

কারবার বা ব্যবসার ধারাবাহিকতা পরিকল্পনা জানার আগে পরিকল্পনা কী সেটা জানা দরকার আমাদের। কোনো কাজ বা ব্যবসা করার ক্ষেত্রে আমাদের মনের মধ্যে কিছু চিন্তা বা প্রশ্ন আসে যেমন ধরুন ব্যবসাটা শুরু করবো কীভাবে, কী দিয়ে শুরু করবো, কোথায় করবো, কখন করবো, টাকা পাবো কোথায়, কত টাকা লাগতে পারে, আমার কাছে কত টাকা আছে, বাড়িতে কিছু সম্পদ (গুরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি, ক্ষেতের ফসল, কিছু গয়না ইত্যাদি), তাতে হবে কিনা, বাকি টাকা পাবো কোথায়, ধার করবো কিনা, ব্যাংক বা সমিতি থেকে ঋণ তুলবো কিনা, ঋণ তুললে পরিশোধ করবো কীভাবে, ব্যবসা থেকে যে লাভ আসবে সংসারের খরচ মিটিয়ে তা পরিশোধ করতে পারবো কি না, ব্যবসায় ক্ষতি হলে সেটা কাটিয়ে/পুষিয়ে উঠবো কীভাবে ইত্যাদি। এ ভাবনা চিন্তাগুলোই পরিকল্পনার অংশ।

ব্যবসায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখার কৌশলসমূহ

দলীয় মোটিভেশন

উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ীরা যেসব কাজ করে থাকেন সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো কর্মীদেরকে প্রণোদিত/পুরস্কৃত করা। মোটিভেশন একটি জটিল কাজ। কর্মীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের লোক থাকে; তারা ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতা পোষণ করে থাকেন আর কাজের প্রতি থাকে একেক ধরনের মনোভাব। কেউ কেউ জন্মগতভাবেই নাখোশ প্রকৃতির, কেউ কেউ একটুতেই পরিতুষ্ট। তাই ব্যক্তির মানসিক গঠন, শিক্ষাগত ও সামাজিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক-ধর্মীয় মতধারা, কাজের ধরন ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে কর্মীদেরকে সন্তুষ্ট রাখার প্রচেষ্টা চালাতে হয়। একজন কর্মী যে কারণে মোটিভেটেড হবেন, আরেকজন সে কারণে মোটিভেটেড না-ও হতে পারেন, একজন কর্মীর হয়তো বেতন বাড়ালেই সে

মোটিভেটেড হয়, আরেকজন হয়তো প্রশংসায় মোটিভেটেড হয়। এসব কারণেই উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ীদের জন্য মোটিভেশন কাজটি খুবই জটিল।

দলীয় মোটিভেশন হলো প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য অধিকতর প্রচেষ্টা চালানোর ইচ্ছা। মোটিভেশন হলো কতিপয় শক্তির সমাহার যার কারণে মানুষ বিশেষভাবে আচরণ করে। এ প্রক্রিয়া শুরু হয় অতৃপ্ত প্রয়োজন দিয়ে এবং সমাপ্ত হয় টেনশন ত্রাসের মধ্য দিয়ে। মোটিভেশন ব্যবসা/উদ্যোগকে গতিময় রাখে, কর্ম-উদ্দীপনা ও প্রাণচাঞ্চল্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং সর্বোপরি কর্মীর প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত জীবনে সজীবতা আনয়ন করে।

কর্মী ব্যবস্থাপনা

সাধারণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ের যে অংশ প্রতিষ্ঠানের মানবীয় দিক নিয়ে কাজ করে তাকে কর্মী ব্যবস্থাপনা বলে। ম্যানেজমেন্টের মূল লক্ষ্য হলো মানব সম্পদের কার্যকরী এবং পরিকল্পিত ব্যবহার।

দল ব্যবস্থাপনা

কোনো একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো দল ব্যবস্থাপনা। কোনো একটি লক্ষ্য বাস্তবায়ন বা অর্জনের জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তির সাথে মানবীয় ও বস্তুগত কার্য সমাধানের কাজ করার জন্য দল তৈরি করে দলের সকলকে ব্যবস্থাপনা করাকে দল ব্যবস্থাপনা বলে। কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অথবা কোনো কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে দল ব্যবস্থাপনা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। দল ব্যবস্থাপনায় কৌশলী না হলে কার্য সম্পাদন ব্যাহত হয়।

সাধারণত তিন স্তরে এ ব্যবস্থাপনা হয়:

- উচ্চ স্তরে;
- মধ্য স্তরে; এবং
- নিম্ন স্তরে।

কারবারের আয়-ব্যয় ব্যবস্থাপনা

একটি কারবার বা ব্যবসায়ের অবস্থা সম্পর্কে জানতে আয়-ব্যয়ের হিসাব থাকতে হবে। সে জন্য যেকোনো কারবার বা ব্যবসায় হিসাব রাখা অতীব জরুরী। আয় থেকে যদি ব্যয় নির্বাহ করা না যায় তবে অবশ্যই কারবার বা ব্যবসাটি ঝুঁকির দিকে যাবে অর্থাৎ ব্যবসায় ধারাবাহিকতা ব্যাহত হবে। এক্ষেত্রে ব্যবসায় ধারাবাহিকতা রক্ষায় আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যয় করতে হবে। আয়ের থেকে ব্যয় কখনো বেশি হওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। সেই সাথে ব্যয় সংকোচন খুবই জরুরি। আয়-ব্যয়ের হিসাবটি পর্যবেক্ষণের জন্য দৈনিক টালি খাতা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। আয়-ব্যয় হিসাব দৈনিক/সাপ্তাহিক/মাসিক হতে পার।

সরবরাহকারীদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন

ব্যবসায় ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে অবশ্যই সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে একটি আস্থা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক থাকতে হবে। চাহিদার ভিত্তিতে যাতে সময়মত কাঁচামাল/পণ্য সরবরাহ করে সেই সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। সময়মত এবং চাহিদা অনুযায়ী পণ্য/কাঁচামাল সরবরাহ না হলে কারবার ঝুঁকিতে পড়বে।

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি

কারবার বা ব্যবসায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে এর কোন বিকল্প নাই। মোবাইল/ই-মেইল/ওয়েবসাইট ব্যবহার করে এখন খুব সহজেই সবার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব, যা একটি কারবার বা ব্যবসায় গতিশীলতা আনবে। এ তথ্য প্রযুক্তি বাজার ব্যবস্থাপনাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে।

কেন্দ্রীকরণ বনাম বিকেন্দ্রীকরণ

কেন্দ্রীকরণ এবং বিকেন্দ্রীকরণ হলো যেকোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করার দুটি পদ্ধতি। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব উচ্চপর্যায়ের একক ব্যক্তির নিকট থাকা হচ্ছে কেন্দ্রীকরণ। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিভাজন বা বন্টনই হচ্ছে বিকেন্দ্রীকরণ।

কেন্দ্রীকরণে সংস্থার বা প্রতিষ্ঠানের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিয়ে থাকেন। কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণে সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের সমন্বিত মত অনুযায়ী নেয়া হয়।

সরবরাহ ব্যবস্থাপনা

কোনো প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল কেনা থেকে শুরু করে পরিকল্পনা, পণ্যের উৎস, মজুদকরণ, প্রস্তুত ও বিপণন কার্যক্রম দক্ষতা দিয়ে সময় মতো ও কম খরচে সম্পন্ন করাকেই সরবরাহ ব্যবস্থাপনা বলে। সরবরাহ ব্যবস্থাপনা হলো পণ্য বা সেবা উৎপাদন ও বিক্রয়ের সাথে জড়িত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সম্পদ, কার্যক্রম এবং প্রযুক্তির একটি নেটওয়ার্ক। প্রস্তুতকারকের কাছে কাঁচামাল সরবরাহ দিয়ে এর শুরু। শেষ হয় সর্বশেষ গ্রাহকের কাছে প্রোডাক্ট বা সার্ভিস পৌঁছে দেবার মাধ্যমে।

দায় ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা

ব্যবসায় ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে দায় ও সম্পদের মধ্যে একটি ব্যালেন্স/সামঞ্জস্য থাকতে হবে। সম্পদ থেকে দায় বেশি হলে ব্যবসায় উন্নয়ন সম্ভব নয়। দায় পরিশোধে সম্পদকে ব্যবহার করলে ব্যবসায়ের ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হবে এবং ব্যবসা ঝুঁকির দিকে যাবে।

সঞ্চয়

কথায় আছে সময়ের এক ফোঁড়ু অসময়ের দশ ফোঁড়ু। ঝুঁকি মোকাবিলা বা ব্যবসায় ধারাবাহিকতা রক্ষায় সঞ্চয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ব্যবসায়ের আয় থেকে অবশ্যই একটি অংশ সঞ্চয় হিসেবে জমা করতে হবে যা বিশেষ মুহূর্তে ব্যবসায় ভালো একটি সাপোর্ট দিবে।

সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যসমূহ-

- অর্থনৈতিক কাজে অংশীদারিত্ব;
- পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা;
- অর্থনৈতিক সহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকা রাখা;
- স্থানীয় মহাজন নির্ভরতা কমানো; এবং
- নিজের পছন্দের বাস্তবায়ন ঘটানো।

বিমা

বিমা ব্যবস্থা মূলত ঝুঁকি হস্তান্তর প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে বিমা করে স্থায়ী সম্পদ ও উৎপাদিত পণ্যের ঝুঁকিও অন্যের কাছে হস্তান্তর করা যায়। ফলে ব্যবসার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। তবে এর জন্য বিমা কোম্পানীকে প্রিমিয়াম দিতে হয়।

বাংলাদেশে অনেকগুলি বিমা আছে তার মধ্যে-

- সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বিমা;
- শিক্ষা বিমা;
- স্বাস্থ্য বিমা;
- অবসরকালীন জীবন পরিকল্পনা; এবং
- গ্রুপ বীমা।

উৎপাদন ব্যবস্থাপনা

চাহিদার ভিত্তিতে পণ্য উৎপাদন করতে হবে। অনুমান নির্ভর উৎপাদনে ঝুঁকির আশংকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ শীতকালে অতি শীত আশা করে জ্যাকেট প্রস্তুতকারী একটি কোম্পানি অধিক জ্যাকেট প্রস্তুত করে; কিন্তু পরবর্তীকালে যদি শীতকালে কম শীত হয়, জ্যাকেট প্রস্তুতকারীর জ্যাকেট অবিক্রিত থাকার সম্ভাবনা থাকে। ফলে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে প্রয়োজনীয় মুনাফা অর্জন সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে ধাপে ধাপে জ্যাকেট প্রস্তুত করলে ঝুঁকিও কম হবে এবং ব্যবসার ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

অধিবেশন -৫.৪: মূল্যায়ন ও সমাপনী

প্রক্রিয়া

দক্ষতা উন্নয়নে আয়োজিত প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা নিরূপণের জন্য কোর্স মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরপর ফ্যাসিলিটেটর মাল্টিমিডিয়া মাধ্যমে নিচের ছকটি বুঝিয়ে দিবেন। সকল অংশগ্রহণকারীর নিকট একটি করে ছকের শিট দিয়ে মূল্যায়নের ঘরে টিক দেয়ার জন্য অনুরোধ করবেন। মূল্যায়নের প্রশ্নগুলো বুঝতে কারো কোনো সমস্যা হলে ফ্যাসিলিটেটর সহযোগিতা করবেন। চলমান প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য নিম্নরূপ চারটি স্তরের উপাত্ত সংগ্রহ করা যেতে পারে:

ফ্যাসিলিটেটরের জন্য তথ্য

প্রতিক্রিয়া: প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিক্রিয়া নির্ধারণে প্রশিক্ষণোত্তর জরিপ।

শিখন: প্রশিক্ষণ থেকে কি শিখেছে তা নির্ধারণ করার জন্য প্রাথমিক ধারণা যাচাই এবং প্রশিক্ষণ শেষে যেকোনো এক বা একাধিক পদ্ধতির মাধ্যমে শিখনফল যাচাই করা।

আচরণ: কোর্সসমূহ প্রশিক্ষণার্থীদের কোনো আচরণগত পরিবর্তন সাধন করেছে কি না তা নির্ধারণের জন্য শিক্ষার্থী এবং প্রশিক্ষকদের মধ্যে আচরণ, সাক্ষাৎকার এবং কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ।

ফলাফল: প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিষ্ঠান/উদ্যোগ সামগ্রিকভাবে উপকৃত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের কাজের মূল্যায়ন।

অথবা ফ্যাসিলিটেটর পূর্ব থেকেই একটি ব্রাউন পেপারে মূল্যায়নের বিষয়, ছবি ও ছক ঐকে মুড মিটার তৈরি করে রাখবেন। সকল সেশন শেষ করে ফ্যাসিলিটেটর পোস্ট-মূল্যায়ন করবেন। ফ্যাসিলিটেটর মুড মিটারটি সকল অংশগ্রহণকারীকে বুঝিয়ে দিবেন। এরপর অংশগ্রহণকারীদের এক এক করে স্ব-স্ব অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য অনুরোধ করবেন। কোনো অংশগ্রহণকারীর কোনো বিষয় বুঝতে সমস্যা হলে ফ্যাসিলিটেটর বুঝিয়ে দিবেন। সকল অংশগ্রহণকারীর মতামত প্রদান শেষ হলে মুড মিটারটি সকলের সামনে উপস্থাপন করবেন। প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়গুলি তুলে ধরবেন।

অংশগ্রহণকারীগণকে ধন্যবাদ দিবেন এবং প্রশিক্ষণ সেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পরবর্তীতে অংশগ্রহণকারীদের ভোটগুলো গণনা করে মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ করবেন, সেশনের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করবেন এবং তদনুযায়ী পরবর্তী প্রশিক্ষণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

মুড মিটার-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ সমাপনী মূল্যায়ন

ফ্যাসিলিটেটর অংশগ্রহণকারীদের নিম্নোক্ত মুড মিটারের ছবি দেখিয়ে প্রশিক্ষণের মান ও তাদের সন্তুষ্টি যাচাইয়ের চেষ্টা করবেন।

কো-ফ্যাসিলিটেটর পূর্বেই বোর্ডে একটি টিক চিহ্ন একে রাখবেন।

মূল্যায়নের বিষয়	আমার জানার স্তর		
			
	খুব ভাল শিখেছি	মোটামুটি শিখেছি	অল্প শিখেছি
১। উদ্যোক্তা, উদ্যোগ ও ব্যবসায়ের মৌলিক ধারণা			
২। ব্যবসার কাঠামো			
৩। উদ্যোগ উন্নয়ন ও ব্যবসায়ের পরিবেশ			

৪। আইনি দায়িত্ব এবং বীমা			
৫। আর্থিক ব্যবস্থাপনা			
৬। মুনাফার পরিকল্পনা			
৭। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের উৎপাদন			
৮। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের বাজারজাতকরণ/বিপণন			
৯। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ভালভাবে বুঝতে পেরেছেন			
১০। প্রশিক্ষণ সেশনের পরিবেশ			
১১। ফ্যাসিলিটেটরদের উপস্থাপনা			
১২। সার্বিক ব্যবস্থাপনা কেমন ছিল			

মূল্যায়ন শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফ্যাসিলিটেটর ও কো-ফ্যাসিলিটেটর ৫ দিনের এ প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করবেন এবং সকলকে সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করবেন।